রথযাত্রা ও
অন্যান্য গল্প

রথযাত্রা

ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রণীত

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস্, লিমিটেড্,
এলাহাবাদ

১৩৩১

মূল্য টাকা

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

প্রিণ্টার
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

সূচী

রথযাত্রা

ও

অন্যান্য গল্প

রথযাত্রা

একটি ছোট ঘর। দেয়ালে কয়েকখানা অল্প দামের ছবি। একখানি ছবি ধ্রুবের, বনে বালক তপস্যা করিতেছে। আর একখানা নৃসিংহ মূর্ত্তির, স্তম্ভ ভেদ করিয়া নরসিংহ বাহির হইতেছেন, গদাহস্তে ভ্রূকুটি-কুটিল নয়ন, ভীমদর্শন হিরণ্যকশিপু, বদ্ধাঞ্জলি অবনতমস্তক বালক প্রহ্লাদ। অপর ছবিতে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শরসংযোগ করিয়া পিতামহের পিপাসানিবৃত্তি করিবার জন্য পাতাল ভেদ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। অন্য ছবিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বল্কল ধারণ করিয়া বনে যাইতেছেন, পুরবাসিগণ রোদন করিতেছে। একখানি জলচৌকির উপর কতকগুলি ঔষধের শিশি, তাহার পাশে বেদানা ও কমলা লেবু। কুলুঙ্গীতে একটি ঘড়ি টিক্ টিক করিতেছে। ঘরের মাঝখানে তক্তপোষে বিছানা পাতা, তাহার উপরে শয়ন করিয়া তের বৎসরের বালিকা অমৃতা। অমৃতা সুন্দরী, কিন্তু

এখন শীর্ণ, রোগক্লিষ্ট মূর্ত্তি, মুখখানি ম্রিয়মাণ পদ্মের মত, চুল আলুথালু, কপালের উপর পড়িয়াছে, চক্ষু বসিয়া গেলেও উজ্জ্বল, হাতের শিরা দেখা যাইতেছে। শিয়রে বসিয়া অমৃতার দিদিমা, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, চুল সরাইয়া মাথার পিছনে গুছাইয়া দিতেছেন। ঘরের মেঝেতে বসিয়া অমৃতার মা, তাঁহার পাশে তাঁহার ছোট জা।

অমৃতার পিতা আপিসের পোষাক পরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ভাদ্রবধূ ঘোমটা টানিয়া দিলেন। অমৃতার দিদিমা শয্যা হইতে উঠিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, অমৃতার পিতা সেইখানে উপবেশন করিলেন। অমৃতা নিজের হাত তাঁহার হাতের উপর রাখিল। তিনি এক হাতে তাহার হাত ধরিয়া আর এক হাত তাহার মাথায় দিলেন।

অমৃতা। বাবা, তুমি বেরুচ্ছ ?

বাবা। হাঁ মা। যদি পারি ত সকাল সকাল ফিরে আসব। তুমি এখন কেমন আছ ?

অমৃতা। এখন ভাল আছি। তোমার সকাল সকাল আসবার কি দরকার ? (ঘড়ির দিকে চাহিয়া) দশটা বাজে, তুমি যাও, নইলে তোমার দেরী হবে।

বাবা। এই যে যাই।

তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভাদ্রবধূ ঘোমটা খুলিলেন। দিদিমা আবার অমৃতার শিয়রে বসিলেন।

দিদিমা। অমী, এখন তোমার কোন কষ্ট নেই ?

অমৃতা। না, দিদিমা। আগে আমার গাঁটে গাঁটে যেন এঁটে বেঁধেছিল, ব্যথায় যেন ফেটে যাচ্ছিল। এখন যেন বাঁধন একে একে খুলে দিচ্ছে, আর কোন যন্ত্রণা নেই।

অমৃতার মা ও দিদিমা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। অমৃতার মা'র চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

দিদিমা। ছোটমেয়ে, তুমি, একবার অমীর কাছে বস্‌বে? আমি ঠাকুরঘরের শিকলটা দিয়ে আসি।

অমৃতার খুড়ীমা। হাঁ মা, আমি ত বসে' রয়েচি।

দিদিমা উঠিয়া গেলেন। খুড়ীমা উঠিয়া আসিয়া অমৃতার মাথার কাছে বসিতে যাইতেছেন—

অমৃতা। তুমি ওখানে বসো না, খুড়ীমা, আমার কাছে এস, তোমাকে দেখি।

খুড়ীমা নিকটে আসিতেই অমৃতা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

অমৃতা। (খুড়ীমার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া) তোমার সঙ্গে আমার সব মনের কথা, কেমন?

খুড়ীমা। তুমি যে আমাকে বড় ভালবাস।

অমৃতা। অনেক দিন থেকে। সেই যে তুমি যখন ছোট্ট বউটি এসেছিলে তখন থেকে।

খুড়ীমা। সে কথা বুঝি তোমার মনে আছে? এত অসুখেও কি তোমার তামাসা আসে?

অমৃতা। কেন আসবে না? সবই তামাসা, সুখও তামাসা, অসুখও তামাসা।

অমৃতার মা বাটিতে দুধবার্লি লইয়া আসিলেন।

মা। অমী, এই দুধটুকু খাও। ওষুধ ত খানিক আগে খেয়েচ। ছোটবউ, দুটি বেদানা ছাড়িয়ে দাও ত।

খুড়ীমা একখানি রেকাবিতে বেদানা ছাড়াইয়া আনিলেন।

অমৃতা দুধ খাইয়া বেদানা মুখে দিল। অমৃতার সমবয়সী দুটি মেয়ে, মঞ্জুলা ও শেফালিকা দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মা। তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এস, ঘরের ভিতর এস।

অমৃতা। মঞ্জুলা আর শেফালি, তোরা যে বড় এমন সময়? স্কুলে যেতে হবে না?

কন্যা দুইটি তক্তপোষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জুলা। আজ যে রথের ছুটি।

অমৃতা। তাও ত বটে। আমার এই অসুখ হয়ে সব কথা ভুলে যাই। হাঁ মা, ছোটবেলায় দোরগোড়া থেকে আমি কেমন ভেঁপু কিনে আনতাম!

মা। এখন বুঝি আর ছোট নেই? মস্ত গিন্নী হয়েছিস, না?

অমৃতা। তা বলে' এখন আর ভেঁপু বাজাবার বয়স আমার নেই। (পথে ভেঁপুর শব্দ) ঐ শোন।

মা। আজ রথের দিন, ছেলেমেয়েরা ত ভেঁপু বাজাবেই।

অমৃতা। মা, খুড়ীমাকে একটা ভেঁপু কিনে দাও না।

খুড়ীমা। শুনলে দিদি, মেয়ের কথা? আমার সঙ্গে কেবল তামাসা। এখনি বলছিল, আমি যখন বিয়ের ক'নে এ বাড়ীতে আসি, সে-কথা ওর মনে আছে।

মা। তোমাকে সমবয়সী মনে করে' তোমাকে ক্ষেপায়।

খুড়ীমা। আমি ক্ষেপতে গেলাম কেন? ও যা বলে তাই আমার মিষ্টি লাগে।

শেফালিকা কোঁচড়ের ভিতর হইতে কতকগুলা কদম ফুল বাহির করিয়া অমৃতার হাতের কাছে রাখিল। দিদিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অমৃতা। বাঃ, কি সুন্দর কদম ফুল! (একটা হাতে তুলিয়া) কি চমৎকার গন্ধ! ফুলের শুঁয়ো দেখেচ? যেন আহ্লাদে শিউরে রয়েচে! তা, শেফালি, তুই যে বড় কদম ফুল এনেছিস্? তোর ত শিউলি ফুল আনতে হয়!

সকলের হাস্য।

দিদিমা। বিছানায় শুয়ে না থাকলে কে বলবে মেয়ের অসুখ করেচে? ওর মতন মজার কথা আমাদেরও মুখে আসে না।

খুড়ীমা। এইবার ভাল হয়ে উঠ্‌বে।

মা। বাছা সেরে উঠলে আমি পাঁচ টাকার পূজো দেব। অসুখ হতেই মানত রেখেচি।

অমৃতা। হাঁ, অসুখের গেরোগুলো খুলে যাচ্ছে। আর আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

সকলে নীরব। মঞ্জুলা ও শেফালিকা খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

অমৃতা। আচ্ছা দিদিমা, সোজা রথ আর উল্টো রথ কেন বলে?

দিদিমা। জগন্নাথের চানযাত্রা কি না। যাবার সময় সোজা রথ, ফিরে আসবার সময় উল্টো রথ।

অমৃতা। রথের ঘোড়া কি হ'ল?

দিদিমা। সেকালে ঘোড়ায় টানত, এখন মানুষে টানে।

অমৃতা। সেকালে রথে চেপে যুদ্ধ করতে যেত। মেয়েদের কি রথে উঠতে নেই? তা হ'লে সুভদ্রা দুই ভাইয়ের মাঝখানে রথে ওঠেন কেন?

দিদিমা। ঠাকুরদের সঙ্গে মানুষের কথা! দেবতার রথে কি মানুষের উঠতে আছে?

অমৃতা। মানুষদেরও রথ ছিল। আমার রথে উঠতে ইচ্ছে করে। মঞ্জুলা আর শেফালি রথে উঠ্‌বি?

মঞ্জুলা আর শেফালির ফিক ফিক করিয়া হাসি।

শেফালিকা। রথে উঠে কি হবে? ঘড়র ঘড়র করে' টেনে নিয়ে যায়, ছুটে যেতে পারে না। তার চেয়ে মটর গাড়ী ভাল, দেখতে দেখতে কত দূর চলে যায়।

অমৃতা। (কদম ফুল হাতে করিয়া নিজের মনে) কদমতলায় শ্যামের বাঁশী কেমন করে' বাজ্‌ত? যমুনার জল স্থির হয়ে থাকত, গাছে পাখী চুপ করে' শুনত। বাঁশী শুনে কদম ফুলের গায় কাঁটা দিয়েছিল, তাই এ-সব শুঁয়ো বেরিয়েচে।

দিদিমা। অবাক্! যে-সব কথা তোর মনে আসে আমরা এত বুড়ো হয়েচি আমরা সে-সব ভাবতে পারিনে।

অমৃতা। (দিদিমার কথা শুনিতে না পাইয়া) ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে কেষ্টোঠাকুর বাঁশী বাজাতেন। ঠাকুর ত চিরকাল থাকেন তবে এখন কেন বাঁশী বাজে না? না, এখন আর কেউ তেমন কান পেতে শোনে না, তাই শোনা যায় না? আচ্ছা দিদিমা, আষাঢ় মাসে চানযাত্রা আর শ্রাবণ মাসে ত ঝুলনযাত্রা?

দিদিমা। হাঁ ভাই।

অমৃতা। রাধাকেষ্ট দোলায় ত একসঙ্গে দোলেন, কিন্তু রাধা কই ত রথে ওঠেন না। সুভদ্রা যে কেষ্টঠাকুরের বোন বৃন্দাবনে কেউ ত সে-কথা জানত না। তা সেখানে রথই বা কোথা থেকে আসবে? রাখালের কি রথ থাকে?

মা। এই একরত্তি মেয়ে এত কথা জানে! ছেলেবেলা থেকে ঠাকুরদেবতাদের সব কথা পড়ে।

দিদিমা। তাই ও-সব কথা ওর মনে পড়চে।

অমৃতা। মঞ্জুলা, আমি যখন রথে উঠব তোরা তখন দেখিস্। হয় ত তোরা দেখতেই পাবি নে।

মঞ্জুলা। তুই কি সুভদ্রা হবি?

অমৃতা। তা কেন? আমার জন্য অন্য রথ আসবে। তোরা ভেঁপু বাজাবি আর আমার রথ গড়গড়িয়ে চলে' যাবে।

শেফালিকা। তোর রথের কাছি ধরে' আমরা টানব।

অমৃতা। আমার রথ ঘোড়াতে টানবে,—পক্ষীরাজ ঘোড়া।

মঞ্জুলা। তা হ'লে ত রথ উড়ে যাবে। এরোপ্লেনের মতন।

মা। তোরা মেয়ে-দুটো বড়্ বড়্ করচিস, তোদের খাওয়া হয়েচে?

মঞ্জুলা। না মাসীমা, আজ ছুটি কি না, তাই তেমন তাড়া নেই।

মা। অনেক বেলা হয়েচে, তোমরা খেতে যাও। বিকেল বেলা না হয় এস।

(মঞ্জুলা ও শেফালিকার প্রস্থান।)

মা। অমী, তুমি রোগা মেয়ে এখন একটু ঘুমোও। কেবল কথা কইলে কাহিল বোধ হবে।

অমৃতা। আচ্ছা মা।

অমৃতা পাশ ফিরিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া চক্ষু বুজিল।

দিদিমা। তোমরা দুই জায়ে খেয়ে এস, আমি ততক্ষণ বসে আছি।

মা। আমরা দু-গরস মুখে দিয়ে এখনি আসচি। অমী একটু ঘুমোক।

দুই জা চলিয়া গেলেন। দিদিমা তক্তপোষের নীচে মেঝেতে বসিয়া রহিলেন। কিছু পরে অমৃতার খুড়ীমা ফিরিয়া আসিলেন।

খুড়ীমা। (দিদিমার কানে কানে) মা, এইবার তুমি যাও। দিদিরও হয়েচে, তিনি আসচেন।

দিদিমা নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। অমৃতার মা পা টিপিয়া টিপিয়া ঠোটে আঙুল দিয়া, ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোট জায়ের পাশে বসিলেন।

মা। (ছোট বউয়ের কানে কানে) বেশ ঘুমিয়ে আছে।

অমৃতা। (ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া) হাঁ, মা, আমি ঘুমিয়ে আছি। তুমি যে আমাকে ঘুমুতে বলেছিলে।

মা। ঘুম বুঝি হয় নি, শুধু চোখ মট্‌কে ছিলি?

অমৃতা। না মা, ঘুম কি আর বললেই আসে? তন্দ্রা বুঝি এসেছিল, তন্দ্রার দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। জান ত মা, সে আর একটা দেশ আছে। সে এক মজার ওলট-পালটের দেশ, কোথায় যে কি হচ্চে তার কোন ঠিকঠিকানাই নেই! এই দেখ রাজকন্যার সাম্‌নে ময়ূর নাচচে, আবার কোথাও কিছু নেই পথের ধারে বসে' ভিখারীর মেয়ে কাঁদচে। বাঘ সিঙ্গী যেন কুকুর-বেরালের মতন বেড়াচ্চে। কেবল যেন ভেল্কিবাজী, একটা চোখের সামনে আসে আর একটা মিলিয়ে যায়।

মা। তুমি বুঝি স্বপন দেখছিলে? রোগা হ'লে ও-রকম হয়।

অমৃতা। স্বপন! তা হবে। স্বপনটাই যেন সত্যি আর সব মিথ্যে। তোমদের ঘর-সংসারকে ত তোমরা স্বপন বল না, কিন্তু এ সব কি মিথ্যে নয়?

মা। অত সব বড় বড় কথা তুমি কোথায় শিখলে? ও-সব আমরাই বুঝতে পারি নে।

অমৃতা। মা গো, আমাদের সবাইয়ের চোখে যে ঠুলি বাঁধা। তিনি দয়া করে' যদি খুলে দেন। তাঁর ত ছোট-বড় নেই, বয়সের কোন হিসেব নেই। ধ্রুব-প্রহ্লাদের কত বয়স হয়েছিল? বয়স যে কখন্ ফুরোয়—

দিদিমা আর তাঁর সঙ্গে আর একটি বৃদ্ধা রমণী আসিলেন। অমৃতার কথা বন্ধ হইল। অমৃতার মা ও খুড়ীমা উঠিয়া বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিলেন।

মা। রাঙাদিদি, তুমি কবে এলে? কত তীথ্থি ঘুরে এলে!

রাঙাদিদি। আর মা, কপালে যা ছিল। দ্বারিকায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে পেরভাস। দ্বারিকায় গেলেই পেরভাসে যেতে হয়। পেরভাসে মিলন হয়েছিল কি না। কেষ্টো আর অর্জ্জুন যে নরনারায়ণ ছিলেন।

দিদিমা। (কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া) নরনারায়ণকে নমস্কার। তুমি কত দেখে এলে, তোমাকে দেখলেও পুণ্যি হয়।

রাঙাদিদি। ওসব বাড়াবাড়ি কথা। অমীর বড় অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি দেখতে এলুম।

মা। বাছা আমার কুড়ি দিন ধরে' ভুগচে, আজ একুশ দিন। আজ একটু হালুচালু হয়েছে।

রাঙাদিদি। অমীকে আমার মনে আছে ঠিক যেন মোমের পুতুলের মতনটি ছিল। এখন মেয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েচে, যেন পাতখানি।

অমৃতা। (অস্ফুট স্বরে গুন গুন করিয়া) মাটিকে দেহিয়া মট্টীমে মিল যানা—তাদেলমান! তাদেলমান!

রাঙাদিদি। অমী গুন গুন ক'রে কি গান করচে?

অমৃতা। ও কিছু নয়, ফকীরদের একটা কথা। হাঁ, রাঙাদিদি, দ্বারিকায় কেষ্টোঠাকুর রাজা ছিলেন, সেখানে তাঁর রথ দেখলে ?

রাঙাদিদি। রথ ?

মা। আজ রথ কি না, তাই কেবল রথের কথা কইচে। মঞ্জুলা আর শেফালি এসেছিল, তারা কতকগুলো কদম ফুল দিয়ে গিয়েচে। কদম ফুল দেখে অমী বৃন্দাবনের কত কথা বল্‌ছিল।

রাঙাদিদি। বৃন্দাবনে ক'টাই বা কদম গাছ! আমি ত খুঁজে খুঁজে দেখতেই পাইনে।

অমৃতা। নাইক সে বৃন্দাবন, নাইক সে মদনমোহন! রাঙাদিদি, দ্বারিকায় রথ দেখলে, না শুধু কলা বেচাই সার ?

রাঙাদিদি। শোন কথার বাঁধুনি! এখন ত মেয়েরাও বক্তিমে করে, কিন্তু অমীর মুখের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। না ভাই, রথ থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমরা কই ত দেখি নি।

পথে কোলাহল। রথ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ। রাঙাদিদি ও দিদি-মা একবার বাহিরে গিয়া রথ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। জনতা ও রথের শব্দ দূরে চলিয়া গেল।

অমৃতা। (নিজের মনে মৃদুস্বরে) ঠাকুর যখন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরেন তখন আর রথ নড়ে না, হাজার লোক মিলেও রথ টানতে পারে না। আর জগন্নাথের রথ চাকার তলায় মানুষকে পিষে দিয়ে চলেচে, চাকার সুমুখে যে পড়ে তার আর রক্ষে নেই। সুয্যির রথ চলে আকাশ দিয়ে, রং বেরংগের ঘোড়া, ঘোড়ার পায়ের তলা দিয়ে আলোর ফিন্‌কি ওঠে, আগুনের ধুলো ওড়ে। আলোতে রথ ঢাকা পড়ে।

রাঙাদিদি। (অমৃতার মার মুখের দিকে চাহিয়া) বিব্‌ভুল বকচে ?

মা। বালাই, বিব্‌ভুল কেন বকতে যাবে? ওর কথা শুনলে অবাক্ হ'তে হয়। কত সব জ্ঞানের কথা বলে।

রাঙাদিদি। তাই ত, আমি ভেবেছিলাম শুধু বুঝি তামাসাই করে, তা আমি ত সম্পর্কে ওর ঠানদিদি হই। ঐটুকু মেয়ে, গলা টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, এমন সব কথা শিখ্‌লে কোত্থেকে?

অমৃতা। কলিকাল, কলিকাল! জান না, রাঙাদিদি? কলিকালে সবই অনাছিষ্টি।

রাঙাদিদি। না, না, তা কেন? তোমার ও-সব কথা সত্যি যুগের মতন।

অমৃতা। দিদিমা, শুনলে ত, আমি সত্যিযুগের মেয়ে পথ ভুলে কলিকালে এসে পড়েছি।

দিদিমা। মা, মা, মা! এত কথাও তোর আসে!

অমৃতা। (স্মিতমুখে) ছুটোছুটি করবার এখন ত আর সাধ্যি নেই, মুখখানাই নাড়াচাড়া করি।

রাঙাদিদি। এখন তবে আসি। বউ-মা কাল বাপের বাড়ী গিয়েছে, উল্টো রথের পরে আসবে। সংসারের সব কাজ আমাকেই করতে হচ্চে। অমী শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠুক এই আশীর্ব্বাদ করচি।

মা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে মেয়ে আমার যেন ভাল হয়ে ওঠে।

রাঙাদিদি। তা হবে বই কি! তুমি ভেব না মা, আজ ত অমীকে ভালই দেখাচ্চে। তাঁকে ডাক, তিনি ভাল করে' দেবেন।

অমৃতা। তখন রথে উঠব।

রাঙাদিদি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে দিদিমাও ঘরের বাহিরে গেলেন। অমৃতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মা। দেখতে দেখতে বেলা গেল। একটু পরেই ডাক্তার আসবে। ছুটির দিন বলে' ছেলেরা কে কোথায় বেরিয়ে গিয়েচে, এখনি এসে খাবারের জন্য পাগল করে' তুলবে। যাই, ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

খুড়ীমা। আমি ত রয়েচি দিদি, তুমি কাজ সেরে এস।

মা উঠিয়া গেলেন।

অমৃতা। খুড়ীমা, একটু খাবার জল দাও ত।

খুড়ীমা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) একটা কমলালেবু ছাড়িয়ে দেব ?

অমৃতা। এখন নয়, শুধু একটু জল দাও। (জলপান করিয়া) খুড়ীমা, আমার বুকে একবার হাত দাও ত।

খুড়ীমা। (বুকে হাত দিয়া) এ কি, তোমার বুক অমন ধড়াস্ ধড়াস্ করচে কেন ? নিঃশ্বাস ফেলতে কি কষ্ট হচ্চে ? যাই, দিদিকে ডেকে নিয়ে আসি।

অমৃতা। (খুড়ীমার হাত চাপিয়া ধরিয়া) তোমার কাউকে ডাকতে হবে না। চুপ করে' বসো আমার কাছে। বনের পাখীকে খাঁচার ভিতর পূরলে কি রকম ছট্‌ফট্ করে দেখেচ ? খাঁচার শিকে পাখা-ঝাপটা মারে, কেবল এদিক-ওদিক ঘোরে। খাঁচা খুলে দিলে উড়ে যায়, আর ধড়ফড় করে না। আমার বুকের পাঁজরাগুলো লোহার গরাদে, তার ভিতর থেকে পাখী বেরুবার জন্য ও-রকম করচে।

খুড়ীমা। ও-সব কি কথা ! অমন কথা বলতে নেই।

অমৃতা। শুধু তোমাকে বলচি। রথে উঠলেই আমার সব সেরে যাবে।

(মা ও দিদিমার প্রবেশ।)

খুড়ীমা। অমী অমন করচে কেন ? অসুখ বাড়েনি ত ?

মা। (অমৃতার কাছে আসিয়া) কি হয়েচে মা ? অসুখ করচে ? কোন কষ্ট হচ্ছে ?

অমৃতা। একটু যেন কি রকম বোধ হচ্ছে। আমি কি ভাবচি জান ? এই যে সোজা রথে যাব, উল্টো রথে আর আস্‌ব না।

মা। ও কি রকম কথা! রথের কথা বলতে নেই। এখুনি ডাক্তারবাবু আসবেন, তিনি ওষুধ দিলেই সেরে যাবে।

অমৃতা। আমার কষ্ট কিছু ত হয় নি। তা বেশ ত, ডাক্তার বাবু আসুন।

একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রবেশ। ইনি অমৃতার মাতার মামা। তাঁহার পিছনে মঞ্জুলা ও শেফালিকা।

বৃদ্ধ। আজ পথে বড় ভিড়, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

মা। মামা, তুমি ত কবিরাজ, একবার অমীকে দেখ ত। মেয়ে যেন কি রকম করচে।

অমৃতা। দাদাবাবু এয়েচ ? মঞ্জুলা শেফালি তোরাও এসেচিস্ ?

বৃদ্ধ অমৃতার নাড়ী দেখিলেন। এমন সময় অমৃতার পিতা আপিসের পোষাকে আসিলেন। অমৃতার মুখ দেখিয়া, ঘরে আর সকলের মুখ দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ নাড়ী দেখিলেন। তিনি নাড়ী দেখিতেছেন এমন সময় ডাক্তারবাবুও আসিলেন।

বৃদ্ধ। (অমৃতার হাত ছাড়িয়া দিয়া) ডাক্তারবাবু, আপনি দেখুন।

ডাক্তারবাবু। আপনি কেমন দেখলেন ?

বৃদ্ধ। বলচি। আপনি আগে দেখুন।

ডাক্তার অমৃতার হাত দেখিলেন।

অমৃতা। (একবার হাঁপাইয়া, অল্প হাসিয়া ক্ষীণ স্বরে) ডাক্তারবাবু, কেমন দেখচেন? দাদাবাবু, আমার জন্য রথ আসচে, জান?

বৃদ্ধ। ও কি বলচে?

দিদিমা। আজ রথ কি না, সারাদিন বলচে রথে উঠবে।

ডাক্তার ও বৃদ্ধ ঘরের বাহিরে আসিলেন। অমৃতার পিতা বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া অমৃতার পাশে দাঁড়াইলেন। মাতা অশ্রুসিক্তনয়নে অমৃতার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। খুড়ীমা মাথায় ঘোমটা দিতে ভুলিয়া গিয়া অন্য পাশে দাঁড়াইলেন। দিদিমা কাছে দাঁড়াইয়া। মঞ্জুলা ও শেফালিকা অমৃতার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মুখ দেখিতেছে।

ঘরের বাহিরে ডাক্তার ও বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার। নাড়ী নেই!

বৃদ্ধ। তেমন বিশেষ শ্বাসেরও লক্ষণ নেই। খুব অল্পক্ষণ মেয়াদ। মকরধ্বজ আর মৃগনাভি দিয়ে দেখা যাক্।

ডাক্তার। তাই দেখুন।

দু'জনে আবার ঘরে আসিলেন। বৃদ্ধ খলে মকরধ্বজ ও মৃগনাভি মাড়িয়া অমৃতাকে সেবন করাইতে গেলেন। অমৃতা মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল।

অমৃতা। ও-সব আর কিছু না। দেখচ না সব বাঁধন খুলে গিয়েচে? শুধু রথ আসতে বাকি। দেখ—বাবা, এঁদের বেশী কাঁদতে দিও না, কান্নার সুর আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

মা। ও মা, আমায় কিছু বলবি নে?

অমৃতা। মা আসি। এর পর আবার সব—কথা হবে। খুড়ীমা, দিদিমা, দাদাবাবু, সবাই পায়ের ধুলো দাও। হাঁ মা, এত অন্ধকার

কেন ? ওই আলো—আলো—আলো ! রথের চাকায় আলো ! কে গা তুমি রথে বসে ? ঠাকুর, তুমি ? এই যে যাই !

অমৃতার একটি ছোট নিঃশ্বাস পড়িল, তাহার পর স্তব্ধ। চক্ষু স্থির, সর্ব্বাঙ্গ স্থির।

বাবা। হা ভগবান, তোমার মনে এই ছিল !

বৃদ্ধ। স্বর্গ থেকে রথ নেমে এসেছিল তাইত উঠে—

মা। অমৃতা ! অমৃতা ! মা ! দেবী ! দেবী !

পদ্ম পিসীমা

—১—

কুমুদিনী বল্‌লেন,—আজ পিসীমা আস্‌বেন।

কুমুদিনী বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রী। বিশ্বনাথ একটা আফিসের বড়বাবু। কুমুদিনীর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে, রং গড়ন মাঝামাঝি, মুখখানি হাসি-হাসি, শরীর গোলগাল, ধরণ-ধারণ বেশ গিন্নীবান্নীর মতন। তাঁর কাছে পাড়ার রাম মিত্রের স্ত্রী বসেছিলেন। বয়স কুমুদিনীর চেয়ে কিছু কম। নাম হেমলতা।

হেমলতা বল্‌লেন,—কে? পদ্ম পিসী?

—আমাদের আর ত কোন পিসী নেই। উনি ছয় মাসে বছরে একবার করে' আসেন।

পদ্ম পিসীর কথা হ'তে লাগ্‌ল। তিনি রাণাঘাটের কাছে একটি গ্রামে থাকেন। বিধবা, ছেলেপুলে নেই, স্বামী কিছু টাকাকড়ি রেখে গিয়েছেন, তাইতে তাঁর চলে, কারুর কাছে হাত পাত্‌তে হয় না, বরং পূজার সময় ভাইঝিকে, তাঁর ছেলেমেয়েকে কাপড়-চোপড় কিনে দেন। বয়স তেমন বেশী নয়, এখনো পঞ্চাশ পার হয় নি। খুব যে বেশী সেকেলে, তাও নয়, পড়াশুনা বেশ আছে, বেশ আমোদে-আহ্লাদে আর কথার ভারি চটক।

হেমলতা বল্‌লেন,—পিসীমা মানুষ বেশ, কিন্তু কার সাধ্য তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় !

—কিন্তু মনে কিছু নেই, একেবারে গঙ্গাজল। শুন্‌তে পাই, ছেলেবেলা থেকে নাকি ওঁর খুব মুখের ধার। এদিকে দয়ামায়া কেমন, তা ত তুমি দেখেছ ?

—সে-কথা আর বল্‌তে। অমন আর একটি মানুষ মেলা ভার। এখন উঠি ভাই, তিনি এলে আবার আসব।

হেমলতা বাড়ী গেলেন। পিসীমা বিকেলবেলা এলেন। তাঁর জন্য বাড়ীর গাড়ী পাঠান হয়েছিল, বাড়ীর এক ছেলে তাঁকে আন্‌তে গিয়েছিল। তিনি বাড়ীতে ঢুক্‌তেই চার দিক্ দিয়ে তাঁকে নমস্কার কর্‌বার ধুম প'ড়ে গেল। কুমুদিনী দরজাগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন, পিসীমা আস্‌তেই পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলেন। পিসীমা তাঁর থুঁতি ধ'রে নিজের হ'তে চুমো খেলেন। বল্‌লেন,—কুমি, ভাল আছিস্ ত ? কত দিন তোদের দেখি নি।

পিসীমা বারান্দায় উঠ্‌তে তাঁকে প্রণাম করবার জন্য কাড়া-কাড়ি প'ড়ে গেল। কুমুদিনীর দুই ছেলে, দুই মেয়ে ; বড় মেয়ের বয়স উনিশ বছর, শ্বশুরবাড়ী থেকে সম্প্রতি এসেছে। তার পর ছেলে সতের বছরের, কলেজে পড়ে। তার পর আর একটি চোদ্দ বছরের ছেলে, ছোট মেয়েটি এগার বছরের। আবার গুটিকতক ভাসুরপো-ভাসুরঝিও আছে। মা ষষ্ঠীর কল্যাণে বাড়ীতে ছেলেমেয়ের অভাব নেই। তারা যদি ছাড়্‌লে,—তার পর ঝি-চাকরের পালা। চাঁপা পুরানো ঝি, মাটীতে ঢিপ্ ক'রে মাথা ঠেকিয়ে বল্‌লে,—পিসীমা, গড় করি।

ঘরে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই ছেলেমেয়েরা আবার ছ্যাঁকাবাকা ক'রে ধর্‌লে, দিদিমা, আমাদের জন্য কি এনেছ ?

কুমুদিনী বল্‌লেন,—আঃ, তোরা এমন ব্যস্ত করিস্ কেন? এই ত সবে বাড়ীতে পা দিয়েছেন, রেলের কাপড় ছাড়ুন, মুখে হাতে একটু জল দিন্, তার পর না হয় আসিস্।

পিসীমা বল্‌লেন,—না রে না, তোরা থাক্। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কি আর এমন জিনিষ পাওয়া যায় যে, আমি তোদের জন্য নিয়ে আস্‌ব? তা শুধু হাতে ত আসতে নেই, যা পেয়েছি, নিয়ে এসেছি।

পিসীমার সঙ্গে ছিল একটি প্যাঁটরা আর একটা পুঁটুলী। সেই দুটো খুলে সকলের হাতে খাবার দিলেন, ছোটদের পুতুল, আর গোটাকতক ঝুনা নারিকেল কুমুদিনীর হাতে দিলেন। পুঁটুলীর ভিতর গোটাকতক্ চাল্‌তা ছিল, তা-ও বেরুল। জিনিষ ত ভারি, কিন্তু তাই পেয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোকের আহ্লাদ দেখে কে!

সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ আফিস থেকে এসে পিসীমাকে প্রণাম কর্‌লেন। পিসীমা বল্‌লেন,—বাবা, ভাল আছ ত?

—হ্যাঁ পিসীমা, আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভাল।

রাত্রি হ'তেই ছেলেমেয়ের দল পিসীমাকে ঘিরে বস্‌ল। কুমুদিনী হেসে বল্‌লেন,—ছেলেরা সব পিসীমাকে পেয়ে বসেছে।

পিসীমা বলিলেন,—ওরা ত রোজ রোজ আর আমাকে পায় না, কত দিন পরে এসেছি, একটু গল্পগুজব কর্‌বে না?

কুমুদিনী সংসারের কাজে গেলেন। পিসীমার কাছে ব'সে ছেলেমেয়েরা তাঁর দেশের খবর জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল। অধিকাংশই শোনা কথা; কেননা, দু'চারজন বড় ছেলেমেয়ে ছাড়া তারা কেউ কখনো পিসীমাদের দেশে যায় নি। তবু জিজ্ঞাসা করা ফুরোয় না। গ্রামে রাসের মেলা কেমন হয়েছিল, পিসীমার বাগানে এ-বছর আম হয়েছিল কি না, চৌধুরীদের পুকুরে মাছ কি রকম, পরাণ ঘোষের

নতুন বাড়ী কতদূর হ'ল, এই রকম কত কথা। তার পর সকলে পিসীমাকে নিজেদের খবর শোনাতে আরম্ভ করলে। মেয়েদের কার কার নতুন বন্ধু হয়েছে, সে-কথা হ'ল; ইস্কুলে যে-সব মেয়েরা পড়ে, তাদের মধ্যে কার কার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, কে নতুন মাষ্টার এসেছে, এবার স্বদেশী মেলা কেমন হয়েছিল, এই সব কত কি পরিচয় দেওয়া হ'ল।

কুমুদিনীর বড় ছেলে ব্রজনাথ—ডাকনাম ভোঁদা—কলেজে পড়ে কি না, তাই তিনি একটু চালাক। মাঝখান থেকে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল, হ্যাঁ দিদিমা, তোমার নাম পদ্ম হ'ল কেন? তুমি বুঝি দেখ্‌তে পদ্ম-ফুলের মত ছিলে?

ছেলেবেলায় পিসীমা দেখতে কেমন ছিলেন, তা ত আমরা জানি না, তবে সুন্দরী যে ছিলেন, তা বুঝিতে পারা যায়। এখনো চুল তেমন পাকে নি, এখনো মুখখানি ঢলঢলে, চোখ ভাসা-ভাসা, এখনো হাসলে গালে টোল খায়। পিসীমা বল্‌লেন,—বাপ-মা ত আমায় জিজ্ঞাসা ক'রে আমার নাম রাখে নি! আমি আর যাই হয়— আফিংখোর কমলাকান্তের পদী পিসী ত নই! আর তোর নাম ভোঁদা হ'ল কেন?

ঘরশুদ্ধ ছেলেমেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। ব্রজনাথ অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে, ও ত আমার ভাল নাম নয়।

—রেখে দে তোর ভাল নাম! কাচের আলমারীতে তোর কি নাম তোলা আছে—তার কে খোঁজ রাখে রে! দেশসুদ্ধ লোক তোকে কি ব'লে ডাকে? আ মরি, নামের কি ছব্বা! ভোঁদা, ভোঁদা! গোঁড়া নেবুর মত টক জোঁদা! আর আমার নাম? কথায় বলে, আহা পদ্ম-ফুলের মত দেখতে!

সব ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। ব্রজনাথের বড় বোন্ উমা বল্‌লে, কেমন, দিদিমার সঙ্গে আবার লাগবি? কলেজে দু'খানা ইংরিজি বই পড়লেই হয় না। দিদিমার কথায় কেউ এঁটে ওঠে না, তুই ওঁর সঙ্গে পারবি?

আর এক মেয়ে বল্‌লে,—একটা নতুন ছড়া শিখলাম—

ভোঁদা, ভোঁদা, ভোঁদা,
গোঁড়া নেবুর মত টক জোঁদা।

ভোঁদা ত পালাবার পথ পায় না। সে রাত্রের পালা সায় হ'ল।

—২—

তার পরদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পিসীমা কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—হ্যাঁ রে, হিমুরা সব ভাল আছে ত?

হিমু হলেন হেমলতা। কুমুদিনী বল্‌লেন,—হ্যাঁ পিসীমা, তারা সব ভাল আছে। হিমু কাল এসেছিল, তোমার আসবার কথা সে জানে।

এই কথা হচ্ছে, এমন সময় হেমলতা এসে উপস্থিত। পিসীমাকে নমস্কার করতেই তিনি বল্‌লেন,—এই যে হিমু, এইমাত্র তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। তুমি চিরজীবী হয়ে থাক্‌বে।

—পিসীমা, মেয়েমানুষের পক্ষে এমন কথা কি আশীর্ব্বাদ? বরং আশীর্ব্বাদ কর, যেন ওঁকে আর ছেলেদের রেখে যেতে পারি।

—তা মা, সত্যি কথা। সাজান সংসার রেখে যাওয়া মেয়েমানুষের বড় ভাগ্যির কথা। তুমি ভাগ্যবতী, পাকা চুলে সিঁদুর পর্‌বে।

—পিসীমা, খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তোমাদের দেশের

কাছে কোথায় না—কি দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। বড় জাগ্রত দেবতা। সত্যি কি?

—সত্যি বই কি! সব কথা বুঝি তোমরা শোন নি? গ্রামে একঘর বামুন আছে, তার স্বপন হ'ল যে, দেবী তার ঘরে আসবেন। স্বপনে দেখে অন্নপূর্ণার রূপ, রূপে ঘর আলো ক'রে মা তার শিয়রে দাঁড়িয়া বলছেন, দেখ্ তুই বড় দুঃখী, আমি এলে তোর দুঃখ ঘুচে যাবে। পঞ্চাননতলা দিয়ে যে পথ গাঁয়ের বাইরে গিয়েছে, সেই পথে অশ্বত্থ গাছের উত্তর ধারে আমি আছি। আমাকে তুলে নিয়ে এসে ঘরে রাখ্, তার পর আলাদা মন্দিরে রাখ্‌বি। স্বপন পেয়ে বামুন সেই গাছতলায় খুঁড়ে দেখে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর রয়েচেন! তুলে নিয়ে এসে ঘরে রাখ্‌লে, আর দেখতে দেখতে চারিদিকে কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। আশপাশের গ্রাম থেকে, দূরের গ্রাম থেকে কত লোক মানত্ ক'রে আস্‌তে লাগ্‌ল, কত লোক হত্যা দিতে আসতে আরম্ভ করলে। ভারি জাগ্রত দেবতা। কত লোকের রোগ-বালাই সেরে গিয়েছে, কত লোক ঠাকুরকে সোনার গহনা গড়িয়ে দিয়েছে। বামুনের বড় কষ্ট ছিল, এখন বেশ সচ্ছল সংসার। ঠাকুরের মন্দির হয়েছে, বামুন প্রায় মন্দিরেই থাকে, মা'র আরতি করে, ভোগ দেয়, এমন ভক্তি দেখি নি। সাধে কি মানুষে ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করে?

কুমুদিনী আর হেমলতা ব'লে উঠলেন,—পিসীমা, এক দিন আমরা দর্শন করতে যাব।

—যাবে বই কি। এত লোক যাচ্ছে, তোমরা যাবে না কেন? আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

—তা ত যাবেই, তোমাকে কি আমরা ছেড়ে যাব?

অন্য কথাবার্ত্তা হ'তে লাগ্‌ল। পিসীমা বল্‌লেন,—আগে আগে সহুরে আর পাড়াগাঁয়ের লোক একটু আলাদা আলাদা রকম হ'ত। সহরে খরচপত্র বেশী, সকলে নিজের নিজের ধন্ধা নিয়ে থাকে, কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। পাশের বাড়ীতে কে থাকে, হয়ত তার নামই জানে না। পাড়াগাঁয়ে তবু ঢের ভাল, পাড়াপড়শীর খোঁজ-খবর রাখে, বিপদ-আপদে বুক দিয়ে পড়ে। কিন্তু সেটাও ক'মে যাচ্ছে। এখন দেশে ব'সেও কেবল সহরের কথা। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা সহরে পড়তে আসে, বাবুরা চাকরী কর্‌তে আসে। মনে করলেই এখানে আসা যায়, রেলের পথ, নৌকাতে আর ক'জন যাওয়া-আসা করে? যা এখানে হবে, পাড়াগাঁয়েও তাই, সব যেন এক হয়ে গিয়েছে।

হেমলতা বল্‌লেন,—তুমি ত পিসীমা অনেক দেখেছ শুনেছ, আমরা ত কিছুই দেখি নি, তবু মনে হয়, সব যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে।

কথার মাঝখানে চাঁপা ঝি এসে খবর দিলে, পিসীমা, তালতলার দাদাবাবু এসেছে।

দাদাবাবু পিসীমার ভাসুরপো বিপিন, বছর কুড়ি বয়স, বি-এ পাশ করেছে। পিসীমা বল্‌লেন,—ডেকে নিয়ে আয় না!

হেমলতা বল্‌লেন,—আমি উঠে ঘরের ভিতর যাই। আমি ত কখনো ওঁর সুমুখে বেরুই নি।

পিসীমা বল্‌লেন,—তার আর কি হয়েছে? তোমার ছেলের বয়সী, ওর কাছে আবার লজ্জা কি?

হেমলতা ব'সে রইলেন। বিপিন এসে আগে পিসীমাকে প্রণাম কর্‌লে, তার পর কুমুদিনী আর হেমলতাকে। বাড়ীর কে কেমন

আছে, জিজ্ঞাসা ক'রে পিসীমা বল্‌লেন,—হ্যাঁ রে, আজকাল তোদের কি যে সব কাণ্ডকারখানা হচ্চে, কিছুই বুঝতে পারি নে।

—কেই-বা বুঝতে পারে? এই দু'মাস রাজবাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে কাটিয়ে এলাম। ঠিক রাজভোগ নয়, মোটা চাল আর কলায়ের ডাল, তবু ত ঘরের ভাত বেঁচে গেল! আগে লোকে বল্‌ত হরিণবাড়ী, এখন বলে রাজবাড়ী।

—শুনলে ছেলের কথা! জেলে যাওয়া কি বড় পৌরুষের কথা?

—বড় লজ্জার কথা, যদি দুষ্কর্ম্ম ক'রে জেলে যেতে হয়। আমরা এই যে হাজার হাজার লোক, আমরা কি চুরি-ডাকাতি করেছি, না খুন-খারাপি করেছি? কোনখানে যদি সভা হয়, আর কেউ যদি সভায় যায় ত তার জেল হবে! ভাল কথা! রাজার মর্জ্জি! এইবার যদি পথে হাঁটতে কেউ হাঁচে কিংবা কাসে ত তার বেত-পেটা হবে!

—এ আবার কোন্‌দেশী আইন? যা তা আইন কর্‌লেই হ'ল?

—তা না হ'লে সরকারী ব্যবস্থার বাহাদুরী কি? এ-রকম জেলে যেতে আর অপমান কি? যারা বেরিয়ে আসে, তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে যায়। এই দেখ না—কত বড় বড় লোক জেলে গেল।

—তা হ'লে তুইও বড়লোক হ'লি?

—না-ই বা হলাম! বড় লোকের সঙ্গে ত জেলে ছিলাম।

পিসীমা চুপ ক'রে একটু ভাবলেন, তার পর বল্‌লেন,—দেশের অদৃষ্টে কি যে আছে, ভেবে পাই নে।

বিপিন বল্‌লে,—যাই থাক্, লোকের একটু চৈতন্য হয়েছে। একটু ঘা না খেলে কি মানুষের মনে লাগে? এখন তবু লোকে বুঝতে পার্‌ছে যে, অনেক কষ্ট স্বীকার না কর্‌লে দেশের মঙ্গল হবে না।

—তাও ত বটে। জননী জন্মভূমি বলেছে ত। তা যাঁকে মা বল্‌ছে, তাঁর জন্য অনেক দুঃখ সহ্য কর্‌তে হয়।

কুমুদিনী বিপিনের জন্য রেকাবি ক'রে জলখাবার এনে তার হাতে দিলেন।

পিসীমা বললনে,—হ্যাঁ রে বিপিন, তুই ত তিনটে পাশ করেছিস্, এখন কি করবি?

—কি আর কর্‌ব? এখনো ত কর্ম্মভোগ ফুরোয় নি, এখন এম এ পড়ব।

—ও আবার কোন্‌দেশী কথা! লেখাপড়া শেখা কি কর্ম্মভোগ্?

—তা কেন? তবে পাশ করা ত আর লেখাপড়া নয়!

—তোর সবই অনাছিষ্টির কথা! আবার লেখাপড়া কাকে বলে?

—একজামিন পাশ করা কেবল কতকগুলো বই গেলা। হজমও হয় না, বিদ্যাও হয় না। বিদ্যা শিখতে হ'লে তার পর শিখতে হয়।

—কেন, পাশ ক'রে ছেলেরা ত রোজগেরে হ'ত।

—সে-কাল আর নেই। এখন পাশ কর—তার পর ভেরেণ্ডা ভাজ!

—সে-কথাও ত সত্যি। কত পাশ-করা ছেলে সব ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও কিছু পায় না।

—কোত্থেকে পাবে? উকীল ডাক্তার কেরাণী কত জন হবে? আমরা শুধু মার্কা-মারা মাল, তা বাজারে এ-মাল চলে না। যেখানেই যাই, পাবার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র! মাড়োয়ারীরা স্কুলেও যায় না, পাশও করে না, এদিকে অর্দ্ধেক কলকেতা সহর দখল ক'রে নিয়েছে। যে টাকাটা আমরা কলেজের পাদপদ্মে ঢালি, সেই টাকা দিয়ে মুদির দোকান করলে তবু পেট চল্‌ত।

পিসীমা বল্লেন,—তাই ত, এ সব ত ভাববারই কথা। তোরা সব এই বয়সে এত রকম ভাবছিস্, আগে কারুর কোন ভাবনা ছিল না, দু'-বেলা দু'-মুঠো ভাত পেলেই নিশ্চিন্তি।

—সে-কাল গেছে, আর ফিরবে না।

চাঁপা এসে হেমলতাকে বল্লে,—বউ-দিদি তোমার গাড়ী এয়েছে; সইস বল্‌ছে, ঘোড়া দাঁড়াচ্ছে নি।

পিসীমা হেসে বললেন,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পা ব্যথা হয়ে থাকে ত একটু বসতে বল্ না!

হাসির রোল উঠ্‌ল। হেমলতা চ'লে গেলেন। আর একটু পরে বিপিনও উঠে গেল।

—৩—

পৌষ মাস। পৌষ মাসে কলিকাতায় দুটি তীর্থস্থানে খুব ভীড় হয়, এক ভবানীপুর কালীঘাটে কালীর মন্দিরে, আর এক খিদিরপুর ঘোড়-দৌড়ের মাঠে। ট্রাম, মোটর, বাস্, খিদিরপুরের দিকে বেশী; কেননা, রেস-খেলায় সকল জাতের সমন্বয়, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের কোন ভেদ নেই, কালা-গোরার বিচার নেই। ট্রামে গুজরাটী, মাড়ওয়াড়ী, পঞ্জাবী, হিন্দু, মুসলমান সকলেই আছে, সকলের কাছে টিপ্ আছে, ট্রামে ব'সে ব'সেই বাজী রাখ্‌ছে। এক জন হয় ত হাত বাড়িয়ে বল্‌সে কেৎনা খাওগে? আর এক জন তার হাতে তালি দিয়ে বল্লে, দশ রুপ্‌ইয়া। অমনি বাজী হয়ে গেল। এরা এক রকম যাত্রী, আর কালীঘাটের যাত্রী অনেকেই গরীব, অনেকে হেঁটে চলেছে, বড় জোর না হয় ট্রামে ক'রে।

কলিকাতায় আস্‌বার দু'-চার দিন পরে পিসীমা কুমুদিনীকে বল্লেন,—একদিন পোষ কালী দর্শন করতে যেতে হবে।

—যে-দিন ইচ্ছে গেলেই হ'ল, পিসীমা। বাড়ীর গাড়ী রয়েছে, যে-দিন বল্‌বে, তোমার জন্য গাড়ী থাক্‌বে। অমাবস্যার দিন যাবে ?

—না বাছা, অত ভিড়ের দিন গিয়ে কাজ নেই। চ না, এরি মধ্যে এক দিন দর্শন ক'রে আসি !

—কবে যাবে, বল, ?

—গাড়ীর যদি সুবিধা হয় ত কাল গেলেই হয়।

গাড়ীর আবার সুবিধা-অসুবিধা কি ? তোমার জন্য গাড়ী চাই —তার আবার কথা !

বিশ্বনাথ খেতে বসেছেন, পিসীমা পাখা-হাতে মাছি তাড়াচ্ছেন। কুমুদিনী বল্‌লেন,—কাল পিসীমা কালীঘাটে যাবেন, গাড়ী চাই। পিসীমা বল্‌ছিলেন,—গাড়ীর সুবিধা হবে কি ?

হেসে বিশ্বনাথ বল্‌লেন,—গাড়ীর কথা আমি ব'লে দিচ্ছি। আমি ট্রামে কি ঠিকা গাড়ী ক'রে আফিস যাব। পিসীমার সঙ্গে তুমি যেও, আর ছেলে-মেয়েদের যাকে ইচ্ছে হয়, নিয়ে যেও !

রাত পোহাতেই কালীঘাটে যাবার ধুম প'ড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা —যাদের স্কুল-কলেজ নেই তারা পিসীমাকে চেপে ধর্‌লে,তারাও যাবে। পিসীমা কুমুদিনীকে বললেন,—ওদেরই বা মনে দুঃখ থাকে কেন ? আর একখানা গাড়ী ডাক্‌তে বল।

দু'খানা গাড়ী ক'রে সকলে কালীঘাটে গেলেন। চাঁপা ঝি পিসীমার গাড়ীর পিছনে বসেছিল।

বিশ্বনাথ যাদের যজমান—সেই হালদারদের বাড়ীতে নেমে পিসীমা কুমুদিনীকে সঙ্গে ক'রে ধূলোপায়ে কালীদর্শন করতে গেলেন। ছেলেরা গরম গরম বেগুনী কিন্‌তে ছুট্‌ল।

পিসীমা বললেন,—এ যে পথ-ঘাট অনেক বদলে গিয়েছে! মন্দিরের আশে-পাশে ভেঙ্গে চুরে বড় রাস্তা হয়েছে।

কুমুদিনী বললেন,—মিউনিসিপালিটি থেকে সব পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে, চারদিকে তেমন আর ঘিঞ্জি নেই।

পিসীমা মন্দিরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্ছিলেন। মন্দিরের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে নানা রকম বিজ্ঞাপন লেখা। পিসীমা বললেন,—এ আবার কি? কালীর মন্দির কি বড় রাস্তা, না কারুর কেনা বাড়ী? মন্দিরের চারিদিকের দেয়ালে সব দোকানওয়ালাদের বিজ্ঞাপন! এর নাম কি ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তি? মন্দিরের ভিতর এত টাকা পড়ছে, হালদাররা বড়মানুষ হয়ে গেল, চারদিকে বড় বড় ইমারত, এতে কি হয় না? আবার ঠাকুরের মন্দিরের দেয়াল-ভাড়া টাকা তুলছে! আমরা হিঁদু, হিঁদুয়ানীর এত ডবডবা দেখাই, আর এমনতর দেখে কারুর মুখে একটি কথা নেই? মুসলমানদের মসজীদে কি খৃষ্টানদের গির্জ্জের দেওয়ালে কেউ এমন ক'রে লিখুক্ দেখি, কেমন তার মাথা থাকে! ওরা আমাদের চেয়ে ঢের ভাল!

কুমুদিনী ত অবাক্। বললেন,—সত্যিই ত পিসীমা, এত লোকের কারুর নজরে ঠেকে না! তুমি ত ঠিক কথাই বলেছ! চারদিকে ত এত হই-চই, এটা কারুর চোখে পড়ল না!

চাঁপা পিছন থেকে বললে,—বলবে নি, পিসীমা বল্‌বে নি ত কে বলবে? সউরে লোক ত চোখ থাক্‌তে কাণা, পিসীমা এসেই দেখেছে! ও মা, কোথা যাব! কালীঠাকরুণের মন্দিরের দেওয়াল কি ভাড়া দিতে আছে?

কালীঘাট থেকে ফির্‌তে বেলা প্রায় তিনটে হ'ল। চৌরঙ্গীতে এসে এক যায়গায় খানিকক্ষণ গাড়ী দাঁড় করাতে হ'ল, সামনে পাশে

অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, রেসের জন্য ভিড়। পিসীমা দেখলেন, তাঁদের গাড়ীর একটু দূরে একখানা বড় মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোটর খোলা, ভিতরে একজন স্ত্রীলোক ব'সে। বয়স অল্প, বেশ সুন্দরী, কাপড়-চোপড় খুব দামী, চোখে নাকটেপা চসমা, মাথার চুল বব করা। পিসীমা ঠাহর ক'রে দেখে বললেন,—ওকে যে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! কুমু, তুই চিনিস্ ওকে?

কুমুদিনী বললেন,—চিনি বই কি পিসীমা! ও যে ইন্দুবালা, এখন মিসেস্ মজুমদার, ওরা চৌরঙ্গীতে বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকে।

—তবে বুঝি আমার চোখের দোষ হয়েছে! ইন্দু ত ভাজনঘাটের মেয়ে, আইবুড়ো বেলা কতবার দেখেছি, কতবার আমাদের বাড়ী আস্ত, ওর মা'র সঙ্গে কত নক্স খেলেছি। তবে ওকে দেখেই চিন্‌তে পারলুম না কেন, বল ত?

কুমুদিনী একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন,—পিসীমা, চুল কেটে ফেললে হয় ত মানুষের মুখ একটু বদলে যায়!

—এইবার বুঝতে পেরেছি! তাই ভাবছিলুম, চিনি-চিনি কর্‌ছি —অথচ চিনতে পার্‌ছি নে কেন? চুল কেটে ফেললে মুখ আর এক রকম হয়ে যায় কি না! আর ওর এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চুলের মধ্যে মুখখানি যেন ছবিখানি আঁটা। আহা, ইন্দুর বুঝি বড় অসুখ করেছিল, অনেক দিন জ্বর হয়েছিল, তাই বুঝি ডাক্তারে চুল কেটে দিয়েছে? ডেকে জিজ্ঞাসা করব?

কুমুদিনী তাড়াতাড়ি বললেন,—না পিসীমা, রাস্তার মাঝখানে কাজ নেই; ওরা ত আমাদের মত নয়, কি জানি কি মনে করবে।

কুমুদিনীর মনে হচ্ছিল, তাঁর আর পিসীমার কপালে মস্ত ফোঁটা, সদ্য কালীঘাটের ফেরত; মিসেস্ মজুমদার রেসে যাবার জন্য ব্যস্ত,

হাতের ছাতা ঘোরাচ্ছেন, আর মুখ তুলে দেখ্‌ছেন, কতক্ষণে পাহারা-ওয়ালা আর সার্জ্জন হাত নামায়। এমন সময় তাঁকে সম্ভাষণ না করাই ভাল। আর চুলের কথা? সেটা পিসীমাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

তাই কুমুদিনী আবার বল্‌লেন,—পিসীমা, মিসেস্ মজুমদারের কোন অসুখ করেনি। চুল আপনি কেটেছে।

—বলিস্ কি রে! সধবা মেয়েমানুষ, অমন সুন্দর চুল, পাগল ত আর হয় নি যে, সাধ ক'রে চুল কেটে ফেল্‌বে!

—হ্যাঁ পিসীমা, মেমেরা এখন ঐ রকম চুল রাখে, তাই দেখাদেখি আমাদেরও কেউ কেউ—

—এইবারে বুঝেছি। ফ্যাসান, হাল ফ্যাসান! একখানা ছবিতে দেখেছিলুম বটে, তা আমার মনে হ'ল, মেমসাহেবের একজ্বরী হয়ে থাক্‌বে, তাই চুল কেটে দিয়েছে। আমরা হলাম পাড়াগেঁয়ে মুখ্‌খু মানুষ, আমরা অতশত কি জানি! আর ছাখ্; ছবিতে দেখলুম, মেমের ঘাগরার নীচেও খানিকটা কাটা, আধখানা পা বেরিয়ে আছে। সেটাও কি ফ্যাসান?

—হ্যাঁ পিসীমা।

—তা হ'লে আমাদের মেয়েদের মেম সাজতে হ'লে ত ঠ্যাঙে ওঠা কাপড় পরতে হবে! উপরেও ফ্যাসান, নীচেও ফ্যাসান!

সার্জ্জনের হাত নেমেছে, মিসেস্ মজুমদারের মোটর বেরিয়ে গিয়েছে, কুমুদিনীদের গাড়ী আবার চলেছে। কুমুদিনী ত হেসে অস্থির, বল্‌লেন,—ও পিসীমা, তোমার সঙ্গে কেউ কখনো পারবে না। কালীঘাটের পাণ্ডা, সাহেব, মেম, উকীল, জজ সব হেরে যাবে।

পিসীমা অন্য কথা পাড়লেন।

—৪—

সন্ধ্যার সময় পিসীমার দরবার বস্‌ল। ছেলে বড় সকলেই হাজির, সকলের ডাক পড়েছে। বিশ্বনাথ এসে এক পাশে বস্‌লেন। পিসীমা বল্‌লেন,—দেখ বাবা, আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, একে মুখ্‌খু-সুখ্‌খু মানুষ, তার পর সহরের কিছু জানিনে, চোখে কিছু নতুন ঠেক্‌লে জিজ্ঞাসা করতে হয়। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, কত দেখেছ শুনেছ, আমরা যেটা বুঝতে পারি নে, সেটা বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে। আজ এই কালী-ঘাটে গিয়ে একটা দেখলুম, কুমুদিনীকে বলেছি।

বিশ্বনাথ বল্‌লেন,—কি দেখলেন, পিসীমা?

—মন্দিরের বাইরে দেয়ালে দেয়ালে কি-সব বিজ্ঞাপন লেখা রয়েছে, দোকানদারদের জিনিষ-পত্তরের। আচ্ছা, একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, এই কলকেতা সহরে মোছোলমানদের কত মসজীদ আছে, সাহেবদের গির্জ্জে আছে, ইহুদীদের গির্জ্জে আছে, জৈনদের মন্দির আছে, ব্রাহ্মসমাজের মন্দির আছে, আর্য্য-সমাজের মন্দির আছে, শীখদের গুরুদোয়ারা আছে। কোনও জাতের দেবতার মন্দিরে এ-রকম দোকানীপসারীর বিজ্ঞাপন লিখতে দেয়? কালীঘাট পীঠস্থান, দেশ-দেশান্তর থেকে কত লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসে, মায়ের মন্দিরে কি এ-রকম বিজ্ঞাপন লিখতে আছে? একবার আমি কাশীতে ছিলাম, দেখি, রেলে করে অনেক খোট্টা কলকেতায় আস্‌ছে। তারা সব যাত্রী, গাড়ীতে ওঠবার সময় সব চেঁচিয়ে উঠল, কালী কলকত্তেওয়ালী! কালী মাঈকি জয়! সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে আর সেই পঞ্জাব পর্য্যন্ত, কোথা

থেকে লোক কালী দর্শন কর্‌তে না আসে! তা মন্দিরে এ-রকম করা কি ভাল?

—না, পিসীমা, ভাল আর কিসে?

—আর কোন জাত তাদের দেবতার জায়গায় এরকম কর্‌তে দেয়?

—কার সাধ্য এ-রকম করে।

—তবেই হ'ল যে আমরা আমাদের দেবতার সম্মান কর্‌তে জানিনে। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

—আমি আর কি বল্‌ব, পিসীমা, বলবার ত কিছু নেই! আপনার চোখে পড়েছে, এত লোক দেখেও দেখে না।

আর একটা দেখলাম। আমরা সেকেলে মানুষ, ঠাকুর-দেবতা দর্শন কর্‌তে যাই, আর আজকালের মেয়েরা কেউ কেউ রেস খেল্‌তে যায়। তা যাক্, যার যেমন অভিরুচি। চিরকাল ত আর এক রকম যায় না। কিন্তু এই যে সব নতুন হচ্ছে, এ ত আর আপনা-আপনি হচ্ছে না, পরের দেখে। সাহেবরা হ'ল রাজার জাত, ওরা যা কর্‌বে, তাই আমাদেরও কর্‌তে হবে! ওরা অখাদ্য খায়, আমাদেরও তাই খেতে হবে। ওরা কাটা পোষাক পরে, আমাদের পুরুষদেরও তাই পর্‌তে হবে! ওরা ধুচুনী মাথায় দেয়, আমাদেরও তা না হ'লে চল্‌বে না। মেমেরা চুল কেটে যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের মত বেড়ায়, আমাদের মেয়েরাও চুল কেটে ফেলবে, যেন কতকেলে রোগী। আগে পৈরাগে গিয়ে মাথার চুল দিত, এখন ফ্যাসানের পায়ের তলায় চুল দেয়। এ সব দেখাদেখি ত?

—তা নয় ত আর কি?

—আর ওদিকে দেখ, সাহেব-মেমেরা এ-দেশে এসে ত্রিশ চল্লিশ বছর ক'রে বাস ক'রে মাছের ঝোল ভাত খেতে শেখে না, কোঁচা

ক'রে ধুতিও পরে না। আর ওদের মেয়েরাও কপালে উল্কি প'রে নাকে নোলক দোলায় না। ওদের বাপ-পিতামহ চৌদ্দ পুরুষ যেমন করত—তেমনি করে। ফ্যাসান বদলায়—সেও ওদের নিজের দেশের। না হয় মান্‌লুম যে, সাহেবদের সব ভাল, ওদের মত থাকায় আমাদের লাভ আছে। কিন্তু বাঙ্গালী সাহেব সাজলে ত আর সাহেব হবে না। পোষাক পরতে, খানা খেতে সকলেই পারে। শুধু কি তাইতে সাহেবরা এত বড় জাত হয়েছে? কাটা কোটের সঙ্গে সাহেবদের বুকের পাটা তোমরা পেয়েছ? এই ত দেখলে, লড়াইয়ের সময় কেমন লক্ষ লক্ষ ইংরাজ দেশের জন্য অম্লানমুখে প্রাণ দিলে। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল, ছেলেরা সব যুদ্ধে ছুটেছে। মেয়েরা কোমর বেঁধে লেগে গেল,—কতক যুদ্ধে সেবা করতে, কতক মোটর-ট্রাম চালাতে, কতক মুটেগিরি করতে। সে কি এক জহর-ব্রত! যেই যুদ্ধের আগুন জ্ব'লে উঠল, অমনি হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি প'ড়ে গেল, কে আগে সে আগুনে ঝাঁপ দেবে! খাবার জিনিষ অর্দ্ধেক নেই, সহরে আকাশ থেকে বোমা পড়ছে, ওদিকে কাতারে কাতারে সব যুদ্ধে চলেছে। এমন জাতের পোষাক নিয়ে কি হবে—যদি সেই সঙ্গে তাদের প্রাণ না পাওয়া যায়?

—কেন, পিসীমা, বাঙ্গালীর ছেলেরাও ত যুদ্ধে গিয়েছিল।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! এবার রাজার জন্য গেল, কোন দিন হয় ত দেশের জন্য যাবে। এ ত কারুর কাছে শিখতে হয় না, কারুর নকল করতে হয় না। বাঙ্গালী ভয় পায়—এ কলঙ্ক দেশের কর্ত্তারাই রটিয়েছেন। সেকালে যখন বাড়ীতে ডাকাত পড়ত, তখন কি পুলিস পল্টন এসে রক্ষা করত? বাড়ীর পুরুষরা ডাকাতের মোয়াড়া নিত, বউ-ঝি সড়কি চালাত, ছাদ থেকে ইট ছুড়ত, কখন কখন খাঁড়া হাতে কালীর মত রণরঙ্গিণী হয়ে বেরুত। তখন কি কেউ সাহেবিয়ানা

না মেমসাহেবিয়ানা জান্‌ত? তাঁতের মোটা কাপড় আর ডাল-ভাত খেয়ে কি দেশের কাজ করা যায় না, না চোর-ডাকাত শত্রুর সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না? সেবার সেই ত্রিবেণীর কাছে বান ডেকে আমাদের নৌকা যায়-যায়, আমাদের সামনে একটা ডিঙ্গী উল্টে গেল, শিবু মাঝি একা জলে প'ড়ে সকলকে তুল্‌লে। সে-ও ত ভীরু, কাপুরুষ বাঙ্গালী!

দরজা-গোড়া থেকে চাঁপা ঝি বল্‌লে,—ওগো, আমিও ছিনু।

উমা ধমক দিয়ে বল্‌লে,—থাম্ তুই!

চাঁপা থেমে গেল।

পিসীমা বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, এখন যারা সাহেবের মত থাকে, তাদের মত কাপড় চোপড় পরে, খাওয়াদাওয়া করে, কেন করে?

বিশ্বনাথ বল্‌লেন,—ওরা রাজার জাত ব'লে একটা কারণ হ'তে পারে, তার পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘর-দোর বেশ সাজানো, সাহেবের মত থাক্‌লে লোকে খাতির করে, এই রকম নানা কারণ হ'তে পারে।

—সাহেবরা এদেশের লোকদের কি-রকম তাচ্ছীল্য করে, সেটাও কি একটা কারণ?

—সেটা যদি মনে করে, তা হ'লে সাহেব-সাজা মুস্কিল হয়।

—হ্যা দ্যাখ্ কুমু, তোকে যদি ঝি-চাকর মেমসাহেব বলে, তা হ'লে তোর কি খুব আহ্লাদ হয় না?

—রক্ষে কর, পিসীমা, আমাকে আর অমন আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে না।

এক চোট খুব হাসি হ'ল। এতক্ষণ ঘরশুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে ছিল।

পিসীমা আবার বিশ্বনাথকে বল্‌লেন,—আর একটা কথা ভেবে দেখেছ? আজ যেন ইংরেজ রাজা, কিন্তু ওরা ত চিরকাল এদেশের

রাজা ছিল না, চিরকাল থাকবেও না। সাহেবী ধরণ-ধারণ কত দিন হয়েছে বল দেখি? তার আগে কি রকম ছিল? মাথায় শামলা আর বুককাটা চাপকানেরও ত অনেক ছবি দেখেছি। ধর, কিছু দিন পরে এখানে চীন রাজা হ'ল, ইংরাজদের ত ঘরবাড়ী এখানে কিছু নেই, তল্পিতাল্পা বেঁধে তারা নিজের মুলুকে চ'লে গেল। তখন কি হবে? তখন কসাইটোলা গলির চীনে মুচিগুলো যে রাজার কুটুম হবে! কলেজে তাদের ভাষা পড়াবে, তাদের ভাষায় খবরের কাগজ ছাপা হবে, কলম ছেড়ে সব তুলি ধরবে। তখন আর সাহেব সাজবে কে? তখন সব চীনে কোট আর চীনে পায়জামা পরবে, ছুরী-কাঁটা ছেড়ে ছুটো কাঠি ধরবে, সৌখীন বাঙ্গালীর মেয়ে চীনে খোঁপা বেঁধে চীনেদের মেয়ের মত সাজবে! আর চীনেদের রান্না অমৃত লাগবে।

—ও পিসীমা, ওদের রান্নার কথাটা আর ব'লো না!

ছেলেরা সব ঘরে গড়াগড়ি দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

পিসীমার কথা বন্ধ হ'ল। উমা বড় মেয়ে, বাপের আদুরে, শ্বশুর-ঘর করে, একটু মুচকে হেসে বল্‌লে,—দিদিমা বাবার কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়েছেন, আর কিছু বাকী নেই!

বিশ্বনাথ বল্‌লেন,—ওঁর মুখেই আমরা কত কথা শিখি, ওঁকে আবার কে কি শেখাবে?

বিশ্বনাথ উঠে গেলেন। তখন চারদিকে কথার ফোয়ারা ছুট্‌ল। ব্রজনাথ বল্‌লে,—লেকচার শুন্‌তে হয় ত দিদিমার! আর সব লেক্‌চারে কি সব আজে-বাজে বকে!

পিসীমা বল্লেন,—নে, তুই আর জালাস্‌ নে!

অন্য ছেলেরা বল্‌লে,—দিদিমা, তুমি আর দেশে যেও না, এইখানে থাক।

—এখন দেশে যাব না। পোষ মাসের শেষে পৈরাগে যাব। মাঘ-মাসটা সেইখানে থাকব।

উমা বল্‌লে,—মাঘে প্রয়াগে কল্পবাসে—

ব্রজনাথ বল্‌লে,—মাঘে প্রয়াগে থরহরি কম্প লাগে।

পিসীমা বল্‌লেন,—দুই কথাই ঠিক, দু'টি ভাই-বোন যেন মাণিকজোড়!

রাজদ্রোহ

—১—

অপরাহ্নকালে প্রয়াগ-সঙ্গমে বালুকাতটে বসিয়া প্রশান্ত-ললাট নিগ্রন্থ নাথপুত্র* শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে পঞ্চাশ জন শিষ্য নীরবে বসিয়া, অবহিত চিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। কয়েক জন গৃহস্থও উপস্থিত ছিলেন।

গুরু কহিতেছিলেন,—'গ্রন্থি ইহ-সংসারে বন্ধন। অনেক প্রকার জটিল গ্রন্থিতে মানুষের স্বভাব আবদ্ধ, চিত্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে না। এই সকল গ্রন্থি মোচন করিতে হইলে আয়াস ও সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু তাহা ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় নাই। যাহার চরণে শৃঙ্খল বদ্ধ, সে অনায়াসে পথ পর্য্যটন করিতে পারে না। এই ভার বহন করিয়া জীবনের দীর্ঘ পথ কেমন করিয়া অতিবাহিত করিবে? সংযম অভ্যাস কর—বাক্যে সংযম, চিত্তে সংযম, আহার-বিহারে সংযম। বাক্য শাণিত অস্ত্রের ন্যায়, সংযম না করিলে অপরের মর্ম্মে আঘাত করে। চিত্ত চঞ্চল অশ্বের ন্যায়, বল্গা সংযত না করিলে অপথে-কুপথে ধাবিত হইবে। আহারের জন্য ধরণী নানা সামগ্রী দান করে, অপর ভক্ষ্যের কি প্রয়োজন? মানুষ কি ব্যাঘ্র যে মাংস ভোজন করিবে? আর বিহার? সাধু-সঙ্গই বিহার।'

* নিগ্রন্থ নাথপুত্র প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর।

একজন গৃহস্থ প্রশ্ন করিল,—'প্রভু, যাহারা সংসারে লিপ্ত, গৃহস্থ-আশ্রমে রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি কি আদেশ?'

—'গৃহাশ্রমে ত সকলেই রহিয়াছে, কয়জন গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে? গৃহস্থের পক্ষেও যথাসাধ্য সংযম ব্যবস্থা। সংযম ত্যাগ করিলেই সমূহ বিপদ। এই যে সংসার, ইহা পর্ব্বতের পার্শ্বের ন্যায়,—অত্যন্ত পিচ্ছিল, গমনাগমনের পক্ষে বড় কঠিন। অসাবধান হইলেই পতন ও বিনাশ। কোন জীবের হিংসা করিবে না, পিপীলিকাকেও পদদলিত করিবে না।'

যমুনার কালো জলে অস্তমান সূর্য্যের রশ্মি জ্বলিতেছিল, সিতাসিত সঙ্গমে গঙ্গার শুভ্র, তীব্র স্রোত ও যমুনার অলস, মন্থর, কৃষ্ণ প্রবাহ লক্ষিত হইতেছিল। পূর্ব্বদিকের বাতাস, তাহা জলে ঠেকিয়া ছোট ছোট তরঙ্গ রচনা করিতেছে, যমুনার পারে হরিদ্-বর্ণ ক্ষেত্র। কিছু দূরে ঘাটে কয়েকটি নৌকা বাঁধা, নাবিকেরা নৌকায় কিংবা তীরে বসিয়া গল্প করিতেছে, গ্রামের বালকবালিকা বালুকায় খেলা করিতেছে।

দুই তিনখানি সজ্জিত রথ বেগে চালিত হইয়া যমুনাতীরে উপনীত হইল। ছয় জন উত্তম-বেশ-পরিহিত যুবক রথ হইতে অবতরণ করিয়া শিষ্যপরিবৃত গুরুর অভিমুখে হাস্য-কৌতুক করিতে করিতে আগমন করিলেন। সকলের অগ্রে যে-যুবক আসিতেছিলেন তাঁহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য কিছু অধিক। উপবিষ্ট শ্রোতার মধ্যে একজন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিল, 'রাজা বিরূপাক্ষ!' সে-নাম শুনিয়া সকলেই কিছু শঙ্কিত হইল। একা নাথপুত্র বিচলিত হইলেন না, নবাগত যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যেমন মধুর গম্ভীরস্বরে উপদেশ দিতেছিলেন, সেইরূপ দিতে লাগিলেন।

রাজা বিরূপাক্ষের বয়স চব্বিশ বৎসর। দেখিতে সুপুরুষ, কিন্তু

বিলাসিতার আতিশয্যে চক্ষু কোটরগত, রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল শ্রীবিহীন। সাঙ্গোপাঙ্গও তদ্রূপ। বিরূপাক্ষ দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠাশূন্য, নিষ্ঠুর, প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী। নিকটে আসিয়া সঙ্গের এক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইহারা কে? এখানে কি করিতেছে?'

হয় ত সেই ব্যক্তি বিদূষক। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,—'পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছে। মধ্যস্থলে পুরোহিত বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে।'

আর একজন কহিল,—'না হে, ইহারা নটের দল। আজ রাত্রে প্রেতপঞ্চাশিকা নাটক অভিনয় হইবে, তাহাই আবৃত্তি করিতেছে। এই শ্মশানভূমি তাহার উপযুক্ত স্থান।'

নাথপুত্র মৌনাবলম্বন করিয়া অবনত মস্তকে বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে তুমি? ব্রাহ্মণ?'

গুরু মাথা তুলিয়া ধীর স্বরে কহিলেন,—'আমি তোমার দাস।'

রাজা পারিষদদিগকে কহিলেন,—'এই দেখ, এক রকম। কতকগুলা অনার্য্য এখানে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। আর এক দল হইয়াছে, দেখিয়াছ? মুণ্ডিত শির, মুণ্ডিত তুণ্ড, পীতবস্ত্র ধারণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র-হস্তে ঘুরিয়া বেড়ায়।'

রাজার সঙ্গিগণ হাসিতে লাগিল। একজন কহিল,—'জানি বই কি! তাহাদের গুরু শাক্যবংশীয় রাজপুত্র, উন্মাদ, বীভৎস আচার চণ্ডালের গৃহ হইতে অন্ন ভিক্ষা করে।'

যুবকেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। একজন হাসিতে হাসিতে কহিল,—'রাজসুখের অপেক্ষা ভিক্ষাভোগ উত্তম, ইহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এই যে লোকগুলা, ইহারা কে? রাজদ্রোহী নয় ত?'

আবার হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। বিদ্রূপ-বাক্য শুনিয়া নাথপুত্র

আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক যুবক ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'সাধু সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ অপমান করা রাজার উচিত কর্ম্ম বটে!'

যুবা তেজস্বী, বলবান, অথচ সৌম্যমূর্ত্তি। সে স্বয়ং ক্ষত্রিয়, দূর সম্বন্ধে রাজার জ্ঞাতি, তাহাকে দেখিয়া রাজা চিনিলেন। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন,—'উদয়ন, তুমি এখানে? যেমন দলে মিশিয়াছ সেইরূপ তোমার প্রকৃতি হইয়াছে। কাহার সহিত কথা কহিতেছ, তোমার স্মরণ নাই? তোমার মুখে এরূপ কথা?'

উদয়ন কহিলেন,—'সকলের মুখে এইরূপ কথা। গুপ্তচরেরা সে-সংবাদ দেয় না?'

রাজার সঙ্গিগণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উদয়নের অভিমুখে অগ্রসর হইল। নাথপুত্রের শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ উদয়নকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। এরূপ স্থলে বলপ্রকাশ যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া রাজার মোসাহেবেরা ক্ষান্ত হইল।

নাথপুত্র হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—'মঙ্গল হউক!'

এই বলিয়া তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শিষ্য ও শ্রোতাগণ তাঁহার সঙ্গে গেল। রাজা চীৎকার করিয়া কহিলেন,—'উদয়ন, আজিকার অপমান আমার স্মরণ থাকিবে।'

উদয়ন কোন উত্তর দিলেন না।

—২—

রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া রাজা বিরূপাক্ষ কিছু দূরে বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে প্রমোদ-ভবনে বাস করিতেন। রাজমাতা বর্ত্তমান,

রাজবংশের কয়েকজন বৃদ্ধও জীবিত, রাজ-বাটীতে বিরূপাক্ষ যথেচ্ছাচার করিতে পারিতেন না। উদ্যানে তাঁহাকে নিষেধ করিবার বা বুঝাইবার কেহ ছিল না। প্রমোদ-ভবনে কি হইত, রাজ-বাটীতে সংবাদ আসিত, কিন্তু রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজ্যভার তাঁহার হস্তে, কে তাঁহাকে নিষেধ করিবে? রাজা কখন কখন রাজবাটীতে গিয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া আসিতেন, অধিক কথাবার্ত্তা হইত না। রাজমাতা মনে করিতেন বিবাহ হইলে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল থাকিবে না, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্র অসৎসঙ্গে প্রমোদে মত্ত, বিবাহের জন্য কোনরূপ আগ্রহ ছিল না।

উদয়নের কথায় রাজা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। বাগানে ফিরিবার পথে আর কোন কথা হইল না। 'দেখিয়াছ, কতকগুলা ভিখারীর সম্মুখে আমাকে অপমান করিল! উহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, সর্ব্বত্র এই কথা রাষ্ট্র করিবে।'

প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন জোগাইবার লোক অনেক আছে, রাজার বয়স্যদিগের ত কথাই নাই। কেহ বলিল,—'উদয়নকে বন্দী করা হউক,' কেহ বলিল,—'তাহাকে শূলে দেওয়া হউক।' সঙ্গীদিগের মধ্যে একজনের একটু বিবেচনা ছিল। সে বলিল,—'যদি উদয়নকে এখন শাস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রজারা জানিতে পারিবে যে, একজন প্রধান সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ করা হইতেছে দেখিয়া সে আপত্তি করিয়াছিল। প্রজাদের মনের ভাব জান ত, সাধু-সন্ন্যাসীকে অপমান করিলে তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিছু একটা কৌশল করিয়া উদয়নকে শিক্ষা দিতে হইবে।'

একজন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—'মন্ত্রী মহাশয় ত উপস্থিত রহিয়াছেন, তবে আর ভাবনা কি! মহাশয়, পরামর্শ দিন্।'

রাজা রাগিয়া কহিলেন,—'পরামর্শের কি প্রয়োজন? আমার আজ্ঞা যথেষ্ট। কোন প্রজা আপত্তি করিলে তাহাকেও চণ্ডালের হস্তে সমর্পণ করিব।'

এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদন করিল, 'জয় মহারাজ!'

রাজা ভ্রূভঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি?'

—'মহারাজ, রাজমাতা মহারাণী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।'

—'এমন সময়? এখন আমি যাইতে পারিব না।'

—'মহারাজ, বিশেষ কোন প্রয়োজন হইবে। পুরোহিত অপেক্ষা করিতেছেন।'

—'পুরোহিত? আর কোন লোক ছিল না? উত্তম, ডাক তাহাকে।'

পুরোহিত আসিলেন, উন্নত, শীর্ণ দেহ, উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা এখনও দেখা দেয় নাই। রাজা ও তাঁহার সঙ্গিগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা প্রণাম করিলেন।

পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, বসিলেন না। কহিলেন, —'মগধরাজের প্রধান দূত সশস্ত্র অনুচর-বর্গ লইয়া রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়াছেন। অবিলম্বে মহারাজের দর্শন কামনা করেন।'

আকাশে বাজপক্ষীর কণ্ঠ শুনিলে ও তাহার প্রসারিত পক্ষ দেখিলে পারাবতকুল যেমন চঞ্চল, ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয়, রাজা ও তাঁহার সখাগণ সেইরূপ বিচলিত হইলেন। মহাপ্রতাপান্বিত মগধরাজের এখানে কি প্রয়োজন?

শুষ্ক মুখে বিরূপাক্ষ কহিলেন,—'মগধরাজ কেন দূত পাঠাইয়াছেন?'

—'যাইলেই জানিতে পারিবেন। কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই,

তবে কালবিলম্ব করিবেন না। রাজবাটীতে আপনাকে দেখিতে না পাইয়া দূত কিছু বিস্মিত হইয়াছেন।'

রাজা বিলম্ব করিলেন না, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তখনই পুরোহিতের সঙ্গে গমন করিলেন।

তাঁহার বয়স্যগণ কোন কথা না কহিয়া আপন আপন গৃহে গমন করিলেন।

রাজবাটীতে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া মগধ-রাজদূত রাজা বিরূপাক্ষের অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পুরোহিত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্ভাষণাদির পর রাজা বিরূপাক্ষ কহিলেন,—'আমার পরম সৌভাগ্য যে, মগধরাজ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ শুনিতে পাই?'

দূত মধ্যবয়স্ক, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ। কহিলেন,—'রাজাধিরাজ আপনার সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ কামনা করেন। তাঁহার কন্যা নাই, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী পরমা সুন্দরী। মহারাজের ইচ্ছা, আপনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।'

বিরূপাক্ষ পুরোহিতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি চক্ষু নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মুখ তুলিলেন না। চিন্তা করিয়া বিরূপাক্ষ কহিলেন,—'মাতা-ঠাকুরাণী রহিয়াছেন, এ প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইব। তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া আমি কিরূপে উত্তর দিব?'

দূত কহিলেন,—'সাধু, আপনি মাতৃবৎসল পুত্রের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। রাজমাতার আপত্তির কোন কারণ দেখি না। পুরোহিত মহাশয় কি বলেন?'

রাজা এবং দূত উভয়ে পুরোহিতের অভিমুখে দৃষ্টিপাত

করিলেন। স্মিতমুখে পুরোহিত কহিলেন,—'এমন কুটুম্বিতা কাহার বাঞ্ছনীয় না হইবে? মগধরাজের প্রস্তাবে রাজ-মাতা পরম সম্মানিত ও অনুগৃহীত হইয়াছেন।'

বিরূপাক্ষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তিনি অবগত আছেন?'

দূত কহিলেন,—'তাঁহার অবগতির জন্য প্রথমেই নিবেদন করা হইয়াছে।'

—'তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই হইবে।'

দূত এবং তাঁহার অনুচরগেণের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা বিরূপাক্ষ পুরোহিতকে একান্তে কহিলেন,—'ইহা আপনারই কাজ। মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন।'

—'ইহা ত কোন গর্হিত কর্ম্ম নয়। বাল্যকাল হইতে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমাকে সুখী দেখিলে আমাদের আনন্দ। চক্রবর্ত্তী মহারাজার জামাতা হইবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?'

—'আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে জড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাহে আমার সম্মতি নাই।'

—'সঙ্গদোষে। বিবাহ হইলে সুবুদ্ধি হইবে।'

রাজা রাগিয়া কহিলেন,—'আপনার বড় স্পর্দ্ধা! যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছেন!'

—'ব্রাহ্মণের মুখ কাহারও ভয়ে বন্ধ হয় না। সত্য কাহাকে ভয় করিবে?'

রাজা উদ্যানে চলিয়া গেলেন। রাজমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

—৩—

সন্ন্যাসীদের সহিত কিছু দূর গমন করিয়া উদয়ন নগরে প্রবেশ করিলেন। নিজের গৃহে না গিয়া রাজবাটীর নিকটে আর-একটি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ইহাতেও রাজবংশীয়েরা বাস করেন। এ-বাটীতে উদয়নের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। বাহির বাটীতে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া উদয়ন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহকর্ত্রী মহাশ্বেতা প্রকোষ্ঠদ্বারে বসিয়াছিলেন। উদয়নকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। কহিলেন,—'তুমি যে কর্ম্ম শিখিতেছিলে তাহার কি হইল?'

—'শিক্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, এইবার কর্ম্ম আরম্ভ করিব।'

—'পূর্ব্বে সকলে রাজকর্ম্মের চেষ্টা করিত। এখন রাজার নিকটে কর্ম্ম প্রার্থনা করিতে কে যাইবে?'

—'কেমন রাজা জানেন ত?'

—'সে-কথায় কাজ নাই! হতভাগ্য রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!'

তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একজন যুবতী রমণী আসিয়া মহাশ্বেতার পাশে দাঁড়াইলেন। রমণী সুন্দরী, মহাশ্বেতার ভগিনীর কন্যা, পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়াতে মাসীর কাছে থাকেন। মহাশ্বেতা কহিলেন,—'তোমরা কথা কও, আমি গৃহদেবতার কর্ম্ম সারিয়া আসি।' এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

উদয়ন কহিলেন,—'সুজাতা!'

সুজাতা কহিলেন,—'কি?'

দুই জনে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিলেন। উভয়েরই কিছু সঙ্কোচ, কিছু বাধার ভাব। দুই জনেই চক্ষু নত করিলেন।

উদয়ন কহিলেন,—'একটা কথা তোমাকে বলিতেছি, তোমার মাসী কিংবা অপর কেহ যেন জানিতে না পারেন। তাঁহাকে আমি কিছু বলি নাই।'

সুজাতার কপোল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, আবার সে-আভা মিলাইয়া গেল। কিছু উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি কথা?'

—'রাজা আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।'

সুজাতার মুখ মলিন হইয়া গেল, চক্ষে ভীতি-সঞ্চার হইল, হস্তের অঙ্গুলি কাঁপিল। কহিলেন,—'রাজরোষ? কি অপরাধ?'

—'সব কথা তোমাকে বলিব বলিয়াই আসিয়াছি। আর কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না।'

উদয়নের সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুজাতার চক্ষু আবার নত হইল, মুখ আবার আরক্তিম হইল।

উদয়ন কহিলেন,—'আজ বৈকালে প্রয়াগ-সঙ্গমে নির্গ্রন্থ নাথপুত্র উপদেশ দিতেছিলেন, শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।'

—'তিনি ত মহাপুরুষ, সকলেই জানে।'

—'সকলে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতেছিল, এমন সময় রাজা তাঁহার কয়েক জন অসদাচারী বন্ধু লইয়া উপস্থিত।

—'রাজার আচরণে ত প্রজারা সকলেই ভয় পাইয়াছে।'

—'তাঁহারা আসিয়াই সাধুকে বিদ্রূপ ও অপমান করিতে লাগিলেন। গৌতম বুদ্ধদেবেরও নিন্দা আরম্ভ হইল। আমার অসহ্য বোধ হওয়াতে একটা কথা বলিলাম।'

—'কি বলিলে?'

—'আমি বলিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ করা রাজার পক্ষে অনুচিত। প্রজারা তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট, সে-কথাও বলিয়াছিলাম।'

সুজাতা সভয়ে কহিলেন,—'রাজার প্রকৃতি ত জান? তিনি ত কখন ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। তোমাকে কিরূপ লাঞ্ছনা করিবেন, কে বলিতে পারে?'

—'তাই ত ভাবিতেছি। এখন উপায়?'

—'কিছু দিন আর কোথাও গিয়া বাস করিলে হয় না? রাজার বিবাহের কথা হইতেছে, বিবাহ হইলে শান্তপ্রকৃতি হইতে পারেন।'

—'কোথায় বিবাহের কথা হইতেছে?'

—'সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে মগধরাজের দূত রাজপথ দিয়া রাজবাটীতে গিয়াছেন। মাসী বলিতেছিলেন, মগধরাজ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রাজার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।'

—'রাজমাতার মুখে শুনিয়া থাকিবেন?'

—'সেইরূপ অনুমান হয়।'

—'তুমি যে স্থানান্তরে যাইতে বলিতেছ, কোথায় যাইব? যে-কর্ম্ম শিখিয়াছি দুই চারি দিনে আরম্ভ করিবার কথা। এখন যদি কোথাও চলিয়া যাই, যাঁহার সহিত কর্ম্ম করা স্থির হইয়াছে তিনি কি বলিবেন?'

—'রাজা এখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কখন কি করিয়া বসেন, তাহার ত স্থিরতা নাই! তুমি কর্ম্ম আরম্ভ করিলে, এমন সময় সহসা যদি তোমায় কারাবন্দী করেন কিংবা আর কোন শাস্তি দেন তাহা হইলে তুমি কি করিবে? তখন ত কর্ম্ম বন্ধ হইয়াই যাইবে, তুমিও বিপদে পড়িবে।'

—'তুমি যেমন বলিতেছ সেইরূপ করিব। আমার বন্ধুকে বলিয়া কাল বারাণসী চলিয়া যাইব।'

—'আজ রাত্রে কোন আশঙ্কা নাই ত?'

—'রাত্রে গৃহে থাকিব না, আর কোথাও গিয়া শয়ন করিব।'

—'সেই কথা ভাল।'

কিছুক্ষণ কথা স্থগিত হইল। আবার উদয়ন কহিলেন,—'সুজাতা!'

—'উদয়ন!'

—'আমাদের নিজের একটা কথা আছে।'

সুজাতা নখে নখ খুঁটিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

—'তুমি ত আমার মনের কথা জান।'

সুজাতা পূর্ব্বরূপ। উদয়ন তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, কহিলেন,—'আমাদের বিবাহে ত কোন বাধা নাই। তুমি স্বীকৃত হইলেই হয়।'

মুষ্টিমধ্যে ধৃত ক্ষুদ্র পক্ষিণীর ন্যায় উদয়নের হস্তের মধ্যে সুজাতার হস্ত কম্পিত হইতেছিল। মৃদুস্বরে কহিলেন,—'এ-কথা আমাকে কেন বলিতেছ? এখন ত স্বয়ম্বরের প্রথা নাই যে, প্রকাশ্য-সভায় তোমার গলায় আমি বরমাল্য পরাইয়া দিব?'

উদয়ন সুজাতার হস্ত মুক্ত করিলেন। মহাশ্বেতা ফিরিয়া আসিলেন। উদয়ন তাঁহাকে কহিলেন,—'বৈকালে বাহির হইয়াছি, এখনও গৃহে ফিরি নাই। অনুমতি হয় ত এখন গৃহে যাই।'

মহাশ্বেতা সস্মিত মুখে কহিলেন,—'এ কি তোমার গৃহ নয়?'

—'আপনাদের স্নেহেই ত আমি প্রতিপালিত।'

উদয়ন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

—৪—

পর দিবস প্রাতে দূত মগধে ফিরিয়া যাইবেন সংবাদ পাইয়া রাজা বিরূপাক্ষ রাজপ্রাসাদে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দূত কহিলেন,—'বিবাহে আপনার সম্মতি জানিয়া মগধরাজ আনন্দিত হইবেন। শুভ দিন স্থির হইলে যথোচিত সমাদরের সহিত আপনাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন।'

ক্রোধে বিরূপাক্ষের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ওঝার সম্মুখে সর্প ফণা তুলিয়া কি করিবে? প্রকাশ্যে রাজা কহিলেন,—'কিছু দিন পরে হইলে ক্ষতি কি? ব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন?'

—'সে কি কথা মহারাজ! শুভ কর্ম্মে কি বিলম্ব করিতে আছে? আপনি লজ্জার অনুরোধে এমন কথা বলিতেছেন।'

স্থির অথচ সতর্ক পুরোহিত পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন,—'মগধরাজ যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই হইবে।'

রাজা একবার পুরোহিতের দিকে আর একবার দূতের দিকে চাহিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। দূত অনুচরগণের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। তখন রাজা মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া সক্রোধে পুরোহিতকে কহিলেন,—'এ সমস্ত আপনাদের ষড়যন্ত্র।'

পুরোহিত কহিলেন,—'ষড়যন্ত্র ত অসৎ কর্ম্মের জন্য করে। সদ্বংশে বিবাহের ব্যবস্থা করা কি অসৎ কর্ম্ম?'

—'বিবাহ করা-না-করা, যে কোন সময় করা আমার ইচ্ছা। এ বিবাহ আমি করিব না।'

—'মহারাজের ইচ্ছা; প্রতিশ্রুত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিলে মগধরাজ কারণ জানিতে চাহিবেন।'

—'আমাকে আপনি শাসাইতেছেন?'

—'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার সাধ্য কি মহারাজ! কিন্তু মগধরাজ রাজাশ্রয়ে প্রতিপালিত পুরোহিত নহেন, এ-কথা আপনি কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবেন?'

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পদব্রজে নগরে চলিলেন। তিনি একা যাইতেছেন দেখিয়া দুইজন ভল্লধারী রাজসৈনিক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

উদয়ন প্রভাত-কালে উঠিয়া নিজের গৃহে আসিয়াছেন, রাত্রে কোন বন্ধুর গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। এখন যে ব্যক্তির সহিত কর্ম্ম করিবার কথা, তাহার গৃহে গমন করিতেছিলেন। পথে রাজার সহিত দেখা! উদয়ন পথ ছাড়িয়া দিয়া বিনীতভাবে অভিবাদন করিলেন।

যে ক্রোধানল রাজার হৃদয়ে এতক্ষণ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল, উদয়নকে দেখিবামাত্রই তাহা হবিযুক্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাজা গর্জ্জন করিয়া সৈনিকদ্বয়কে কহিলেন,—'এই ব্যক্তিকে বন্দী কর!'

সৈনিক দুইজন এমন চমকিয়া উঠিল যে, তাহাদের ভল্ল হস্ত হইতে পড়িতে পড়িতে রহিল। সংযত হইয়া একজন কহিল,—'কাহাকে, মহারাজ?'

প্রশ্নের কারণ ছিল। পথ সঙ্কীর্ণ, লোকের গমনাগমন ত ছিলই, আবার রাজার সিংহনাদ শুনিয়া পথিক চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। দুই চারিজন উদয়নের পাশেই দাঁড়াইল।

রাজা অঙ্গুলি দিয়া উদয়নকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

সৈনিকেরা তখনও বুঝিতে পারে না। পথ চলিতে যাহাকে-তাহাকে বন্দী করা কি রকম বিচার! উদয়ন চোর-দস্যু নহেন, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, রাজার জ্ঞাতি, কোথাও কিছু নাই, পথের মধ্যে তাঁহাকে বন্দী! রাজার মস্তিষ্কের বিকার হয় নাই ত! হয়ত রাত্রে প্রমোদের অধিক বাড়াবাড়ি হইয়া থাকিবে!

নাগরিকগণও বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল। রাজার চরিত্র সকলেই জানিত, প্রজার শ্রদ্ধা দিনদিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল।

একজন সৈনিক সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কি অপরাধে, মহারাজ?'

রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'তোমরা আদেশ পালন করিবে, প্রশ্ন করিবার কে?'

সৈনিক স্তব্ধ হইল। একজন পথিক কহিল,—'আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কি অপরাধে এই ব্যক্তিকে বন্দী করিতেছেন?'

—'তাহা হইলে তুমিও বন্দী হইবে।'

পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি কহিল,—'এমন রাজা না হইলে এমন বিচার করে কে? নগরসুদ্ধ লোককে বন্দী করিলেই ত হয়!'

রাজা কহিলেন,—'এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী।'

সৈনিকেরা উদয়নকে ধরিতে উদ্যত হইল। মাঝে আর কয়েকজন লোক আসিয়া পড়িল। একজন উদয়নের কানে কানে বলিতেছিল,—'পশ্চাতে মহামায়ার মন্দির দেখিতে পাইতেছ না? মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ কর, সেখানে বন্দী করিবার আদেশ নাই।' সে ব্যক্তি উদয়নকে পশ্চাৎদিকে ঠেলিতে লাগিল। মন্দিরের বৃহৎ দ্বার, তাহার পর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। উদয়ন বেগে প্রাঙ্গণ পার হইয়া, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। কহিলেন,—'আমি ভীত, আমি দেবীর শরণার্থী!'

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। দীর্ঘ, সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘকেশ, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখশ্রী, কোমল গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—'বৎস, আশ্বস্ত হও, অশরণকে শরণ দিবার জন্যই মা আছেন।'

উদয়নকে কহিলেন,—'রাজা মিত্রদলের সহিত সন্ন্যাসীকে অবমাননা করাতে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম। এই অপরাধে তিনি আমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া বন্দী করিতে আসিতেছেন।'

—'এখানে?'

—'সৈনিকদিগকে লইয়া রাজা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।'

—'এখানে রাজরাজেশ্বরীর রাজ্য, এখানে রাজা-প্রজা সকলেই সমান।' পুরোহিতের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। 'মন্দির-প্রাঙ্গণে সৈনিক! রাজদ্রোহী? রাজা স্বয়ং যখন নিজের শত্রু, অপর শত্রু হইতে কতক্ষণ?' অপর পুরোহিতকে কহিলেন,—'আমি বাহিরে যাইতেছি, দ্বার রুদ্ধ কর। আমি না আসিলে দেবীর দর্শন হইবে না।'

পুরোহিত বাহিরে আসিলেন। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোহিত দেখিলেন, প্রাঙ্গণে লোক ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে রাজা, হস্তে মুক্ত অসি, তাঁহার পশ্চাতে সৈনিক, সঙ্গে সঙ্গে জনতা-স্রোত। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সকলে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, কেবল রাজা দ্রুতপদে মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সৈনিকেরাও অগত্যা তাঁহার অনুগমন করিল। রাজা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পুরোহিত মুক্ত কণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া কহিলেন,—'মহারাজ, অসি হস্তে সশস্ত্র সৈনিক সঙ্গে আপনি এখানে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কি দেবীর স্থান, না শত্রুর রণস্থল?'

বিরূপাক্ষ উন্মত্ত বলিলেই হয়। অসংযত যৌবন, সকল প্রকার অত্যাচার, তাহার উপর মগধরাজের দূতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি আত্ম-নির্য্যাতন। রুদ্ধচিত্ত মুক্ত হইয়া রাজা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান তিরোহিত হইল। কহিলেন,—'আমি দেবীর মন্দিরে আসি নাই, পলাতক অপরাধীকে বন্দী করিতে আসিয়াছি।'

পুরোহিত পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—'এখানে কেহ

কাহাকেও বন্দী করিতে পারে না। এ স্থান অভয়ার, ভীত ব্যক্তিকে তিনি অভয় দেন, শরণাগতকে শরণ দেন।'

রাজা একেবারে মন্দিরের সোপানের উপর উঠিয়া, হস্তের অসি না নামাইয়া, তীব্র-রুক্ষ স্বরে কহিলেন,—'ব্রাহ্মণ, পথ ছাড়! ভিতরে প্রবেশ করিব, দ্বার রুদ্ধ থাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব!'

জনতা শিহরিয়া উঠিল। পুরোহিত দুই বাহু উত্তোলন করিয়া, দুই হস্তে বক্ষের কাষায়-বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, রাজার তরবারির সম্মুখে প্রশস্ত বক্ষ পাতিয়া দিলেন। তূর্য্যধ্বনির ন্যায় কণ্ঠনিনাদে কহিলেন,—'প্রথমে ব্রহ্মহত্যা কর, তাহা হইলে দেবীর দ্বার সহজে ভাঙ্গিতে পারিবে।'

সমবেত জনসঙ্ঘ হাহাকার করিয়া উঠিল।—'সর্ব্বনাশ হইল! সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; অনেকে দুই হস্ত দিয়া শ্রবণ রোধ করিল, অনেকে মন্দিরের অভিমুখে ধাবিত হইল।

সৈনিক দুই জন ভল্লে ভল্ল যোজনা করিয়া, পুরোহিতের সম্মুখে রাজার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। রাজা দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া কহিলেন,—'তোমরাও রাজদ্রোহী, শূলে যাইবে।'

—'রাজদণ্ড মস্তকে পাতিয়া লইব, দেবীর অভিশাপের ভাগী হইতে পারিব না। দেবীর অপমান হইলে নগর ধ্বংস হইবে।'

রাজা বিরূপাক্ষের ওষ্ঠে ফেন এবং ওষ্ঠ-প্রান্তে শোণিতবিন্দু দেখা দিল।

প্রজাদিগকে পুরোহিত কহিলেন,—'তোমাদের কোন চিন্তা নাই, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। দেবীর মর্য্যাদা তিনি স্বয়ং অক্ষত রাখিবেন।'

প্রজারা চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত রাজাকে কহিলেন,—

'মহারাজ, আপনিও গৃহে ফিরিয়া যান। অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহামায়া প্রসন্ন হইবেন।'

রাজা কোন কথা না কহিয়া উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন।

—৫—

রাজা বিরূপাক্ষের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। মন্দিরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর অভিসম্পাতের ভয়, তাহার অপেক্ষাও ভয় প্রজাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া। উদয়নকে তিনি বিনা কারণে রাজদ্রোহী বলিয়াছিলেন, এখন যদি সত্য সত্যই প্রজারা বিদ্রোহী হয়? দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি উদ্যান হইতে নগ্ন পদে, কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়া মন্দিরে গিয়া মহা সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা করিলেন, দেবীকে ও পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া মন্দিরে বহু অর্থ প্রদান করিলেন। প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিবার আশায় নানাবিধ উৎসবের আয়োজন করিলেন, উৎসবে আহারের ও বস্ত্রাদি দানের মুক্ত হস্তে ব্যবস্থা করিলেন। অপর দিকে বিলাসের মাত্রা বাড়িল, রাজকর্ম্মে কিছুমাত্র মনোযোগ নাই।

উদয়নকে নগর ত্যাগ করিতে হইল না। সকল কথা শুনিয়া মহামায়ার মন্দিরের পুরোহিত তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি নির্ভয়ে থাকুন, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। রাজা মন্দিরে আগমন করিলে তাঁহাকে নিভৃতে কহিলেন,—'উদয়নকে শাস্তি দিবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। দোষ আপনার, নিরপরাধী সন্ন্যাসীদিগকে অকারণে অবমাননা করিয়াছিলেন। ইহাতে আপত্তি করায় উদয়নের কি অপরাধ? সেখানে অপর লোক উপস্থিত ছিল, উদয়নের প্রতি অবিচার করিলে তাহারা সকল কথা প্রকাশ করিবে, প্রজাগণ আরও রুষ্ট হইবে।'

রাজা উদারভাবে কহিলেন,—'আমি উদয়নকে ক্ষমা করিয়াছি।'

পুরোহিত স্মিতমুখে কহিলেন,—'সেই কথাই উত্তম।'

উদয়ন নিজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। গৃহে মাতা ছিলেন, আর কেহ না। মধ্যবিত্ত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, বিশেষ কোন অভাব ছিল না, উদয়নের অলস স্বভাব নহে বলিয়া তিনি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মাতা কহিলেন,—'উদয়ন, এইবার বিবাহ কর, নিজের সংসার কর, আমিও পুত্রবধূর মুখ দেখি।'

উদয়ন হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন,—'বিবাহ কোথায় স্থির করিলে?'

—'পাত্রীর জন্য অধিক দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। মহাশ্বেতার বোন-ঝি সুজাতা মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়, কি বল?'

মাতার হাস্যপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া উদয়ন মস্তক অবনত করিলেন। কহিলেন,—'তুমি যেখানে স্থির করিবে সেখানেই বিবাহ করিব।'

'তোমার নিজের কোন মতামত নাই?'

অপ্রতিভ হইয়া উদয়ন কহিলেন,—'আমারও মত আছে।'

মাতা আনন্দে হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'তোমার মত জানিয়াই সম্বন্ধ করিয়াছি।'

—'আমার মত কেমন করিয়া জানিলে?'

—'আমার চক্ষু আছে, মহাশ্বেতারও চক্ষু আছে, জানিতে কতক্ষণ?'

আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে উদয়ন জননীকে প্রণাম করিলেন।

সেই রাত্রে উদয়ন স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, কণ্টকময় মহাতরুতে পরিপূর্ণ, অরণ্যে অসংখ্য সর্প ও শ্বাপদকুল বিচরণ করিতেছে। লোলজিহ্ব, নরমাংস-লোলুপ, বিপুলদেহ রাক্ষসগণ

বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। কোথাও আর্ত্ত প্রাণীর চীৎকার, কোথাও কম্পিতকায় জীবের পলায়ন। শোণিতের ন্যায় লোহিত রাগে আকাশ আচ্ছন্ন, বায়ুতে রোদনের স্বর প্রবাহিত হইতেছে।

সহসা সেই ভয়াবহ স্থানে অভয় বাণী শ্রুত হইল। আকাশ নির্ম্মল হইয়া উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিল, ত্রাসসঙ্কুল অরণ্য অদৃশ্য হইল। দেবী মহামায়া উদয়নের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। মন্দিরে উদয়ন যে-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন সে-মূর্ত্তি নহে, কিন্তু দেবী সেই, সংশয়ের লেশমাত্র রহিল না। পাষাণময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময়ী, মঙ্গলময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তি! উদয়নের প্রতি কোমল, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—'ভীত হইয়া তুমি আমার নিকটে শরণ প্রার্থনা করিয়াছিলে। দেখিতেছ না, এ স্থানে নিত্য ভয়! আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে চিরাভয় প্রদান করিব।'

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উদয়নের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন জাগ্রত হইয়াও বারবার তাহাই দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট প্রত্যেক দৃশ্য মানস-চক্ষে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইল।

—৬—

প্রভাতে উঠিয়া উদয়ন স্বপ্নবৃত্তান্ত কাহাকেও বলিলেন না। নিত্যকর্ম্ম যেমন করিতেন সেইরূপ করিলেন। একবার মনে করিলেন, মন্দিরে গিয়া পুরোহিতকে স্বপ্নকথা বলিবেন, কিন্তু সে কল্পনা ত্যাগ করিলেন। কত সময় কত স্বপ্ন দেখা যায়, সকল স্বপ্নেরই কি অর্থ আছে?

বৈকালে কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় উদয়ন নগরের বাহিরে অল্পক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ মেঘ উঠিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিল। তাহার পরেই প্রবল ঝঞ্ঝা, ধূলিতে চারিদিক ভরিয়া গেল। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইবার অপেক্ষায় উদয়ন পথের পাশে বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইল।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিল, তাহার পর মেঘগর্জ্জন। উদয়ন দেখিলেন, দূর হইতে একটা অশ্ব ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অশ্বারোহী কোনমতে অশ্বকে সংযত করিতে পারিতেছে না। উদয়ন চিনিলেন, রাজা বিরূপাক্ষ, ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত, অশ্বপৃষ্ঠে স্থির হইতে পারিতেছেন না। উদয়ন মুহূর্ত্ত-কাল বিলম্ব না করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বের বল্গা ধারণ করিলেন। অশ্ব লাফাইয়া উঠিয়া, কিছু দূর গিয়া স্থির হইল। রাজা বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন, উদয়ন অশ্বের পদতলে পতিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে অপর অশ্বারোহিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। উদয়নের উঠিবার ক্ষমতা নাই। রাজার আদেশে সত্বর শিবিকা আনীত হইল। রাজা কহিলেন,—'রাজপ্রাসাদে লইয়া চল।'

উদয়ন ক্ষীণ স্বরে কহিলেন,—'না, আমার নিজের গৃহে।'

বাহকেরা উদয়নকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেল। রাজা ও তাঁহার সঙ্গিগণ নীরবে শিবিকার সঙ্গে গমন করিলেন। গৃহে উপনীত হইয়া রাজা ও তাঁহার বন্ধুগণ উদয়নকে সাবধানে তুলিয়া গৃহের ভিতরে শয্যায় শয়ন করাইলেন। উদয়নের মাতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছে?'

রাজা সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া উদয়ন আহত হইয়াছেন।'

উদয়নের মাতা কহিলেন,—'নিজের প্রাণ দিয়াও রাজাকে রক্ষা করা প্রজার কর্ত্তব্য।'

উদয়নের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া রাজা অধোবদন হইলেন।

রাজবৈদ্য দেখিতে আসিলেন। উদয়নকে দেখিয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজাকে কহিলেন,—'শরীরের ভিতর কোথাও গুরুতর আঘাত লাগিয়া থাকিবে। শ্বাসের লক্ষণ দেখিতেছি। রক্ষা পাইবার কোনও আশা নাই।'

বৈদ্য চলিয়া গেলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে আবার আসিবেন বলিয়া রাজাও বিদায় লইলেন।

ঝটিকার পর আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে। সূর্য্য অস্তপ্রায়। মৃদুমন্দ শীতল বায়ু বহিতেছে, তরুশাখায় পক্ষিগণ সন্ধ্যার বন্দনা করিতেছে। বাহিরে দিবাবসানে প্রকৃতির প্রশান্ত মূর্ত্তি, ভিতরে নিঃশব্দে মৃত্যুর আগমন!

সংবাদ পাইয়া মহাশ্বেতা ও সুজাতাও আসিয়াছিলেন। মহাশ্বেতা উদয়নের মাতার সহিত উদয়নের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, সুজাতা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না।

উদয়নের মাতা শোক সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। মহাশ্বেতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে উদয়নের ক্লেশ হইতেছিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, —'মা, মহামায়া আমাকে ডাকিয়াছেন।'

মহাশ্বেতা কহিলেন,—'অমন কথা বলিতে নাই। মহামায়ার আশীর্ব্বাদে তুমি আবার সারিয়া উঠিবে।'

উদয়নের মুখে অতি ক্ষীণ, অতি মধুর, অতি নির্ম্মল হাসি দেখা দিল। কহিলেন,—'কাল রাত্রে দেবী স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। একবার রাজার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবীর মন্দিরে শরণ লইয়াছিলাম। স্বপ্নে দেবী চিরাভয় দিবার নিমিত্ত আমাকে দেবলোকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। আর অধিক বিলম্ব নাই, তোমরা দুই জননী আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন মহামায়ার চরণে আমি মুক্তি লাভ করি।'

উদয়নের মাতা ও মহাশ্বেতা কি বলিবেন? নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের পর উদয়ন কহিলেন,—'একবার সুজাতা—'

উদয়নের মাতা ও মহাশ্বেতা গৃহের বাহিরে গমন করিলেন। সুজাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। উদয়ন কহিলেন,—'ব'স।'

সুজাতা উদয়নের পাশে বসিলেন। চক্ষের জলে দেখিতে পাইতে-ছিলেন না। উদয়ন তাঁহার হস্তের উপর হস্ত রক্ষা করিলেন। সুজাতা দুই হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ কারলেন।

উদয়নের কণ্ঠস্বর আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন,—'সুজাতা, মহামায়ার আদেশ, তাঁহার কাছে আমাকে যাইতে হইবে।'

সুজাতা মস্তক নত করিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার অশ্রু উদয়নের বক্ষে পতিত হইল।

উদয়ন কহিলেন,—'আর আমাদের দেখা হইবে না—ইহলোকে।'

অশ্রুজড়িত স্বরে সুজাতা কহিলেন,—'লোকান্তরে!'

উদয়নের চক্ষে আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন,—'বিদায়!'

সুজাতার মুখ আরও নমিত হইয়া ওষ্ঠাধর উদয়নের ললাটে স্পৃষ্ট হইল।

মরণোন্মুখ, মর্ম্মরিত বায়ুর ন্যায় উদয়নের শেষ নিশ্বাসের সহিত কথা আসিল,—'ছায়ায়! ছায়ায়!'

দেবীর করুণা ও মানবীর প্রেম মমতার ছায়ায় ছায়ায় উদয়ন আনন্দলোকে গমন করিলেন।

নির্ব্বন্ধ

—১—

লাহোরের কেল্লা ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমাধির মধ্য দিয়া যে-পথ সহর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার এক পাশে একখানা পাল্কী। পাল্কীর দরজা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পাল্কী-বেহারারা মুসলমান, তাহারা পথের ধারে পাল্কী রাখিয়া নিকটস্থ বাদশাহী মসজিদে নমাজ পড়িতে গিয়াছে।

কেল্লার ভিতর হইতে একজন গোরা বাহির হইয়া আসিয়া ছোট রাবী নদীর তীরের অভিমুখে যাইতেছিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পথের ধারে একখানা পাল্কী, নিকটে লোকজন নাই। সে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পাল্কীর নিকটে গেল। পাল্কীর দরজা অল্প খোলা ছিল, গোরাকে আসিতে দেখিয়া যে পাল্কীর ভিতর ছিল সে ভিতর হইতে দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময় সহরের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিতেছিল। নবীন যুবা, দেখিতে সুপুরুষ, মাথায় পাগড়ী, গায়ে পাঞ্জাবী জামা, পরিধানে লুঙ্গী, পায়ে পাঞ্জাবী জুতা। আকৃতি খুব দীর্ঘ নহে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, বর্ণ গৌর। ধীরপদক্ষেপে আসিতেছিল, কিন্তু গোরাকে পাল্কীর নিকটে যাইতে দেখিয়া দ্রুতপদে সেই দিকে গেল।

পাল্কীর নিকটে উপস্থিত হইয়া গোরা দরজা খুলিবার চেষ্টা করিল। যে পাল্কীতে ছিল, সে ভিতর হইতে দরজা চাপিয়া ধরিয়াছিল। গোরা বলপূর্ব্বক দরজা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। পাল্কীর ভিতর বুরকা দিয়া মুখ ঢাকা মহিলা। দরজা খুলিতেই সে ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

এমন সময় সেই যুবক আসিয়া গোরাকে ঠেলা দিয়া সরাইয়া দিল। রাগিয়া বলিল,—উল্লু, হারামজাদা, স্ত্রীলোককে বেআবরু করিতেছিস্?

পাল্কীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল। একবারে চাপিয়া নহে, মাঝে একটু ফাঁক রহিল।

গোরা দশাসই প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ জোয়ান, তাহার তুলনায় পাঞ্জাবী যুবা দেখিতে কিছুই নহে। গোরা বিস্মিত হইয়া একবার যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পরেই 'ব্লাডি সোয়াইন' বলিয়া মারিল এক ঘুঁষি। ঘুঁষি মারিল যুবকের চোয়াল লক্ষ্য করিয়া। ঘুঁষি-বিদ্যায় ইহার নাম নক্ আউট্ ব্লো, লাগিলে যুবক অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইত।

ঘুঁষিটা লাগিল খুব জোরে বাতাসে আর সেই সঙ্গে গোরা চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। গোরা ঘুঁষি তুলিতেই মল্ল-বিদ্যাকুশলী যুবক চকিতের মধ্যে তাহার পিছনে গিয়া তাহাকে তুলিয়া আছাড় দিল।

পাল্কীর ভিতর হইতে অতি-মধুর হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। গোরা মাটি হইতে উঠিবার সময় সে হাসি শুনিতে পাইল, যুবক মৃদু হাসিয়া একবার পাল্কীর দিকে চাহিল। দরজার ফাঁক দিয়া কৌতুকপূর্ণ বড় বড় কালো চক্ষু দেখা যাইতেছিল।

ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ত গোরার রাগ হইয়াই ছিল, তাহার উপর রমণীর হাসি শুনিয়া সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যুবককে আবার আক্রমণ

করিল। যুবক সতর্ক ছিল, গোরার পাশ কাটাইয়া, পাশ হইতে তাহার বাহু পিঠের দিকে মুচড়াইয়া, তাহার পায়ের ভিতর পা দিয়া আবার সজোরে তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। এবার গোরার হাতে ও পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল।

পাল্কী-বেহারারা নমাজ পড়িয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। পাল্কীর নিকটে গোরা ও পাঞ্জাবী যুবককে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল। গোরা যুবককে তৃতীয়বার আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল না, গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

বেহারাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল, বোধ হয় পুরাতন ভৃত্য। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছিল?

যুবক হাস্যমুখে বলিল,—গোরা পাল্কীর দরজা খুলিতেছিল, আমি তাহাকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি।

পাল্কীর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, ভিতর হইতে রমণী অতি-মৃদুস্বরে বৃদ্ধকে ডাকিল, সে পাল্কীর পাশে গিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল,—কি বলিতেছেন?

পূর্ব্বের মত মৃদুস্বরে পাল্কীর ভিতর হইতে রমণী কয়েকটা কথা বলিল, শুনিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া আসিয়া যুবককে কহিল,—আপনি বিবির আবরু রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। আপনি কি পাহালওয়ান?

যুবা হাসিয়া উঠিল, বলিল, না, আমি পাহালওয়ান নই, রাঁঝা পাহালওয়ানের কাছে অল্প-স্বল্প কুস্তি শিখিয়াছি। আমার এরূপ বেশ দেখিয়া তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি আখড়া হইতে আসিতেছি।

—রাঁঝা খুব বড় পাহালওয়ান, তাহার শাগরেদ হইয়া আপনি

যে গোরাকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাতে বিচিত্র কি ? আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে কোন দোষ আছে ?

—কিছু না। আমি নবীউল্লা খাঁর পুত্র।

বৃদ্ধ ঝুঁকিয়া সেলাম করিল, কহিল,—আপনি খাঁ সাহেবের শাহজাদা ? আপনাদের বংশ কে না জানে ? আপনাদের সমান পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত খানদান কয়টা আছে ?

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—কোথাকার সোয়ারি ? তোমরা কোথায় যাইবে ?

—আমরা বিদেশী, রাবীর ধারে বারাদরীর কাছে রংমহল ভাড়া করিয়া আছি।

—সে বাড়ী আমি দেখিয়াছি, সে ত অট্টালিকা।

পাল্কী হইতে আবার অস্পষ্ট মৃদুস্বরে বৃদ্ধের ডাক পড়িল। সে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—যদি কোন সময় বেড়াইতে বেড়াইতে ওদিকে যান, তাহা হইলে একবার আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

যুবক বলিল,—'সে ত বড় খুসীর কথা !

বেহারারা পাল্কী উঠাইল, বৃদ্ধ পাল্কীর আগে আগে চলিল, যুবক এক পাশে রহিল।

পাল্কীর দরজা অল্প খুলিল, মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া রমণী যুবকের দিকে চাহিল।

কোমল সলজ্জ দৃষ্টি, ওষ্ঠাধরে অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পের ন্যায় হাসি। যুবক মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিল, রমণীও গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করিল।

পাল্কী চলিয়া গেল। যুবা পথে দাঁড়াইয়া রহিল।

—২—

রাঁঝা পাহালওয়ানের সমকক্ষ কোন কুস্তিগীর ছিল না। বড় বড় সব পাহালওয়ান তাহার সঙ্গে কুস্তি করিয়া হারিয়া গিয়াছিল। রাঁঝার বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ, পাহালওয়ানদের মত পেটমোটা স্থূলশরীর নহে, সুডৌল নধর গঠন, অঙ্গের কোন স্থান কঠিন কিংবা কর্কশ দেখাইত না। কাপড়-চোপড় পরিয়া থাকিলে সাধারণ লোকের মত দেখাইত, অদ্বিতীয় বলবান মল্ল বলিয়া কাহারও মনে হইত না। সকল বিষয়ে তাহার সংযম ছিল, অতিরিক্ত আহার বা অন্য কোন দোষ ছিল না। কথাবার্ত্তায়, লোকের সঙ্গে ব্যবহারে বিনয়ী, নম্র, শান্ত। এই গুণে দেশ-বিদেশে তাহার যশ প্রথিত হইয়াছিল। কাছকৌপীন আঁটিয়া যখন মল্লভূমিতে নামিত, সে সময় আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিত। চক্ষুতে সমরোল্লাসের জ্যোতি, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মসৃণ গৌরবর্ণ দেহ, অর্গলতুল্য বাহুযুগলে মাংসপেশী তরঙ্গায়িত হইত—রণদর্পে সিংহবিক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে আক্রমণ করিত।

রাঁঝার শিষ্যসংখ্যা বিস্তর, তাহাদের মধ্যে নবীউল্লা খাঁর পুত্র দাউদ তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। রাঁঝা তাহাকে বলিত,—তুমি আমীর-বংশের সন্তান, পাহালওয়ানী করিতে পাইবে না। তোমাকে আমি যে-রকম শিখাইয়াছি, তাহাতে বড় পাহালওয়ান হইতে পারিতে। আখড়ায় তোমার সমান আর কোন শাগরেদ নাই। তুমি হয় ত আর বেশী দিন এখানে আসিতে পারিবে না। কিন্তু ব্যায়ামের অভ্যাস ছাড়িও না, অল্প-স্বল্প কসরৎ সর্ব্বদা করিবে। ধনীদের মত অলস অথবা বিলাসী হইও না।

দাউদ বলিল,—আপনার দোয়া থাকিলে আমার জীবন বৃথা যাইবে না। পাহালওয়ানী করিতে না পারি, পাহালওয়ানদের সহায়তা করিতে পারিব, বিলাসিতায় আমার কিছুমাত্র অভিরুচি নাই। আপনি শুধু আমার কুস্তির ওস্তাদ নন, আপনার কাছে আমি চরিত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছি।

—সেই আসল জিনিষ। গায়ের জোর বাঘ-সিংহেরও হয়। চরিত্রবলেই মানুষ মানুষ হয়।

দাউদ বাপের একমাত্র পুত্র-সন্তান, কাজেই, বাড়ীতে সকলকার আদুরে। কুস্তি শিক্ষা ধনি-সন্তানের উপযোগী নহে, কিন্তু দাউদের আগ্রহ দেখিয়া কেহ তাহাকে নিষেধ করিত না। তাহার পিতা রাঁঝাকে জানিতেন, দাউদ যণ্ডা চোয়াড় যুবাদের সঙ্গে মিশিত না, তাহাও দেখিয়াছিলেন। দাউদ লেখাপড়াও ভাল করিত, হাফিজের দেওয়ান কণ্ঠস্থ, শাহনামা আগাগোড়া পড়িয়াছিল, নিজেও কখন কখন গজল লিখিত। তাহার নির্দ্দোষ স্বভাব বলিয়া তাঁহাকে শাসন করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

উক্ত ঘটনার পরদিবস দাউদ খাঁ যথাসময়ে রাঁঝার আখড়ায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাঁঝা বলিল,—তোমাকে কিছু বিমর্ষ দেখিতেছি, তোমার শরীর সুস্থ আছে ত?

দাউদ বলিল,—আমি বেশ আছি, আমার কিছুই হয় নাই।

এই বলিয়া লেঙ্গট আঁটিয়া দাউদ আখড়ায় নামিল। প্রথমে অপর কয়েক জন শাগরেদের সঙ্গে কুস্তি করিয়া তাহাদিগকে হারাইল, তাহার পর রাঁঝা নিজে দাউদের সঙ্গে কুস্তি আরম্ভ করিল। দুই জনে প্রায় তুল্যবল, আখড়ার অপর লোকেরা তাহাদের বল ও কৌশল উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কুস্তির পর গায়ের ধূলা উত্তমরূপে ঝাড়িয়া,

দুই জনে কাপড় পরিল। তখন রাঁঝা বলিল,—চল, দাউদ, তোমার সঙ্গে একটু বেড়াইয়া আসি।

দাউদ কিছু বিস্মিত হইল; কেননা, সচরাচর রাঁঝা আখড়া হইতে বাড়ী যাইত, কোথাও ভ্রমণ করিতে যাইত না। পথে কিছু দূর গিয়া রাঁঝা বলিল,—তোমার শরীর ভাল থাকিলেও তোমার মন ভাল নাই। তোমার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কুস্তির সময়ও তোমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়াছি। কি হইয়াছে?

রাঁঝার শিক্ষা ছিল যে, শিষ্য গুরুর নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। শাগরেদ ওস্তাদকে সকল কথা বলিবে, প্রয়োজনমত তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে। দাউদ সকল শিষ্যের অপেক্ষা রাঁঝার প্রিয়, রাঁঝাকে সে সমস্ত কথা বলিত। সে বুঝিয়াছিল, রাঁঝা কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, সে যথার্থই দাউদের হিত কামনা করে ও তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিলে লাভ আছে। দাউদ অকপটে ওস্তাদকে সকলী কথা বলিল।

গোরার লাঞ্ছনার বিবরণ শুনিয়া রাঁঝা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল,—আমি দেখিতে পাইলাম না, ইহাতে আমার ক্ষোভ হইতেছে। ঘুঁষি আর কুস্তির লড়াই দেখিবার সামগ্রী। পাল্কীতে স্ত্রীলোকটি কে?

—আমি জানি না, চাকরের মুখে শুনিলাম, উহারা বিদেশী; অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছে।

—তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?

—পাল্কীর দরজা একটু খোলা ছিল, তাহাতে আমি দেখিয়াছি।

—রমণী তোমার বীরত্ব দেখিয়া তোমাকে দেখিতেছিল? সুন্দরী?

—হাঁ, সুন্দরী।

—তুমি তাহাদের বাড়ী যাইবে ?

—যাইব ত বলিয়াছি, এখন ভাবিতেছি কি করিব।

—তাহাতে ক্ষতি কি ? ভদ্র-ঘরের কন্যা হইলে দোষ কি ? তবে মজনু আর লয়লার কাহিনী মনে আছে ত ?

দাউদ কিছু লজ্জিত হইল, কহিল,—সে নিজে বোধ হয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। আমার যাওয়া উচিত কি না, ঠিক করিতে পারিতেছি না।

ঝাঁঝা জিজ্ঞাসা করিল,—বাড়ীতে এ-কথা বলিয়াছ ?

—না, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই বলিলাম।

—তুমি যুবা পুরুষ, এখন পর্য্যন্ত বিবাহ কর নাই। তোমার চরিত্র নির্ম্মল আমি জানি, ধনি-সন্তানের ন্যায় তুমি বিলাসপরায়ণ নও। যদি এই রমণী অবিবাহিতা, ভদ্রবংশজাতা হয়, তাহা হইলে উহার সহিত পরিচয় হইলে দোষের কিছু নাই। তাহার পর কি হইবে, সে পরের কথা।

সেদিন এই পর্য্যন্ত কথা রহিল। ঝাঁঝাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া দাউদ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ওস্তাদের কাছে দাউদ সকল কথা বলিয়াছিল কি ? যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু মন খুলিয়া মনের কথা বলিতে পারিয়াছিল কি ? সে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল না, তাহার কি হইয়াছে, তবে কেমন করিয়া বলিবে ? ইতিপূর্ব্বে কখন তাহার এরূপ ত হয় নাই। যে সমাজে পর্দ্দা, অপরিচিত স্ত্রীপুরুষে

সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন, তাহাদের মধ্যে এরূপ ঘটনা বিরল। ঘটনাচক্রেই রমণী দাউদের চক্ষুতে পড়িয়াছিল। গোরা যদি পাল্কীর দরজা না খুলিত, তাহা হইলে দাউদ রমণীকে দেখিতেই পাইত না। এমন কি, যাইবার সময় সে মুখের আবরণ খুলিয়া দাউদকে না দেখিলে দাউদ তাহার মুখ দেখিতে পাইত না। রমণীর নয়নে কিছু কৌতূহল—কিছু কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। দাউদ সে সকল লক্ষণ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই। সেই যে চকিতের মত একবারমাত্র দেখা, স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত তাহার মনে পড়িতেছিল। রমণী সুন্দরী, নব-যুবতী, কিন্তু তাহার মুখ দাউদ ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। মেঘের আড়াল হইতে বিদ্যুৎ যেমন একবার ক্ষণমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ দেখিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, শুধু সেই মুখখানি একবার তাহার দৃষ্টিপথে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতেই আবার অপসৃত হইল। সেই ক্ষণিকের দেখা, আবছায়ার মত সেই মুখের প্রতিকৃতি তাহার স্মৃতিকে বিচলিত করিয়াছিল। রমণী একবার যে হাসিয়াছিল, তাহার সেই মধুর তরঙ্গিত কণ্ঠধ্বনি দাউদের প্রাণে মুরলীনিঃস্বনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। মনে মনে সেই মুখের চিত্র কল্পনা করিতে কিছু মনে পড়ে, কিছু পড়ে না। একবার সে মুখের ছবি মানস-চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার তখনই মিলাইয়া যায়। অতৃপ্তির আকুলতা কেমন করিয়া নিবারিত হইবে? শুধু আর একবার দেখা! একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পাইলেই চক্ষুর পিপাসা মিটিবে, হৃদয়ের অশান্তি দূর হইবে, লালসার শান্তি হইবে। মনের এই আকাঙ্ক্ষা যে আত্মপ্রতারণা, দাউদের সে বিবেকশক্তি ছিল না। মোহের আবেশে অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতেছিল।

পরদিবস সায়ংকালে দাউদ আখড়ায় গেল না। উত্তম বেশভূষা

ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে রাবী নদী পার হইয়া রংমহলে উপনীত হইল। নূতন বৃহৎ বাড়ী, চারিধারে বাগান, শীতকালে বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে, দেশী বিদেশী নানা জাতীয় ফুল, টবে নর্‌গ্যাস ফুল, বাড়ীর সম্মুখে ঘাসের উপর বাঁধান ফোয়ারা, গাছে হরিতাল ঘুঘু।

ফটক পার হইয়া বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাউদ ঘোড়া হইতে নামিল। সঙ্গে সহিস আসে নাই। দাউদ একটা গাছে ঘোড়া বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল, বলিল,—আমি ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি ভিতরে যান।

হাতের চাবুক ভৃত্যকে দিয়া দাউদ সিঁড়ি উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। পাল্কীর সঙ্গে যে লোককে দাউদ দেখিয়াছিল ও যাহার সহিত কিছু কথা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল,—সাহেব, আসুন আসুন, আমরা ভাবিয়াছিলাম, আপনি কালই আসিবেন।

দাউদ কিছু সঙ্কোচের সহিত কহিল,—কাল আসিতে পারি নাই। তোমরা ত এখানে কিছু দিন থাকিবে?

—হাঁ, জনাব। এ বাড়ী এক বৎসরের জন্য ভাড়া করা হইয়াছে।

—এ জায়গাও খুব ভাল। নিকটেই দেখিবার মত জাহাঙ্গীর শাহের ও নূরজাহানের কবর আছে, নিরালা স্থান, এ দিকে লোকজনের অধিক ভীড় নাই।

—এ বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া ভাড়া করা হইয়াছে। সাহদরা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

পুরাতন ভৃত্য, দাউদকে লইয়া গিয়া আর একটা ঘরে বসাইল। ঘরে উত্তম ফরাস পাতা, তাহার উপর বড় বড় তাকিয়া। দিব্য সাজান

ঘর, দেয়ালে কাচের ফ্রেমে আঁটা সোনার অক্ষরে লেখা চারিদিকে কোরাণের বয়েৎ টাঙ্গানো রহিয়াছে।

দাউদ বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীর মালিক কোথায় ?

ভৃত্য হাসিয়া কহিল,—জনাবালি, মালিক ত কেহ নাই, মল্‌কাকে আপনি সেদিন অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সঙ্গে কর্ম্মচারী আছে, সেই বিষয়-আশয় দেখে, হিসাব-পত্র রাখে, তাহাকে ডাকিয়া দিতেছি।

ভৃত্য চলিয়া গেল। দাউদ কিছু নিরাশ হইল। হয় ত তাহার মনে আশা ছিল যে, সেই ক্ষণদৃষ্টা সুন্দরীকে আবার দেখিতে পাইবে, হয় ত সে নিজে আসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিবে, কিংবা অন্তরাল হইতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিবে। দাউদ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সেই ঘরে প্রবেশ করিবার কয়েকটি দরজা ছিল, দরজায় পর্দ্দা দেওয়া, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। একবার কি একটা পর্দ্দা ঈষৎ আন্দোলিত হইল, অলঙ্কারের মৃদু নিক্কণ শ্রুত হইল ? না, শুধু দাউদের কল্পনা, উৎকর্ণ শ্রবণের ভ্রম ? দাউদ পর্দ্দার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এমন সময় কর্ম্মচারী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

তাহার বয়স হইয়াছে, দাড়ী-গোঁফে পাক ধরিয়াছে, দোহারা শরীর, আকৃতি মধ্যবিধ, ঘরে প্রবেশ করিয়া লম্বা সেলাম করিয়া কহিল, —সলাম ওয়ালেকুম।

—ওয়ালেকুম সলাম।

—আপনার মেজাজ ভাল আছে ?

—আপনাদের কৃপায় ভালই আছি।

—আপনার বীরত্বের কথা শুনিয়াছি। আপনার জন্য বিবি সাহেবের আবরু রক্ষা পাইয়াছিল।

—সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। ইহা আমার সৌভাগ্য।

—আপনার বংশের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে। এখানে আমরা খাঁ সাহেবের নাম অনেক শুনিয়াছি। আপনার নাম শুনিবার সৌভাগ্য এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

—আমার নাম দাউদ। আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার এই আমার প্রথম অবসর হইল।

—বিবি সাহেবের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ইরানবাসী। বড় খানদান, ওমরাহ শ্রেণী, বংশ পাঠান। বিবি সাহেবের প্রপিতামহের সহিত ইরানের শাহের বিবাদ হয়। সেই কারণে তিনি পারস্য দেশ ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া আসেন। ইঁহারা দক্ষিণ দেশে কোঙ্কনে বাস করেন। সঙ্গে অনেক অর্থ ও বিস্তর জহরাত আনিয়াছিলেন, তাহার কিছু বিক্রয় করিয়া অনেক জমী-জমা খরিদ করিয়া প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। বিবি সাহেবের পিতামহ নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি সম্পত্তি আরও বাড়াইয়া যান। বিবি সাহেবের বাল্যকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, দুই বৎসর হইল পিতারও মৃত্যু হইয়াছে। এখন ইনি সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। ইঁহার পিতৃব্য মক্কায় হজ্ করিতে গিয়া সেইখানেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। আমি ইঁহাদের পুরাতন কর্ম্মচারী, জমীদারী দেখাশুনার ভার আমার উপর।

দাউদ জিজ্ঞাসা করিল,—আপনাদের এখানে আসিবার কারণ কি?

—সে বড় আপশোষের কথা। বিবি সাহেবের চাচা সাহেবের একমাত্র পুত্র-সন্তান। ইঁহার মাতা নাই। বয়সে বিবি সাহেবের অপেক্ষা তিন চার বৎসরের বড়, ইঁহারই সহিত বিবি সাহেবের বিবাহ স্থির ছিল, হঠাৎ ইনি উন্মাদ হইয়া যান। এখানে হাকিম নসিরুদ্দীন

উন্মত্তের উত্তম চিকিৎসা করেন জানিতে পারিয়া নবাবজাদা ফিরোজ খাঁকে এখানে আনা হইয়াছে।

—তাহা হইলে বিবি সাহেব এ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা? দাউদের মুখ দিয়া হঠাৎ এই প্রশ্ন বাহির হইল। এরূপ প্রশ্ন করা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত, সে-কথা বিবেচনা করিবার অবকাশ রহিল না।

কর্ম্মচারী কহিল,—কাজেই। একে এই দুশ্চিন্তা, তাহার উপর বিবি সাহেবের মাথার উপর কেহ নাই। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সমস্ত কাজকর্ম্ম নিজে দেখেন, দপ্তরে বসিয়া কাগজপত্র পড়েন, কিন্তু এখন সব ছাড়িয়া এই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

—বিবি সাহেব ত পর্দ্দানশীন, তিনি দপ্তরে কেমন করিয়া বসেন?

কর্ম্মচারী হাসিল, বলিল,—দক্ষিণদেশে পর্দ্দা নাই, ইহাদেরও গৃহে পর্দ্দার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে ইজার, পেশবাজ, বুরকা কিছুই নাই। বিবি সাহেব সাড়ী পরিয়া খোলা মোটরে বেড়াইতে যান। এখানে আসিয়া লোকনিন্দার আশঙ্কায় বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পর্দ্দায় রহিয়াছেন। পাছে আপনি তাঁহাকে প্রগল্‌ভা বিবেচনা করেন, এই কারণে তিনি এখন পর্য্যন্ত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; নহিলে তিনি নিজের মুখে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেন।

দাউদ বাক্‌শূন্য। তাহার হৃদয় তাহার পঞ্জরাস্থিতে আঘাত করিতে লাগিল। মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টায় কিছু সামলাইয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিল,—তিনি অকারণে আমাকে অপরাধী করিয়াছেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার কৃপা এবং আমার পরম সৌভাগ্য।

এবার পর্দ্দার আড়ালে অলঙ্কার-শিঞ্জিতের শব্দ স্পষ্ট শুনা গেল।

অল্পবয়স্কা দাসী রূপার পাত্রে ফল, মিষ্টান্ন, শরবত, পানের ডিবা আনিয়া দাউদের সম্মুখে রাখিল। কহিল,—বিবি সাহেব আপনার জন্য এই সামান্য নাস্তা পাঠাইয়াছেন। তিনি আসিতেছেন।

—৪—

কর্ম্মচারী দাউদকে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেল। দাউদ সতৃষ্ণনয়নে যে দরজা দিয়া দাসী ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দাসী হাস্যমুখে বলিল,—আপনি কিছু খাইতেছেন না?

—এই যে খাইতেছি, বলিয়া দাউদ একটা আঙ্গুর তুলিয়া মুখে দিল।

এই সময় পর্দ্দা সরাইয়া রমণী ঘরে প্রবেশ করিল। দাউদ শশব্যস্তে উঠিয়া, মস্তক অবনত করিয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল। রমণী হাত তুলিয়া কহিল,—তসলীম। আপনি উঠিলেন কেন? বসুন।

দাউদ বসিল। উঠিবার সময় একবার রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর চক্ষু নত করিয়া রহিল।

দাসী বাহির হইয়া যায় দেখিয়া রমণী কহিল,—তুই এইখানে থাক্। দাউদকে কহিল,—আপনি কিছু খান, তার পর কথা হইবে।

দাউদ কিছু ফল, মিঠাই ও শরবত খাইয়া, হাত ধুইয়া, হাত মুছিল।

রমণী কহিল,—পাণ নিলেন না?

দাউদ একটা ছোট এলাচ তুলিয়া মুখে দিল, বলিল,—আমি পাণ খাই না।

—পাহালওয়ানরা কি পান খায় না ?

আর একবার নিমেষের জন্য নয়নে নয়নে মিলিল, দাউদ লজ্জিত-ভাবে কহিল,—আমি পাহালওয়ানের শাগরেদ মাত্র, পাহালওয়ানের সম্মুখে কিছুই নই।

—গোরারও মনে কি তাহাই হইয়াছিল ?

বীণাবিনিন্দিত কলকণ্ঠে রমণী হাসিয়া উঠিল। পাল্কীর ভিতর হইতে সেই হাসি দাউদের স্মরণ হইল। দুই জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সরলপ্রকৃতি বালক-বালিকার মত হাসিতে লাগিল।

রমণী কহিল,—গোরা যখন পড়িয়া যায়, সেই সময়কার তাহার মুখের ভাব আমার কেবলই মনে পড়ে। মানুষ আকাশ হইতে পড়িলেও এত আশ্চর্য্যান্বিত হয় না। আপনাকে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, এক ঘুঁষিতে আপনাকে গুঁড়া করিয়া দিবে।

—প্যাঁচের কাছে শুধু গায়ের জোর টেকে না।

—এ পর্য্যন্ত আপনার পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আমার নাম হনিফা।

—আমার নাম দাউদ, পাহালওয়ানি আমার পেশা নয়।

—আপনার বংশ-পরিচয় জানি। এরূপভাবে আপনার সহিত কথা কহিতেছি, আপনি নিশ্চিত আমাকে মুখরা মনে করিতেছেন।

দাউদ লজ্জায় অধোবদন হইল, কহিল,—আপনি এমন কথা কেন বলিতেছেন ? পর্দ্দার প্রথা ত সকল দেশে নাই।

—যে দেশে আমরা থাকি, সেখানে মোটেই নাই। কাজকর্ম্ম উপলক্ষে আমাকে সকলের সঙ্গে কথা কহিতে হয়। স্ত্রীলোক হইলেই কি লুকাইয়া থাকিতে হইবে ?

দাসী খাবারের পাত্র তুলিয়া লইয়া গেল। হনিফা কহিল,—এখনই ফিরিয়া আসিবি।

তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে দুই জনের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। লজ্জা আসিয়া দুই জনের মুখ আঁটিয়া দিল। হনিফার চক্ষু অবনত, অঙ্গুলিতে বস্ত্রাঞ্চল জড়াইতেছিল। সেই অবসরে দাউদ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার রূপরাশি দেখিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমল সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিল। আবার যখন হনিফার চক্ষু উঠিল, তখন দাউদের দৃষ্টি আর এক দিকে, হনিফা তাহার মুখের অনিন্দ্য শ্রী, তাহার বক্ষের বিশালতা দেখিল। এইরূপে কয়েকবার চক্ষুর লুকাচুরী খেলা হইল, তাহার পর চুম্বকের আকর্ষণে যেমন লৌহ টানে, সেইরূপ চক্ষুর প্রতি চক্ষু আকৃষ্ট হইল, মিলিল, স্থির হইল। চোখে চোখে কি যে কথা হইল, তাহা তাহারাই জানে, কিন্তু মুখে যে-কথা বলিতে দিন ফুরাইয়া যায়, পলকের মধ্যে তাহা হইয়া গেল। হনিফার গণ্ডস্থল হইতে কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, দাউদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত এইরূপে গেল, দুই জনের কেহই দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না, দুই জনের কাহারও মুখ ফুটিল না।

দাসী ফিরিয়া আসিল, উভয়ের দৃষ্টির টানা তার ছিঁড়িয়া গেল। দাউদ বলিল,—আপনার উজীর সাহেব, আপনার ভাইয়ের পীড়ার কথা বলিতেছিলেন।

—হ্যাঁ, সেই জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি। ফিরোজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন-কেমন, এখন ত একেবারে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

—হাকিম নসিরুদ্দীন দেখিয়াছেন?

—হাকিম সাহেব একবার আসিয়াছিলেন, আবার আসিবার কথা

আছে। তিনি বলিয়াছেন, দুই চার বার না দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহার কথার আভাসে বোধ হয়, আরোগ্য হইবার আশা নাই। তাঁহার অনুমান, বাল্যকাল হইতেই মস্তিষ্কের দোষ ছিল, এখন রোগে দাঁড়াইয়াছে।

—কিছু ঔষধ দিয়াছেন?

—দিয়াছেন। আগে একেবারেই নিদ্রা হইত না, ওষুধ খাইয়া নিদ্রা হইতেছে। তবে হাকিম সাহেবের একটা কথায় আমরা কিছু ভয় পাইয়াছি।

—কি?

—তিনি বলিয়াছেন, রোগের লক্ষণে তাঁহার বিবেচনা হয়, দৌরাত্ম্য বাড়িবে; সেজন্য অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে। দুই জন লোক আমরা সঙ্গে আনিয়াছি, তাহারাই ফিরোজকে সর্ব্বদা দেখে।

—দৌরাত্ম্যের লক্ষণ কিছু দেখা গিয়াছে?

—মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া মারিতে যায়, এক দিন লাঠি দিয়া একটা রক্ষকের মাথায় মারিতে গিয়াছিল, দুই জনে মিলিয়া অনেক কষ্টে লাঠি কাড়িয়া লয়। উন্মত্তের বল জানেন ত?

—তাহা হইলে ত বাড়ীর সকলকেই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়?

—কতক কতক বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সর্ব্বদাই লোক থাকে।

ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা দরজা খুলিয়া গিয়া এক জন যুবক সেই ঘরে প্রবেশ করিল। যুবক দেখিতে সুপুরুষ হইলেও, কিন্তু তাহার কেশ-বেশ অসংযত, ঘূর্ণিত শূন্য দৃষ্টি, রক্ত চক্ষু, মুখের বিকৃত ভঙ্গী ও হস্ত-পদের আক্ষেপে তাহাকে বিকট-মূর্ত্তি দেখাইতেছে। দাউদ দেখিয়াই বুঝিল, এ ব্যক্তি আর কেহ নহে, উন্মাদগ্রস্ত ফিরোজ।

যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাত দোলাইয়া হনিফার

দিকে চাহিয়া বার বার বলিতে লাগিল,—মস্তানা দিওয়ানা হুঁ ময় ইস্‌ক কা মারা হুঁ ময়! ময় মস্ত পরেশান গিরফতার হুঁ!

হনিফা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসীর দিকে ফিরিয়া ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল,—রক্ষকরা কোথায়?

দাসী পর্দ্দা তুলিয়া, মুখ বাড়াইয়া ডাকিল,—আবদুল্লা! আলিজান!

যুবক অগ্রসর হইয়া হনিফার সম্মুখে আসিল। হনিফা ভীত হইয়া পিছাইয়া দাউদের নিকট গেল।

দাউদও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ফিরোজ হাত বাড়াইয়া হনিফার বস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া সে হনিফা ও ফিরোজের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

অকস্মাৎ পাগলের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দাউদকে দেখিয়া বিকট রবে চীৎকার করিয়া উঠিল,—দুশমন, মেরা দুশমন! তাহার পরেই লম্ফ দিয়া দাউদের গলা টিপিয়া ধরিল।

হনিফা ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়াছিল, দাসী রক্ষকদের নাম করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

কুস্তির প্যাঁচ না জানিলে দাউদ বিপদে পড়িত। উন্মত্তের একে কাণ্ডজ্ঞান নাই, তাহার উপর উন্মত্ততায় অসীম বল। দাউদ একটা ঝটকা দিয়া নিজের গলা ছাড়াইয়া লইল, তাহার পর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ফিরোজের স্কন্ধ ধারণ করিয়া ঘুরাইয়া পিছন হইতে তাহার দুই হাত মুচড়াইয়া ধরিল। ফিরোজ ঘাড় ফিরাইয়া দাউদকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, লাথি পিছন দিকে মারিতে লাগিল, কিন্তু হাত ছাড়াইতে পারিল না। দাউদ তাহার পিঠে হাঁটু দিয়া চাপিয়া তাহাকে বেকায়দায় ফেলিল।

রক্ষক দুই জন ছুটিয়া আসিল। তাহারা আসিয়াই ফিরোজকে দুই জনে দুই দিক্ হইতে ধরিল। দাউদ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ফিরোজ কেবল চীৎকার করিতেছিল,—দুশমনকো মারুঙ্গা, দুশমনকো মারুঙ্গা!

আর কোন আশঙ্কা নাই দেখিয়া হনিফা যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া রক্ষকদ্বয়কে বলিল,—তোমরা নিজের কাজে এমন গাফিল হইলে চলিবে না।

এক জন বলিল,—সাহেবা, নবাবজাদা নিজের ঘরে বসিয়াছিলেন, আমরা দরজার কাছে ছিলাম। ভিতর দিক্‌কার দরজা খুলিয়া কখন্ চলিয়া আসিয়াছেন, আমরা কিছু জানিতে পারি নাই।

—এখন হইতে তোমরা ঘরের ভিতর থাকিবে।

—যো হুকুম।

হনিফা বলিল,—ফিরোজ!

পাগলের আবার অন্য ভাব হইল, হাত দিয়া চক্ষুর সম্মুখ হইতে কি যেন সরাইয়া দিয়া কহিল,—কেন?

এখন বেশ শান্ত ভাব, বলপ্রকাশের কোন চেষ্টা নাই। হনিফা কহিল,—তুমি গিয়া শান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে মোটরে করিয়া বেড়াইতে পাঠাইয়া দিব।

—আচ্ছা, বলিয়া ফিরোজ রক্ষকদের সঙ্গে চলিয়া গেল। দরজার কাছে গিয়া, মুখ ফিরাইয়া দাউদকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিড়বিড় করিয়া দুশমন বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

দাউদের পোষাক এক স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। হনিফা অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—আপনাকে এখানে আসিতে বলিয়া ভাল করি

নাই। আপনার কাপড় নষ্ট হইয়াছে, পাগল আপনাকে আঘাতও করিতে পারিত।

দাউদ বলিল,—ও-কথার উল্লেখ করিবেন না। আমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিলে আমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর আদেশ করা হইবে।

হনিফা মৃদু মন্দ মধুর হাসি হাসিয়া দাউদের প্রতি কটাক্ষপাত করিল। দাউদের হৃদয়ে যেন অমৃত সিঞ্চিত হইল।

একটু পরে দাউদ উঠিল। হনিফা তাহার সঙ্গে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিল। কহিল,—আমার বিশ্বাস, আমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আপনি আমাকে দেখা দেন।

দাউদ হনিফার মুখের দিকে চক্ষু তুলিল, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

হনিফা বলিল,—প্রথম দিন আপনি আমাকে অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ আমাকে উন্মত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ফিরোজ যখন আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল, সে সময় তাহার অবস্থা বন্য পশুর ন্যায়।

দাউদ কহিল,—সৌভাগ্য আমার একার, আমার জীবনে নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে।

বিদায়ের সময় হনিফা হাত বাড়াইয়া দিল। দাউদ সেই কুসুম-কোমল হাত নিজের হাতে লইল।

অল্পে অল্পে হাত উঠাইল, অল্পে অল্পে তাহার মাথা নত হইল, তাহার ওষ্ঠাধর হনিফার হস্তে স্পৃষ্ট হইল। হনিফার হাত কাঁপিল, দাউদের হাতের ভিতর রহিল।

যাইবার সময় দাউদ একবার মুখ ফিরাইল, আবার চারি চক্ষুর কোমল মিলন, চক্ষুর নিকট চক্ষুর বিদায়।

—৫—

সেই দিন হইতে দাউদের জীবন-স্রোত আর এক খাতে প্রবাহিত হইল। প্রেমের বন্যা আসিয়া তাহার হৃদয়কে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে একই মূর্ত্তি তাহার মানস-দৃষ্টিতে সমুদিত হইত, একই নাম অনুক্ষণ তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কারিত, ধ্বনিত হইত। হনিফা, হনিফা, হনিফা! হনিফার মুখ সর্ব্বদা তাহার নয়নসমক্ষে সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইত,—তাহার হৃদয়াকাশ আলোকিত করিত। হনিফার চক্ষুর জ্যোতিঃ তাহার মানস-পথে বিচ্ছুরিত হইত। সেই করকমলের স্পর্শ স্মরণ করিয়া তাহার হস্ত কম্পিত হইত। এই অভূতপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় আকুলতা দাউদ কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিত না, করিবার চেষ্টাও করিত না। সেই এক চিন্তাতেই তাহার অসীম আনন্দ, আবার সেই চিন্তাতেই অসহ্য যন্ত্রণা। আনন্দ স্মৃতিতে, যন্ত্রণা পুনরায় দর্শনের বিলম্বে। তাহার আত্মসংযম তিরোহিত হইয়া আসিতেছিল।

প্রতিদিন অপরাহ্ণ কালে দাউদ আখড়ায় যাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইত, কিন্তু সেখানে যাওয়া হইত না। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চলিতে চলিতে রাবীর অভিমুখে চলিয়া যাইত, আবার পথে থমকিয়া দাঁড়াইত। কিসের ছলে নিত্য হনিফার বাড়ী যাইবে? হনিফা অসন্তুষ্ট না হইলেও তাহার গৃহে অপর লোকজন আছে, তাহারা কি মনে করিবে, কি বলিবে? একবার ঘটনাক্রমে হনিফার যৎসামান্য উপকার করিয়াছিল বলিয়া কি দাউদ যখন-তখন তাহার গৃহে যাইতে পারে? আবার ভাবিত, হনিফা অপ্রসন্ন না হইলে আর কাহারও কথায় কি আসিয়া যায়? হনিফা স্পষ্টাক্ষরে দাউদকে আবার যাইতে বলে নাই সত্য,

কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে কি আহ্বান ছিল না ? বিদায়ের সময় হনিফা মুখে কিছু না বলিলেও চক্ষুর ভাষায় দাউদকে আবার আসিতে বলিয়াছিল।

কয়েক দিন দাউদ রংমহলে গেল না। এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। তিন চার দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নের পর রাঁঝা দাউদকে দেখিতে আসিল। দাউদ অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল।

ঘরে বসিয়া রাঁঝা জিজ্ঞাসা করিল,—কয়েক দিন তুমি আখড়ায় যাও নাই কেন ? তোমার শরীর কি অসুস্থ ?

—না, আমার কোন অসুখ করে নাই, আলস্যের কারণ কয় দিন যাইতে পারি নাই।

—সে কোন কাজের কথা নয়। তোমাকে অন্যমনস্ক দেখিতেছি। তুমি কি সেই রমণীর গৃহে গিয়াছিলে ?

—এক দিন গিয়াছিলাম।

—তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

—হইয়াছিল। তাহারা দক্ষিণ দেশে বাস করে, সেখানে জেনানার পর্দ্দা নাই।

—বাড়ীতে আর কে আছে ?

—লোক-জন, কর্ম্মচারী আছে, বাপ-মা নাই। সম্পত্তি তিনি নিজেই দেখেন। এক পাগল ভাই আছে, তাহারই চিকিৎসার জন্ম উহারা এখানে আসিয়াছে।

—রমণীর প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মিয়াছে ?

দাউদ কোন উত্তর করিল না, মস্তক অবনত করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

রাঁঝা বলিল,—ইহাতে দোষের কিছু দেখি না। সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা, অবস্থাপন্ন, তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হও, তাহা হইলে বিবাহে বাধা কি?

—পিতামাতার অনুমতি না হইলে কেমন করিয়া বিবাহ হইবে? রমণীর মনোভাবও আমি জানি না। তাহাকে দুইবার মাত্র দেখিয়াছি, বিবাহের প্রসঙ্গ কেমন করিয়া হইবে?

—তোমাদের দুই জনের মনের কথা পরস্পরের জানিতে কতক্ষণ? মনের মিল কুস্তির প্যাঁচের মতন, তড়ি-ঘড়ি বাঁধিয়া ফেলে। মনে মনে মনের ভাব তুমি কত দিন চাপিয়া রাখিবে? খোলাখুলি কথা কহিয়া ঠিক করিয়া ফেল। তোমার পিতামাতার আপত্তির কোন কারণ দেখি না। তুমি আজ সেখানে যাও, অবসর হয় কথা পাড়িবে; নাহিলে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে, রমণীর আর কোথাও বিবাহের কথা হইয়াছে কি না।

রাঁঝা দাউদকে উৎসাহিত করিয়া চলিয়া গেল। দাউদ নিজেই প্রতিদিন যাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, কেবল লজ্জার শাসনে আত্ম-নিবারণ করিত। ওস্তাদের পরামর্শ তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ, বৈকালে সে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ঘোড়ায় চড়িল না, বাইসিকেল ছিল, তাহাতে করিয়াই চলিয়া গেল।

অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে, অস্তমান সূর্য্য মাঝে মাঝে মেঘের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। লাল মেঘের ছায়া রাবীর জলে পড়িয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার উপর সূর্য্যের আলোক চিক্‌মিক্ করিতেছে। রাবীর ধারে পঁহুছিয়া দাউদ দেখিল, সেই বিশালকায় গোরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদি সে আবার আক্রমণ করে, তাহা হইলে বাইসিকেলে থাকিলে দাউদের অসুবিধা, এই বিবেচনা করিয়া সে বাইসিকেল হইতে নামিল।

গোরা কট্‌মট্‌ করিয়া দাউদের দিকে চাহিয়া রহিল, মারামারি করিবার উপক্রম করিল না। দাউদ তাহার নিকটে গিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

গোরা অবাক্‌ হইয়া গেল। নোটখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ভাঙ্গা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল,—এ কি হইবে?

দাউদ হাসিয়া কহিল,—ওখানা তোমার, বিয়ার পান করিও।

গোরার বিস্ময় তখনও অপনীত হয় নাই। নোটখানা আস্তে আস্তে পকেটে পূরিল। দাউদ আবার বাইসিকেলে উঠিল। তখন গোরা মনের আনন্দে গান ধরিল,—হী ইজ এ জলি গুড ফেলো!

—৬—

রংমহলে উপনীত হইয়া দাউদ সিঁড়ির পাশে বাইসিকেল রাখিয়া বারান্দায় উঠিল। দেখিল, পাশের একটা ঘরের জানালার পাখি খুলিয়া ফিরোজ তাহাকে দেখিতেছে। ফিরোজের ঘূর্ণিত লোহিত চক্ষু, মুখে পৈশাচিক ক্রোধের চিহ্ন। দাউদকে দেখিয়া বদ্ধমুষ্টি তুলিয়া তাহাকে শাসাইল। দাউদ কিছু না বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সেই পুরাতন ভৃত্য আসিয়া পূর্ব্বে দাউদকে যে-ঘরে বসাইয়াছিল, সেই ঘরে লইয়া গেল। বলিল,—আপনি বসুন, আমি খবর দিতেছি।

ভৃত্য চলিয়া যাইবার একটু পরেই দাসী আসিল। সে সেলাম করিয়া বলিল,—বিবি সাহেব গোসল-খানায় আছেন, এখনি আসিতেছেন। আপনি অপরাধ লইবেন না।

দাউদ বলিল,—আমি না হয় একটু অপেক্ষা করিলাম, তাহাতে কি হইয়াছে ?

দাসী দাঁড়াইয়া রহিল। দাউদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, —খাঁ সাহেব, আপনি এত দিন আসেন নাই কেন ? আমরা কত কি ভাবিতেছিলাম। বিবি সাহেব মনে করিতেছিলেন, হয় ত সেদিন নবাবজাদার কাণ্ড দেখিয়া আপনি কিছু বিরক্ত হইয়াছেন, সেই কারণে আর আসেন নাই।

—পাগলের কাণ্ড দেখিয়া কে আবার কি মনে করে ? আমি এমনি আসি নাই। আমার কি ঘন ঘন আসা উচিত ? লোকে কিঁ মনে করিবে ?

—কে আবার কি মনে করিবে ? আপনি আসিলে সকলেই খুসী হয়। সেখানে বিবি সাহেবের অনেক কাজ, তবু সকলের সঙ্গে দেখা করিতেন। এখানে কাজ-কর্ম্ম কিছু নাই, বিবি সাহেব রোজ বেড়াইতেও যান না, আপনাকে তিনি যথেষ্ট খাতির করেন ; আপনি আসিবেন, তাহাতে আবার কথা কি ?

—আমাদের এখানে পর্দ্দা আছে কি না, তাই আমার মনে একটু খট্‌কা লাগে।

দাসী থুঁতিতে আঙুল দিয়া মাথা নাড়িয়া একবার হাসিল ; বলিল, —আপনার এখানে আসিতে কি লজ্জা বোধ হয় ?

দাউদও হাসিল, কহিল,—লজ্জা কেন হইবে ? তবে আমি ত অপরিচিত লোক বলিলেই হয়, বার বার আসিলে তোমরাই বিরক্ত হইতে পার।

—শেষে আমরাই অপরাধী হইলাম ! আপনার এখানে আসিতে ইচ্ছা করে না ?

—আমার রোজ আসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই কি করা উচিত ?

—অন্যায় হইলে করা উচিত নয়, কিন্তু এখানে আসা কি আপনার অন্যায় মনে হয় ?

—আমার কেন, অপর লোকের কথা ভাবিতেছি।

—অপর লোকের জন্য কিসের ভাবনা ? আপনার দিল ও বিবি সাহেবের দিল রাজি হইলেই হইল।

দাউদের মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল,—এমন কথা শুনিলে বিবি সাহেব রাগ করিতে পারেন।

দাসী বলিল,—আমি কি না জানিয়া বলিতেছি ? আচ্ছা, খাঁ সাহেব, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না। আপনার কি শাদি হইয়াছে ?

—না, ও-কথা আমি কখন ভাবি না।

—আপনি এমন নওজোয়ান, এমন সুপুরুষ, আপনার বাড়ীতে ও-কথা উঠে না ?

—উঠিলেও আমি কানে তুলি না। ও-কথা ছাড়িয়া দাও।

দাসী দাউদের নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—বিবি সাহেবকে আপনার শাদি করিতে ইচ্ছা করে ? যেমন খুবসুরত—তেমনি গুণবতী।

দাউদ বলিল,—অমন কথা বলিতেছ কেন ? নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশে কেন তাঁহার বিবাহ হইবে ?

—নিজের দেশের একমাত্র পাত্র ত নবাবজাদা ফিরোজ। তিনি ত পাগল হইয়াছেন, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিন্। বিবি সাহেব মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার মন আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আপনার পথ দেখেন। এখন আমি যাই, বিবি সাহেবের কাপড় বাহির করিয়া দিতে হইবে।

দাসী চলিয়া গেলে দাউদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; দাসী কি তাহার সঙ্গে কৌতুক করিতেছিল, না সত্য কথা বলিতেছিল? নিজের মনোভাব দিয়া দাউদ হনিফার মনের ভাব কেমন করিয়া বুঝিবে? সেদিন হনিফার দৃষ্টিতে কি দেখা দিয়াছিল? অনুরাগের জ্যোতি—না, শুধু কৃতজ্ঞতার ছায়া?

হনিফা ঘরে প্রবেশ করিতেই দাউদ উঠিয়া দাঁড়াইল। হনিফা বলিল,—এত দিন আপনি আসেন নাই কেন? সেদিন ফিরোজের উৎপাতে আপনি বিরক্ত হন নাই ত?

দাসী হনিফার পিছনে আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

দাউদ বলিল,—বিলক্ষণ! এমন কথা মনে করিবেন না। এখানে আসিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তবে সর্ব্বদা কি আমার আসা উচিত?

—কেন, তাহাতে কি দোষ আছে?

হনিফা দাউদের নিকটে আসিয়া হাসিয়া বলিল,—আমার রক্ষার ভার আপনার উপর, সে-কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? এই কয় দিনের মধ্যে যদি আমার আর কোন বিপদ হইত?

হনিফা আসিয়া দাউদের সম্মুখে বসিল। তাহার কথা শুনিতে বিদ্রূপের মত, কিন্তু সেই-সঙ্গে ব্যগ্রতার ভাবও মিশ্রিত ছিল। তাহার কথা শুনিয়া ও তাহাকে বসিতে দেখিয়া দাসী নিঃশব্দে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দাসী চলিয়া গেল—দাউদ দেখিতে পাইল। হনিফার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—তোমাকে চিরকাল রক্ষা করিবার অধিকার কি আমাকে অর্পণ করিবে?

এমন কথার অর্থ কি হইতে পারে? দাউদ হনিফাকে আপনি না বলিয়া তুমি বলিল কেন? হনিফাও ফিরিয়া দেখিল দাসী নাই, দরজা ভেজান রহিয়াছে। হনিফার চক্ষু কোমল হইয়া আসিল, কম্পিত স্বরে কহিল,—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

দাউদ হনিফার হস্তধারণ করিল, কহিল,—আমি তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমাকে বিবাহ করিবে?

—তোমাকে দেখিয়াই আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু আমি বিদেশিনী, এখানে সকলের কাছে অপরিচিতা। তোমার পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, আমাদের বিবাহে সম্মত হইবেন কি না বলিতে পারি না। আমার কথা স্বতন্ত্র। আমাকে নিষেধ করিবার কেহ নাই।

—আমার পিতামাতাও কোন আপত্তি করিবেন না। তাঁহারা আমার চরিত্র জানেন। তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি কখন নারীর প্রেম জানিতাম না। এখন তুমি আমার শুধু চোখে নহে—আমার হৃদয়ে রহিয়াছ, তোমার দর্শন-লালসা আমাকে আকুল করিয়াছে।

—আমি প্রতিদিন তোমার পথ চাহিয়া থাকি। তোমাকে কয় বারই বা দেখিয়াছি, তবু মনে হয়, তুমি চির-পরিচিত, চির-প্রিয়। এত দিন আমার প্রাণ যেন নিদ্রিত ছিল, তোমাকে দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। যেদিকেই দেখি, তোমাকে দেখিতে পাই; তুমি যেন আমাকে ডাকিতেছ, সকল প্রকার আশঙ্কা হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছ।

দাউদ হনিফাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। হনিফার মস্তক দাউদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইল।

এমন কতক্ষণ গেল। বসন্ত বাতাসের মর্ম্মরের ন্যায় দুই জনে

মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিল, প্রেমের পুরাতন বার্তা, বার বার প্রিয় সম্বোধন, আবার নীরবে নয়নে নয়নে কথা। কতক্ষণ পরে হনিফা দাউদের বাহুবন্ধনমুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—অন্ধকার হইয়া আসিল, এতক্ষণ আমরা একা রহিয়াছি।

হনিফা কল টিপিয়া বিদ্যুতের আলোক জ্বালিয়া দিল। দাউদ কহিল,—তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিত থাকিবার কিছু আবশ্যক আছে ?

হনিফা কহিল,—আছে বৈ কি! আমি কি নির্লজ্জের ন্যায় অন্ধকারে পরপুরুষের সহিত বসিয়া গল্প করিব ?

—পরই ত আপন হয়।

—সে পরের কথা, বলিয়া দরজা খুলিয়া হনিফা দাসীকে ডাকিল।

দাউদ বলিল,—আমি এখন যাই।

হনিফা দাউদের হাত ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল,—আবার কবে আসিবে ?

—যত শীঘ্র পারি।

—কত শীঘ্র ?

—কাল।

দাসী আসিয়া দেখে, দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাউদ হনিফার হাত ছাড়িয়া দাসীর সঙ্গে বাহিরে আসিল। তাহাকে বলিল,—একটা নূতন খবর হয়ত তোমার মনের মত হইবে। তোমার বিবি সাহেবকে আমি বিবাহ করিব।

দাসী মস্ত লম্বা সেলাম করিয়া কহিল,—শাদি মোবারক! এ বড় খুশ খবর!

—৭—

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাউদ দেখিল, অন্ধকার হইয়াছে। সে বাইসিকেলের আলো জ্বালিয়া তাহাতে উঠিয়া ধীরে ধীরে ফটকের দিকে চলিল। পথে এক স্থানে বড় বড় গাছের তলায় অত্যন্ত অন্ধকার। দাউদ এক পাশ দিয়া আস্তে আস্তে বাইসিকেল চালাইতেছিল।

হঠাৎ পশ্চাতে বিকট চীৎকার শুনিয়া দাউদ বাইসিকেল হইতে লাফাইয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল, ফিরোজ কোন রূপে প্রহরী দুই জনকে এড়াইয়া তাহার পিছনে আসিয়াছে। চীৎকার করিয়াই ফিরোজ দাউদকে আক্রমণ করিল। তাহার হাতে ছিল একটা ছুরি। যেমন ছুরি তুলিয়া সে দাউদের বক্ষে আঘাত করিবে, অমনি গাছের শিকড়ে পা লাগিয়া পড়িয়া গেল। পড়িবার সময় ছুরি দাউদের উরুস্থলে বিদ্ধ হইল। দাউদ ফিরোজের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ক্ষতস্থান হইতে বেগে রক্ত ছুটিল।

রক্ষক দুই জন ফিরোজকে খুঁজিতেছিল, চীৎকার শুনিয়াই ছুটিয়া আসিল। দাউদ রুমাল বাহির করিয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিতেছিল, রক্ষকদিগকে দেখিয়া বলিল,—আমার পায়ে ছুরি মারিয়াছে, তোমরা ইহাকে সাম্‌লাও।

রক্ষকেরা তখনি ফিরোজকে বাঁধিয়া ফেলিল। আহত হইয়া দাউদ মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছিল, রক্তস্রাবে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আবার যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন দেখে, ঘরের ভিতর পালঙ্কে সে শয়ন করিয়া আছে, ক্ষতস্থান আঁটিয়া বাঁধা, শয্যার পাশে হনিফা, দাসী ও কর্ম্মচারী। হনিফা ও দাসীর নয়নে অশ্রু বহিতেছে।

দাউদের মুখ কিছু ম্লান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্লেশের আর কোন চিহ্ন নাই। হাসিয়া কহিল,—তোমরা কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে?

হনিফা অশ্রু সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিল,—আমার বাড়ীতে আসিয়া তোমার এইরূপ হইল! তোমার পিতা আসিলে তাঁহাকে আমরা কি বলিব?

—আমার পিতার আসিবার কি প্রয়োজন?

কর্ম্মচারী বলিল,—অপনার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, এ সংবাদ কি তাঁহার নিকট গোপন করা যায়? তাঁহাকে ও ডাক্তারকে আনিবার জন্য মোটর পাঠান হইয়াছে, তাঁহারা এখনি আসিবেন।

দাউদ বলিল,—সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, সেজন্য আপনারা এত চিন্তিত হইয়াছেন কেন? আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেই হইত, যাহা বলিবার আমি নিজেই বলিতাম।

—আপনাকে কি অচৈতন্য অবস্থায় পাঠাইয়া দেওয়া যায়?

—আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়া থাকিবে। রক্ত ছুটিলে ওরূপ হয়, কিন্তু ও কিছুই নয়। অমন চোট কত লাগিয়া থাকে।

কর্ম্মচারী বলিল,—ডাক্তারের আসিবার সময় হইল, আমি তাঁহাদিগকে লইয়া আসি।

কর্ম্মচারী বাহিরে গেল। হনিফা দাউদের পাশে খাটে বসিল। তাহার চক্ষুতে কেবল অশ্রু পুরিয়া আসিতেছিল। বলিল,—এমন জানিলে তোমাকে কখন এখানে আসিতে বলিতাম না। তোমার পিতা শুনিয়াই বা কি বলিবেন? তিনি আমাদিগকে তোমার শত্রু মনে করিবেন। তুমি সারিয়া উঠিয়া গৃহে যাও, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। বিবাহের কথা স্বপ্নতুল্য হইল।

দাউদ হনিফার হাত ধরিল। হাসিয়া বলিল,—স্বপ্ন সত্য হইবে। তুমি দেখিও হয় কি না।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। দাউদ বলিল, তোমরা পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াও, তাহা হইলেই সব দেখিতে শুনিতে পাইবে।

হনিফা ও দাসী ভিতরকার দরজার পর্দ্দার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

কর্ম্মচারীর পশ্চাতে নবীউল্লা খাঁ ও ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিলেন। নবীউল্লার বয়স হইয়াছে, কিন্তু অধিক বৃদ্ধ হন নাই। গম্ভীর মূর্ত্তি, শান্ত পুরুষ, এখন উদ্বেগে আননে চিন্তার চিহ্ন। গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—অন্য কোন কথা হইবার পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেব দেখুন।

ডাক্তারের সঙ্গে আর এক জন লোক আসিয়াছিল, সেও ব্যাগ হাতে করিয়া পিছনে পিছনে আসিল।

গরম জল, গামলা, বাসন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। ব্যাগ হইতে একটা স্পিরিটের আলো বাহির করিয়া, একটা বাটিতে কয়েকটা অস্ত্র ডাক্তারের লোক তপ্ত জলে ফুটাইতে আরম্ভ করিল।

বন্ধন খুলিয়া ডাক্তার ক্ষতস্থান দেখিলেন। তখনও অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছে, বন্ধন খুলিয়া দেওয়াতে আবার বেগে রক্ত ছুটিল। কাটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঔষধ দিয়া ডাক্তার রক্তস্রাব বন্ধ করিলেন। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—শির কাটিয়া যায় নাই, হাড়েও লাগে নাই। ভাল করিয়া ধুইয়া ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া কাটার মুখ বন্ধ করিতে হইবে। কিছু বেশী লাগিবে, ঔষধ দিয়া রোগীকে অজ্ঞান করিলে যন্ত্রণা টের পাইবে না।

দাউদ বলিল,—আমাকে অজ্ঞান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার যাহা করিবার হয় করুন।

—তুমি যাতনা সহ্য করিতে পারিবে ?

—পারি কিনা, আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ।

দাউদের পিতা কহিলেন,—ও যেমন বলিতেছে, আপনি সেইরূপ করুন, কোন চিন্তা করিবেন না।

ডাক্তার ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া, তাহার ভিতরে রবারের সরু নল দিয়া, ক্ষতমুখ সেলাই করিয়া, আঁটিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন। দাউদ দুই একবার অল্প মুখ বিকৃত করিল, কিন্তু মুখে যন্ত্রণার কোন শব্দ করিল না। ডাক্তার তাহার হাতের মাংসপেশী টিপিয়া কহিলেন,—তুমি খুব বাহাদুর ! তুমি কি পাহালওয়ান না কি ?

নবীউল্লা খাঁ কহিলেন,—রাঁঝার আখাড়ায় কুস্তি শেখে ।

—আমিও তাই ভাবিতেছিলাম যে, আঘাত সহ্য করা অভ্যাস না থাকিলে এমন নিশ্চিন্তভাবে অস্ত্র করাইতে পারে না। আর কোন ভাবনা নাই। পরশু ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া বদ্‌লাইয়া দিব। দিন দশেকের মধ্যে সারিয়া যাইবে।

নবীউল্লা খাঁ বলিলেন,—এখন তবে আমি উহাকে বাড়ী লইয়া যাই ?

ডাক্তার বলিলেন,—ইহাকে এখন কোনমতে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে আবার রক্ত ছুটিবার ও অন্য আশঙ্কা আছে। পাঁচ ছয় দিন বিছানা হইতে কোনমতে উঠিতে দেওয়া হইবে না ।

—তাহা হইলে আমাকেও এখানে থাকিতে হইবে।

—আপনার থাকিবার কোন আবশ্যক নাই, আপনি দুই বেলা আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।

—তাহাই হইবে।

ডাক্তারের সঙ্গে ঘরের বাহিরে গিয়া নবীউল্লা তাঁহার হাতে টাকা

দিতে গেলেন, ডাক্তার কোনমতে টাকা লইলেন না। তাহার কারণ, যে-ব্যক্তি ডাক্তারকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে বলিয়া দিয়াছিল, তাঁহার প্রাপ্য হনিফা বিবি চুকাইয়া দিবেন, তিনি যেন দাউদের পিতার নিকট কোনমতে টাকা গ্রহণ না করেন।

নবীউল্লা বলিলেন,—এখন যদি না লয়েন, তাহা হইলে পরে আমাকে বিল পাঠাইবেন।

—সে পরে দেখা যাইবে।

ডাক্তার ফিরোজকে দেখিতে গেলেন। নবীউল্লা ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের কাছে বসিলেন। বলিলেন,—কর্ম্মচারীর মুখে আমি সকল কথা শুনিয়াছি। তুমি যে এখানে আসা-যাওয়া কর, আমরা ত তাহার কিছু জানিতাম না।

—এখানে ত আমি বেশী বার আসি নাই। পরে আপনাকে সকল কথা জানাইতাম।

—এখানে আসিবার কথা কাহাকেও বলিয়াছ ?

—আজ্ঞা হাঁ, রাঁঝাকে বলিয়াছি ?

—তাহার সঙ্গে তোমার সকল কথা হয় বটে। সে লোক ভাল।

—আমার ওস্তাদ। অমন সৎ লোক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

—যে তোমাকে ছুরি মারিয়াছিল, সে উন্মাদ পাগল। দেখিলাম, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

—অল্প দিন হইল উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই বিনা কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রহরীরা সতর্ক থাকিলেও কোথা হইতে একটা ছুরি আনিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

—পাগলের কারণ-অকারণ বুঝিতে পারা যায় না। যে রমণী এই গৃহের কর্ত্রী, তাঁহার সহিত তাহার বিবাহের কথা ছিল, না?

—এরূপও শুনিয়াছি। কিন্তু উন্মাদ সারিবার আশা নাই। হাকিম নসিরুদ্দীন বিশেষ আশা দেন নাই।

নবীউল্লা দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে দাউদের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গলা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি রমণীকে দেখিয়াছ?

—দেখিয়াছি। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে থাকেন, সেদিকে পর্দ্দা নাই।

দাড়ীর ভিতর অঙ্গুলি চলিতেছিল। নবীউল্লার দৃষ্টি দাউদের মুখের দিকে, আপনার মনে যেন বলিতে লাগিলেন,—সুন্দরী, না? ইরানের সম্ভ্রান্ত বংশ, সম্পত্তিশালিনী, বুদ্ধিমতী। বয়স কত হইবে?

দাউদ একটু ভাবিয়া বলিল,—ঠিক বলিতে পারি না। কুড়ি বৎসর হইতে পারে।

নবীউল্লা ও-কথা ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন,—এখানে থাকিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না ত?

—কিসের কষ্ট? আমার উঠিতে নিষেধ, যেখানেই থাকি—পড়িয়া থাকিতে হইবে।

—আমি রাত্রে তোমার কাছে থাকিব?

—আপনার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছেন, আপনার থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

—তবে আমি যাই। তোমার চাকরকে এখনি পাঠাইয়া দিতেছি। কাল ভোরে আসিব। তোমার মাও আসিবেন। তিনি কত কি ভাবিতেছেন। তাঁর আসা দরকার।

দাউদের অঙ্গে হাত বুলাইয়া নবীউল্লা খাঁ চলিয়া গেলেন।

—৮—

যেমন নবীউল্লা বাহির হইয়া গেলেন, অমনি হনিফা ও দাসী দাউদের ঘরে প্রবেশ করিল। হনিফা আঙ্গুল তুলিয়া বলিল,—তুমি বেশী কথা কহিও না, ডাক্তর কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। তুমি ত সকলের সঙ্গে কেবলি কথা কহিতেছ।

—বাপের সঙ্গে কথা কহিব না? কাল আমার মা আসিবেন, জান ত?

—জানি। জানিবার জন্যই ত পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তোমার বাবা আমার বয়স জানিতে চাহিলেন কেন?

—আমিও সেই কথা ভাবিতেছি। হয় ত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন।

—সম্বন্ধ ত ঠিক হইয়াছে।

—তাহা তিনি জানেন না, তবে তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ হইয়া থাকিতে পারে। কাল মা আসিয়া আমাকে দেখিবেন, তোমাকেও দেখিবেন ত? তুমি এদেশী কাপড় পরিয়া থাকিও।

—যো হুকুম। পেশগীর, বুরকা সব তৈরী আছে।

ডাক্তার দাউদের জন্য যে পথ্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে তাহাই দেওয়া হইল। মুরগীর শুরুয়া, পাতলা শুকনা রুটি আর ফিরণী। আহার শেষ হইতে দাউদের ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। হনিফা তাহার সম্মুখে বাহির হইল না।

ভৃত্য আসিয়া বলিল,—মিঞা সাহেব, বড়ি বিবি আপনাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি এখনি আসিতে চাহিতেছিলেন, বড়া মিঞা তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, আপনার

তেমন কিছু লাগে নাই বলিয়া, থামাইয়া রাখিয়াছেন। বিবি সাহেব ভোরে আসিবেন।

—বেশ কথা। আমার সামান্য লাগিয়াছে, চিন্তার কোন কারণ নাই।

—রাত্রে আমি হুজুরের কাছে থাকি?

—কোন আবশ্যক নাই। রাত্রে প্রয়োজন হইলে তোমাকে ডাকিব।

ভৃত্য বাহিরে অপর চাকরদের কাছে গেল। হনিফা আবার আসিয়া বলিল,—প্রয়োজন হইলে আমাদেরও ডাকিবে।

—আচ্ছা।

হনিফা ও দাসী চলিয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে নবীউল্লা ও দাউদের মাতা আসিলেন। আঘাতের তাড়সে ও রক্তস্রাবে দাউদের ঈষৎ জরভাব হইয়াছিল। মাতা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—বেটা, তোমার জর হইয়াছে!

—ও কিছুই নয়, এখনি ছাড়িয়া যাইবে। তোমরা এত ভাবিতেছ কেন? আমার এমন কিছুই হয় নাই, দু'চার দিনে সারিয়া যাইবে।

—তুমি এখানে আসিয়াছিলে কেন? ছেলে দিব্য সুস্থ শরীর, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, কোথা হইতে একটা পাগল তাহাকে ছুরি মারিয়া বসিল।

—নবীউল্লা বলিলেন, ও-কথায় কাজ নাই। ইহাতে কাহারও অপরাধ নাই।

—তা ত বুঝিলাম, কিন্তু আমার ছেলে এখানে কত দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিবে? বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি সর্ব্বদা উহার কাছে থাকিতে পারি।

—দু'চার দিনের মধ্যেই বাড়ী যাইবে। চিন্তার কোন কারণ নাই।

তাঁহারা কথা কহিতেছেন, এমন সময় দাসী আসিয়া সেলাম করিয়া, দাউদের মাতাকে কহিল,—বেগম সাহেবা, একবার অন্দর-মহলে যাইবেন না?

—যাইব বই কি, তোমার বিবি সাহেবের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি।

দাউদের মাতা দাসীর সঙ্গে ভিতরে গেলেন। পিতা-পুত্রে কথোপকথন হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে দাউদের মাতা ফিরিয়া আসিলেন। হর্ষোৎফুল্ল আনন, চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল। স্বামীকে কহিলেন,—তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি এবেলা এখানেই থাকিব, সন্ধ্যার সময় বাড়ী যাইব।

নবীউল্লা বলিলেন,—আহারাদির কি হইবে?

—ইহারা এখানে খাইতে না দেয়, উপবাসী থাকিব।

পর্দ্দার পিছনে চাপা হাসির অল্প শব্দ শুনা গেল। নবীউল্লা কিছু লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

দাউদের মা বলিলেন,—আমি এতক্ষণ হনিফার সঙ্গে গল্প করিতে-ছিলাম। খুব লজ্জাশীলা আর নরম প্রকৃতির মেয়ে। আর সুন্দরী ত বটেই, পরমা সুন্দরী। তোমার সঙ্গে কথা কহিল কেমন করিয়া?

—ওদের দেশে পর্দ্দা নাই জান ত? তবে সে গোরাটা না আসিলে আমার সঙ্গে আলাপ হইত না।

দাউদের মা হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন,—তুই ত কিছু বলিস্ নাই, হনিফার কাছে সব শুনিলাম। ছেলে আমার রুস্তম। আরও শুনিলাম, ফিরোজকে ডাক্তার পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দিয়াছে।

যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে খুন করিবে; তাহাকে এখানে সাম্‌লান অসম্ভব। রোগ কিছুতেই সারিবে না।

—বড় আপশোষের কথা।

দাউদের মা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ছেলের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন,—তুমি এখানে হনিফাকে দেখিতে আসিতে, না?

দাউদ কোন উত্তর দিল না, মা'র হাত চাপিয়া ধরিল। মা মুচকাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—হনিফাকে বিবাহ করিবে?

দাউদের চক্ষু অত্যন্ত কোমল হইয়া মা'র মুখের উপর পড়িল। কহিল,—সেই কথা আমি তোমাকে বলিব ভাবিতেছিলাম। আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।

—বড় কঠিন পণ। তুমি গুণ্ডা পাহালওয়ান, হনিফা তোমাকে বিবাহ করিবে কেন?

—না করে ত আর কি করিব?

—নিজেদের মধ্যে কথা ঠিক করিয়া এখন আবার বোকা সাজিতেছ। এ ত ফিরিঙ্গীর বিবাহ।

দাউদের মা উঠিয়া ফস্ করিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিলেন। দাসী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছে, হনিফা পলায়ন করিয়াছে।

দাসী দাউদের মা'র হাত ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল,—বেগম সাহেবা, শাদি করিয়া দাও—শাদি করিয়া দাও! মিঞা সাহেব আর বিবি সাহেব দিবা-রাত্র পরস্পরের দর্শন-কামনা করে। তুমি এমন পুত্রবধূ পাইবে না, বিবি সাহেবও এমন শোহর পাইবে না।

—আর তুই দু'-তরফ হইতে সোনার জেওয়র আর জরির পেশোয়াজ পাইবি, কেমন?

—তা ত পাইবই, আর আপনাদের দৌলতে আমার ভাবনা কিসের ?

—আচ্ছা, তুই এইবার গোসলখানায় গরম জল দিতে বল, আমার স্নানের সময় হইয়াছে।

—আমি গিয়া এখনি সব ঠিক করিয়া রাখিতেছি, বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

দাউদের মা পুত্রের কাছে আসিয়া বলিলেন,—তুমি সারিয়া উঠিলেই তোমার বিবাহ দিব। ডাক্তার অনুমতি দিলেই তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব, তাহার পর যত শীঘ্র হয় বিবাহ হইবে। কেমন, এখন তোমার মনের মত কথা হইয়াছে ত ?

দাউদ মাতার হস্ত লইয়া নিজের মাথার উপর রাখিল, বলিল,—তোমার দোয়া হইলেই আমার সুখ হইল।

দাউদের মা যখন স্নানাগারে গমন করিলেন, সেই অবকাশে হনিফা দাউদের নিকটে আসিল। সঙ্গে দাসী ছিল না। দাউদ হনিফার হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল, বলিল,—মা কি বলিয়াছেন, শুনিয়াছ ?

—শুনিয়াছি, বলিয়া হনিফা দাউদের বক্ষে মুখ লুকাইল।

কিছু পরে দাউদ হনিফার মুখ তুলিয়া ধরিল। হনিফার চক্ষু আনন্দ-সলিলে ভাসিতেছে।

কেহ কোন কথা কহিল না।

যে দেশে পাখী নেই

রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, আর সদাগরপুত্র দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিন জনেরই পোষাক এক রকম, খুব জাঁকালও নয়, খুব খেলোও নয়। তিন জনের বয়স প্রায় সমান, তবে তিন জনে দেখতে তিন রকম। রাজপুত্র দেখতে রাজপুত্রের মত, বেশ দোহারা শরীর। মন্ত্রিপুত্র রোগা, মুখ বেশ টিকল। সদাগরপুত্র দেখতে সব চেয়ে ভাল, আর সদাই হাস্যমুখ। রাজপুত্রের সঙ্গে একটা মস্ত কুকুর, মন্ত্রিপুত্রের কিছু নেই, সদাগরপুত্রের হাতে পিতলের খাঁচায় লাল মখমলের ঢাকা দেওয়া টিয়ে পাখী। পাখীর জন্য একটা সোনার দাঁড়ও আছে। পড়া পাখী, পথে যেতে যেতে অনেক নতুন কথা শিখেছে।

তিন বন্ধু কত দেশ দেখলেন. কত নদী পার হ'লেন, কত দেশের কত কথা শুনলেন, কত বার কত বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। এই রকম যেতে যেতে এক নতুন দেশে উপস্থিত হ'লেন। সহরের চারদিকে বড় বড় বাগান, তাতে কত রকম ফুল-ফলের গাছ। তিন বন্ধুতে একটা বাগানের ভিতর গিয়ে একটা বড় গাছ তলায় বসলেন। সূর্য্য তখন অস্ত যায়-যায়। বড় বড় গাছের ছায়া লম্বা হয়ে বন্ধুদের অনেক পিছনে পড়েছে। পুকুরের এক কোণে সূর্য্যের আলো ঝিকমিক করচে।

মন্ত্রিপুত্র বল্লেন,—তোমরা দু'জনে এখানে ব'স, আমি সহরের একটু দেখে এখনি ফিরে আসছি।

রাজপুত্র বল্লেন,—তুমি একা যাবে কেন? চল, তিন জনে একসঙ্গে যাওয়া যাক।

মন্ত্রিপুত্র বল্‌লেন,—মাঝে মাঝে একটু সাবধান হওয়া ভাল। তোমরা কিছু ভেব না, আমি এই ফিরে এলাম ব'লে।

ঘোড়া ত রইল গাছে বাঁধা। মন্ত্রিপুত্র হেঁটে সহরে প্রবেশ করলেন। সহরে রাস্তায় লোকজন চুপচাপ চলেচে, বড়-একটা কথাবার্ত্তা কইচে না। মন্ত্রিপুত্র ভাবলেন, তাই ত, এমন সময় এমন ক'রে সব চুপ ক'রে আছে কেন? রাজার কিছু হয় নি ত?

সাম্‌নে এক জন বুড়ো মানুষকে দেখে মন্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন,— মশায়, আমি বিদেশী, কাছাকাছি কোথাও ভাল পান্থনিবাস নেই?

বৃদ্ধ মন্ত্রিপুত্রের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভাল ক'রে দেখলেন, তার পর রাস্তার সাম্‌নের দিকে আর পিছনদিকে চেয়ে দেখে বল্‌লেন,— মোড়ের মাথায় ঐ লাল বাড়ী—সরাই।

ব'লেই তিনি চ'লে গেলেন, আর পিছন ফিরে চাইলেন না।

সরাইয়ের সুমুখে গিয়ে মন্ত্রিপুত্র দেখলেন, মস্ত বড় দরজা। আর তার ভিতর বড় উঠান। উঠানের এক দিকে ঘোড়া বাঁধবার আস্তাবল, আর এক দিকে বাঁধান কুয়া। ভিতরে ঢুকবার দরজার কাছে একজন আধাবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে, সরাই তার। মন্ত্রিপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমি বিদেশী, এখানে থাকবার জায়গা আছে?

প্রৌঢ়া হেসে বল্‌লে,—আছে বই কি, এ অতিথিশালা, বিদেশীদের থাকবার জায়গা।

—আমরা তিন বন্ধু, তিন জনের থাকবার স্থান চাই।

—আর দু'জন কোথায়?

—তারা সহরের বাইরে আছে। থাকবার জায়গা হ'লে তাদের নিয়ে আস্‌ব।

—ঘর দেখ, দেখে পসন্দ হয় ত তাদের নিয়ে এস।

মন্ত্রিপুত্র রমণীর সঙ্গে গিয়ে ঘর দেখলেন। ছোট বড় ঘর কয়েকটা দেখে বল্‌লেন,—আমাদের একটা বড় ঘর হ'লেই হবে, তিন জনে এক ঘরেই থাকব।

প্রৌঢ়া একটা বড় ভাল ঘর দেখিয়ে বললে,—এ ঘরের ভাড়া রোজ দু'টাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা, কেউ এখানে খায়, কেউ বাজারে খায়।

মন্ত্রিপুত্র তার হাতে দশটি টাকা দিয়ে বল্‌লেন,—পাঁচ দিনের ভাড়া নাও। আমাদের খাবার ভাল ক'রে দিও, তার জন্য আলাদা টাকা দেব'। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সহরের লোক সব এমন চুপচাপ ক'রে আছে কেন, কোন গোলমাল নেই!

—তা বুঝি শোন নি? তুমি বিদেশী, সবে এখানে এসেছ, কেমন ক'রেই বা জানবে? কাল পাঁচজন বিদেশী যুবকের মাথা কাটা যাবে, তাই সহরের লোক দুঃখিত হয়ে আছে।

—কেন, তাদের কি অপরাধ?

—তারা বলেছিল, রাজকন্যাকে তারা হাসাবে, তা হাসাতে পারেনি ব'লে তাদের প্রাণদণ্ড হবে।

—এ কি রকম কথা?

—আমাদের রাজকন্যা অনেক দিন থেকে হাসেন না। রাজা বল্‌লেন,—রাজকন্যাকে যে হাসাতে পারবে, তাকে অনেক পুরস্কার দেবেন। তা কেউ পারলে না। তার পর রাজা বল্‌লেন,—যে রাজকন্যাকে হাসাতে পারবে, তাকে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন আর অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবেন। তাতেও কেউ রাজকন্যাকে হাসাতে পারলে না। তার পর রাজা রেগে পণ করলেন যে, যদি কেউ রাজকন্যাকে

হাসাতে পারে ত ভাল, সে যা চাইবে তাই দেবেন, আর যদি না পারে তা হ'লে তার গর্দ্দান যাবে। আহা, বিদেশে এসে পাঁচ জনের প্রাণ যাবে !

—২—

এই কথা শুনে মন্ত্রিপুত্র সহরের বাইরে বাগানে গিয়ে দুই বন্ধুকে বল্লেন। তিন বন্ধু এই কথা বলাবলি করতে করতে সরাইয়ে এসে উঠলেন। তাঁদের ঘরের দরজার সাম্‌নে সরাইওয়ালীর কিশোরী সুন্দরী কন্যা দাঁড়িয়েছিল। রাজপুত্রের কুকুর তাকে দেখে ল্যাজ নেড়ে তার কাছে গেল। রাজপুত্র হেসে বল্লেন,—আমার কুকুর মানুষ ঠিক চেনে। তোমাকে যখন বন্ধু ঠাউরেছে, তখন নিশ্চয় তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে। তোমার নাম কি ?

কিশোরী কুকুরের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে,—আমার নাম আবিদা। উপকারের মধ্যে আমি তোমাদের রেঁধে খাওয়াব।

রাজপুত্র বল্লেন,—এর চেয়ে উপকার আর কি হ'তে পারে ?

সদাগরপুত্রের হাতে ঢাকা খাঁচা দেখে আবিদা জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার হাতে কি ?

—ও একটা পাখী।

অমনি আবিদার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বল্লে,—কি সর্ব্বনাশ ! রাজার লোক জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না ! এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই, কেউ দেখতে পাবে ; ঘরের ভিতর এস।

সকলে ঘরের ভিতর গেলে আবিদা দরজা ভেজিয়ে দিলে। সদাগর-পুত্র বল্লেন,—এ ত নতুন রকম দেশ দেখছি। রাজকন্যাকে হাসাতে

না পারলে মাথা কাটা যায়, আর খাঁচায় পাখী রাখলে সর্ব্বনাশ হয়! ব্যাপারখানা কি?

এমন সময় আবিদার মা এল। দরজা খুলে বল্‌লে,—কি হয়েছে?

আবিদা বল্‌লে—মা, এঁদের সঙ্গে একটা পাখী!

—সর্ব্বরক্ষের মাথায় পা! এ দেশে কি পাখী আন্‌তে আছে!

রাজপুত্র বল্‌লেন,—কথাটাই কি শুনি!

আবিদা বল্‌লে,—এখানে কারুর পাখী রাখবার হুকুম নেই। সহরের বাইরে কোথাও পাখী দেখেছিলে?

—তাই ত, বাগানে ত একটাও পাখী দেখিনি।

আবিদার মা বল্‌লে,—এখানে রাজসভায় দু'জন সর্ব্বজ্ঞ আছেন, তাঁদের মতেই সব হয়। তাঁরা বলেন,—পাখীর কি দরকার? হয় বধ, না হয় বন্ধন, এই দুইয়ের জন্য পাখীর সৃষ্টি। পাখীর ডাক বড় অশুভ, শেষ রাত্রিতে পাখীর ডাকের জ্বালায় কেউ ঘুমোতে পায় না এমন কি, কারুর সর্ব্বনাশ কামনা করলে তাকে বলে, তোর ভিটেয় ঘুঘু চরবে! সহরের ত্রিসীমায় পাখী নেই। ব্যাধরা সব রকম পাখী ধ'রে এনে সর্ব্বজ্ঞদের সাম্‌নে মেরে ফেলে। বন্ধ ক'রে রাখলে খাওয়াবার খরচ, আবার খাঁচার ভিতরও পাখী ডাকে। তোমরা খাঁচায় ক'রে পাখী এনেছ শুনতে পেলে আমাদের সুদ্ধ ধ'রে নিয়ে যাবে।

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—আমরা দু'দিন পরে চ'লে যাব। আমাদের একটা পাখী আছে, তোমরা না বল্‌লে কেউ টের পাবে না। খাঁচা ঢাকা থাক্‌লে পাখী ডাকে না। তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

আবিদার মা বল্‌লে,—শুধু পাখী নয়, তোমাদের সঙ্গে আবার একটা কুকুর। রাত্রিতে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকবে। আর কেউ

ঘুমুতে পারবে না। সকলে জিজ্ঞাসা করবে, কার কুকুর, তখন হৈ-হৈ হবে আর সব কথা বেরিয়ে পড়বে।

আবিদা বল্‌লে,—না, না, বেশ শান্ত কুকুর, এখানে এসে অবধি ডাকে নি।

রাজপুত্র বল্‌লেন,—কুকুরের জন্য তোমরা ভেব না। রাত্রিতে আমাদের ঘরে থাকবে, একবারও ডাকবে না।

রান্নাবান্না হ'লে পর তিন বন্ধু নিজের ঘরে খেলেন। আবিদা তাঁদের খাবার নিয়ে এল। তাঁদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তার আহ্লাদ কত! তাঁদের খাওয়া হ'লে আবিদা বল্‌লে,—তোমাদের পাখীটি একবার দেখাবে না? কত দিন যে পাখী দেখিনি! রাত্তিরে ডাকে না ত?

সদাগরপুত্র হেসে বল্‌লেন,—একি পেঁচা, যে রাত্রে ডাকবে? এ পাখী রাত্তিরে ডাকে না।

খাঁচার ঢাকা খুলে সদাগরপুত্র পাখী বের কল্লেন। বেশ বড় চন্দনা পাখী, মাথা টুকটুকে লাল, দুই দিকে ডানার পাশে লাল, ল্যাজ খুব লম্বা। তাকে হাতে বসিয়ে সদাগরপুত্র মুখের কাছে তুলে ধরলেন। রাত্তিরে পাখী ভাল দেখতে পায় না, তবু সদাগর-পুত্রের গালে মাথা বুলোতে লাগল।

আবিদা দুই হাত একত্র ক'রে নিশ্বাস টেনে বল্‌লে,—ও মা, কি সুন্দর পাখী! কেমন পোষ মেনেছে! আমি যদি ওর গায়ে হাত দি, তা হ'লে কি কাম্‌ড়াবে?

—দুষ্ট লোক না হ'লে কামড়ায় না। তুমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখ!

এই ব'লে সদাগরপুত্র পাখী সুদ্ধ হাত আবিদার দিকে বাড়িয়ে

দিলেন। আবিদা ভয়ে ভয়ে একটি আঙুলের আগা দিয়ে পাখীর মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগল, পাখী মাথা কাৎ ক'রে চোখ বুজে রইল।

সদাগরপুত্র বললেন,—কিছু ভয় নেই, এই নাও তোমার হাতে বসিয়ে দিচ্ছি।

আবিদার আঙুলে ব'সে তার হাতে চকচকে চুড়ী দেখে পাখী একবার ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকরে দেখলে। ক্রমে ভয় ভেঙে গেলে আবিদা পাখীকে মুখের কাছে তুলে ধরলে, সেও আবিদার গালে মাথা দিয়ে আরাম পেয়ে চুপ ক'রে রইল।

আবিদা বললে,—কি চমৎকার পাখী! আমার যদি এমন একটি পাখী থাকত!

সদাগরপুত্র বললেন,—এইটেই তুমি নাও না কেন? তোমাকে এই পাখী দিয়ে যাব।

—বাপ রে, এদেশে কি পাখী রাখবার যো আছে! একে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে আর হয় ত আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

আবিদা চ'লে গেলে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তিন বন্ধু অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন। তাদের শুতে অনেক রাত হ'ল।

—৩—

সকালবেলা মুখ-হাত ধুয়ে তিন বন্ধু কুকুর সঙ্গে ক'রে নগরে যাবেন। পাখী ঘরের ভিতর বন্ধ রইল। ঘরে তালা বন্ধ ক'রে মন্ত্রিপুত্র চাবি নিজের কাছে রাখলেন।

বাইরে যেতে সিঁড়ির কাছে দেখা হ'ল আবিদার মার সঙ্গে। সে জিজ্ঞাসা করলে,—তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

রাজপুত্র বললেন,—রাজসভায়।

—সেখানে কেন?

—রাজকন্যাকে কেউ হাসাতে পারেনি, দেখি আমরা পারি কি না।

আবিদা ও আবিদা! ব'লে তার মা চেঁচিয়ে উঠল।

আবিদা ছুটে এসে বললে,—কি হয়েছে মা?

—শুনেছিস কথা, এরা রাজকন্যাকে হাসাবার জন্য যেতে চাইছে! বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণ হারাবে।

আবিদার দুই চক্ষু জলে পূরে এল। সে কেঁদে বললে,—না, না, তা কিছুতেই হবে না। তোমরা আর যেখানেই যাও, রাজসভাতে কিছুতে যেতে পাবে না। বিদেশে তোমরা বেড়াতে এসেছ, না মিছিমিছি প্রাণ দিতে এসেছ?

রাজপুত্র বললেন,—আমরা বুঝে-সুঝে এ-কাজ করছি,তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? যে কাজ কেউ পারে না, আমরা তা পারি। রাজকন্যাকে কেউ যদি হাসাতে পারে ত আমরা পারব।

আবিদা তাদের কিছুতেই যেতে দেবে না। বললে,—তোমরা এখানে মোটে এক দিন এসেছ, তবু আমাদের মনে হচ্ছে, যেন কত দিন থেকে তোমাদের জানি। এই ত পাঁচ জনের আজ মাথা কাটা যাবে। তোমাদের এই অল্প বয়স, রাজকন্যাকে তোমরা কখন চোখে দেখনি, সে তোমাদের কোথাকার কে, যে তার জন্যে তোমরা প্রাণ দেবে?

মন্ত্রিপুত্র বললেন,—তোমরা মায়ে-ঝিয়ে যে আমাদের কুশল কামনা কর, সেটা আমাদের সৌভাগ্য মনে করি। কিন্তু আমরা

গোঁয়ারের মত কিছু করচি নে। রাজকন্যাকে আমরা দেখি নি আর আমাদের কোন লোভও নেই। আমরা শুধু দেখাতে চাই যে, রাজকন্যাকে হাসান কিছুই শক্ত কাজ নয়। আর এই যে পাঁচ জনের মাথা কাটা যাবে, এদেরও আমরা রক্ষা করব। আমরা ঠিক জানি, এ-কাজ পারব।

আবিদা ও তার মা কিছুতেই তাদের থামাতে পার্‌লে না। শেষে আবিদা বল্‌লে,—তোমরা কি তিনজনে মিলে রাজকন্যাকে হাসাবার চেষ্টা করবে?

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—না, আমি একা, এঁরা দুজন কিছু করবেন না।

আবিদার চোখের জল আরও উথলে উঠ্‌ল। বল্‌লে,—কেন, তুমি কেন?

—হাসাবার কৌশল আমি জানি ব'লে। বল ত তোমাকে এখনি হাসাতে পারি।

রাগ দুঃখ ক'রে আবিদা চ'লে গেল।

তিন বন্ধু তখন হাসতে হাসতে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তা সোজা রাজবাড়ী চ'লে গিয়েছে। সিংদরজায় খাপখোলা তলওয়ার-হাতে প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজার পাশে প্রকাণ্ড ডঙ্কা, তার পাশে দেওয়ালে ডঙ্কার কাঠি ঝোলান। সদাগরপুত্র প্রহরীকে কিছু অবজ্ঞার স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ ট্যামটেমিটা কিসের জন্য?

সেপাই মশায় ভারি গরম! কোথাকার উজবুগ আনাড়ী মূর্খলোক, জয়ঢাককে বলে কিনা ট্যামটেমি! দুই চক্ষু লাল ক'রে বল্‌লে,—তোমরা কোন্ দেশের লোক হে, রাজডঙ্কা চেন না? যারা রাজকন্যাকে হাসাতে চায় তারা এই ঢাকে কাঠি দেয়। তোমার

মত পাঁচ জন এই ঢাক বাজিয়ে আজ চাঁড়ালের হাতে যাবে। পাঁচটা কাঁচা মাথা আজ কাটা যাবে।

—বটে? ব'লে সদাগরপুত্র কাঠি পেড়ে ডঙ্কায় সজোরে তিন ঘা বসিয়ে দিলেন। সে-শব্দে রাজবাড়ী, হাট-বাজার কেঁপে উঠল।

প্রহরী বল্লে,—ডঙ্কায় এক ঘা দেবার কথা, তুমি যে বড় তিনবার বাজালে? তোমার কি তিনটে মাথা আছে?

—না হয় আমার মাথা তিনবার ক'রে কাটবে।

রাজসভা থেকে আর চার পাঁচ জন প্রহরী ছুটে এল। বল্লে,—ডঙ্কা এতবার বাজায় কে?

দরজার প্রহরী সদাগরপুত্রকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে,—এই কোথাকার একটা পাড়াগেঁয়ে লোক আমাকে কোন কথা না বলেই তিনবার ডঙ্কা বাজিয়েছে।

সদাগরপুত্র নেহাত ভাল মানুষের মত বললে,—আমরা তিন বন্ধু কি না, তাই তিন ঘা!

—চল রাজার হুজুরে।

—সেই জন্যেই ত আমরা এসেছি।

—তোমাদের সঙ্গে আবার একটা কুকুর দেখছি। রাজসভায় কুকুর নিয়ে যাবার হুকুম নেই।

—আমরা যেখানে যাই, আমাদের কুকুরও সেখানে যায়। একটা কুকুর সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিল, জান? আমাদের কুকুর রাজদরবারে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

—কী, আমাদের সঙ্গে তামাসা?

—অত সাহস আমাদের হয়নি। কিন্তু কুকুর সঙ্গে না থাকলে আমরা রাজকন্যাকে হাসাতে পার্‌ব না। এ ত আর যে সে কুকুর নয়।

একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করতে ভিতরে গেল, ফিরে এসে বললে,—সবসুদ্ধ যাবার হুকুম।

সামনে পিছনে প্রহরী, মাঝখানে তিনবন্ধু, তাঁদের পাশে কুকুর। রাজসভায় সিংহাসনে রাজা ব'সে আছেন, চারদিকে অমাত্য, সভাসদ, সিংহাসনের সামনে ব'সে দুই সর্ব্বজ্ঞ। এক জনের হাড়-পাঁজরা গোণা যায়, আর একজন ভরা তেলের কুপোর মত, একজন কাণা, এক চক্ষু নেই, আর একজন টেরা। দু'জনেই কিন্তু বেজায় গম্ভীর।

তিন বন্ধু রাজাকে অভিবাদন ক'রে সভায় বসলেন। কুকুর তাদের পাশে বসল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা কে, এখানে কি জন্য আসা?

রাজপুত্র বললেন,—আমরা বিদেশী। কেন এসেছি, তা ডঙ্কা বাজিয়ে জানিয়েছি।

—যে কাজ করতে চাও, তার পণ জান?

—জানি। আমাদের পণ প্রাণ, রাজার পক্ষে কি?

—অর্দ্ধেক রাজত্ব আর আমার কন্যা দিতে স্বীকৃত আছি।

—আর এক কথা আছে। আমরা শুনলাম, পণে পরাজিত হয়েছে ব'লে আজ পাঁচ জনের প্রাণদণ্ড হবে। এ আদেশ তিন দিন স্থগিত রাখতে হবে।

প্রথম সর্ব্বজ্ঞ হাত নেড়ে বললেন,—তোমরা মনে কর, তোমাদের শুধু ধড় আছে, মাথাটা নেই।

রাজা বললেন,—তোমরা নিজের কথা বল, যাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে, তাদের কথা কেন?

রাজপুত্র বললেন,—প্রথম কারণ, এ সময়ে রক্তপাত করলে রাজকন্যার অকল্যাণ হবে, দ্বিতীয় কারণ, রাজকন্যার জন্য আমরা

গোপনে যে মন্ত্র সাধন করব, তার বিঘ্ন হবে, তৃতীয় কারণ, আপনার প্রধান উদ্দেশ্য আপনার কন্যার নীরোগতা লাভ, নিরপরাধের প্রাণহত্যা নয়, রাজকন্যাকে যদি আমরা না হাসাতে পারি, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে ঐ পাঁচজনের প্রাণদণ্ড হবে।

সভাস্থ লোকেরা বল্‌তে লাগল,—একথা যুক্তিযুক্ত।

রাজা বল্‌লেন,—তোমরা ক'দিন সময় চাও?

—তিন দিন। তিন দিনের দিন সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর পরে আমরা নগরবাসী সকলের সমক্ষে রাজকন্যাকে হাসাব। না পারি, সেই দিনই আমাদের প্রাণদণ্ড হবে।

রাজা বল্‌লেন,—তাই হবে।

—আর এক নিবেদন। আমাদের তিন জনের মধ্যে যিনি রাজকন্যাকে হাসাবেন, তিনি পরীক্ষার পূর্ব্বে এখন একবার রাজকন্যাকে দেখতে চান।

—কে তিনি?

রাজপুত্র সদাগরপুত্রকে দেখিয়ে দিলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—এইখানে দেখতে চান?

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—না মহারাজ, এত লোকের সাক্ষাতে নয়, শুধু আপনার কিম্বা আর কারও সাক্ষাতে।

রাজা আদেশ কর্‌লেন,—প্রতিহারী, এঁকে রাজকন্যার মহলে নিয়ে যাও। সখীর সাক্ষাতে কিংবা ধাত্রীর সাক্ষাতে ইনি একবার রাজকন্যাকে দেখ্‌তে চান।

প্রতিহারী সদাগরপুত্রকে সঙ্গে ক'রে রাজকন্যার মহলে নিয়ে গেল। সেখানে সকলেই বিমর্ষ, সকলেই মুখ চূণ ক'রে আছে। বুড়ী ধাত্রী বসেছিল, তার কাছে রাজকন্যার দুইজন সখী। প্রতিহারী বল্‌লে,

—মহারাজের আদেশ, এঁকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাও। ইনি রাজকন্যাকে একবার দেখ্‌তে চান।

একজন সখী জিজ্ঞাসা করলে,—কেন ?

—ইনি রাজকন্যাকে হাসাবেন।

সখী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সদাগরপুত্রকে বল্‌লে,—কেন এই বয়সে তুমি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে এসেছ ?

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—রাজকন্যার মুখের হাসির জন্য তুমি কি প্রাণ দিতে পার না ?

—এখনি। রাজকন্যা আমার সখী, তাঁকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। তুমি বিদেশী, বাপ-মা'র আদরের ছেলে, হয়ত বিয়ে করেছ, তুমি কেন প্রাণ দিতে গেলে ?

—আমি বিয়ে করিনি, পরের জন্য প্রাণ দিলে জীবন সার্থক হয়, আর তোমাকে সত্যি বলছি, তোমার সখীর মুখে হাসি তোমরা দেখতে পাবে। আমার দৈব ক্ষমতা আছে, যারা রাজকন্যাকে হাসাতে পারেনি, তাদের তা নেই। এখন আমাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে চল।

সদাগরপুত্র রাজকন্যার সখীর সঙ্গে গিয়ে দেখ্‌লেন, একটি ঘরের ভিতর মহামূল্য আসনে রাজকন্যা ব'সে রয়েছেন। শৈবালাচ্ছন্ন কমলিনীর ন্যায় তাঁর রূপ ম্লান, মুখে বিষাদের ছায়া, চক্ষুর জ্যোতি নিভে গেছে। সখীর সঙ্গে সদাগরপুত্রকে প্রবেশ করতে দেখে একটি কথাও কইলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

সদাগরপুত্র সখীকে বল্‌লেন,—তুমি দরজার কাছে দাঁড়াও, আর কেউ যেন এ ঘরে না আসে। রাজকন্যাকে কিছুক্ষণ দেখলে আমি বুঝতে পারব, ওঁর কি হয়েছে। আমরা তিন বন্ধু যে প্রাণপণ করেছি,

সেজন্য কিছু বল্‌ছিনে, তবে তোমার সখী যদি ভাল হয়ে ওঠেন, তা হ'লে তোমাদেরও আহ্লাদ হবে।

রাজকন্যার সখী দরজাগোড়ায় গিয়ে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে র'ইল। সদাগরপুত্র রাজকন্যার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—রাজকন্যে, আমার দিকে তাকাও।

রাজকন্যা মুখ তুলে চাইলেন। সদাগরপুত্র স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বার কয়েক অঙ্গুলি চালনা কর্‌লেন। রাজকন্যার দৃষ্টি স্থির হ'ল। সদাগরপুত্র মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেন,—রাজকন্যে!

রাজকন্যা ঠিক সেইরকম কণ্ঠে বল্‌লেন,—কি?

—তুমি আমার কথা শুন্‌বে?

—শুন্‌ব।

—উঠে দাঁড়াও।

রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালেন।

—তুমি হাসতে পার?

—তুমি বল্‌লে পারি।

—তবে হাস। জোরে নয়, কোন শব্দ হবে না, মুচ্‌কে একটু হাস।

মেঘের আড়াল থেকে একটু ফাঁক পেলে চন্দ্র যেমন হেসে উঁকি মারে, সেই রকম রাজকন্যার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি উঁকি মেরে গেল। সদাগরপুত্র রাজকন্যার সখীকে ডাক্‌লেন। সে এসে দেখলে, রাজকন্যার মুখে হাসি নাই বটে, কিন্তু একটা উজ্জল প্রফুল্ল আভা রয়েছে। সে এসেই রাজকন্যার গলা জড়িয়ে বল্‌লে,—এমনতর ত অনেকদিন দেখিনি, তবে বুঝি সখী আমাদের আবার ভাল হয়ে উঠবেন!

সদাগরপুত্র আবার দুই চারবার রাজকন্যার মুখের সম্মুখে অঙ্গুলি চালনা করলেন। রাজকন্যার আগে যেমন বিষণ্ণ মুখ ছিল, সেই রকম হয়ে গেল। সদাগরপুত্র বললেন,—এখন কাউকে কিছু ব'লো না, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, রাজকন্যা সেরে উঠবেন।

রাজসভায় ফিরে এসে সদাগরপুত্র দুই বন্ধুর সঙ্গে উঠে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে চারজন প্রহরী গেল। সরাইয়ের দরজায় পাহারা বসল।

৪

আজ পরীক্ষার দিন। রাজসভায় লোকে লোকারণ্য। তিন বন্ধুর পক্ষ থেকে রাজপুত্র রাজাকে বলেছিলেন,—পরীক্ষা সকলের সামনে হবে, প্রহরীরা যেন কাউকে নিষেধ না করে। যে পাঁচ জন বিদেশীর প্রাণদণ্ড হয়েছিল, তারাও রাজপুত্রের অনুরোধে রাজসভায় আসবার অনুমতি পেলে। আবিদা ও তার মাও এল। রাজা যেমন সিংহাসনে বসতেন, সেই রকম বসলেন, সর্ব্বজ্ঞ দুজনে যেখানে বসতেন, সেইখানে ব'সে বলতে লাগলেন,—আজ এদেরও মাথা কাটা যাবে। সিংহাসনের সামনে কিছু দূরে একটা উঁচু জায়গায় রাজকন্যার আসন, যাতে তাঁকে সকলে দেখতে পায়। তাঁর দুই পাশে দু'জন সখী। সদাগরপুত্র একটা মস্ত ঝলঝলে চোগার মত গায়ে দিয়ে তাঁর সামনে বসেছেন, কুকুর তাঁর পিছনে ব'সে। রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র আরও পিছনে একটু দূরে বসেছেন। চারদিকে নগরের নরনারী স্থির হয়ে ব'সে দেখছে,—কারুর মুখে একটি কথা নেই।

সদাগরপুত্র বড় গলা ক'রে সকলকে শুনিয়ে রাজাকে বললেন,—রাজকন্যাকে ভাল করতে পারা-না-পারা আমার দায়, আমার দুই বন্ধুর এতে কোন সংস্রব নেই।

রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র বল্‌লেন,—তা কেন? আমাদের সকলের সমান দায়।

সর্ব্বজ্ঞ দু'জন মাথা নেড়ে বল্‌লেন,—অবিশ্যি, অবিশ্যি! তিন জনেরই মাথা কাটা যাবে।

রাজা বললেন,—যে রাজকন্যাকে হাসাতে স্বীকার করেছে, পুরস্কার কিম্বা দণ্ড শুধু তার প্রাপ্য, তার সঙ্গে অপর লোক থাক্‌লে তাদের লাভ কিম্বা শাস্তি হ'তে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞরা বল্‌লেন,—সে কি রকম কথা? এক-যাত্রায় পৃথক্ ফল?

সদাগরপুত্র আবার সকলকে শুনিয়ে বল্‌লেন,—রোগ কি জানতে পার্‌লে ব্যবস্থা করা সহজ হয়। রাজকন্যার কি হয়েছে কেউ জানে?

প্রথম সর্ব্বজ্ঞ বল্‌লেন,—অপদেবতার কাণ্ড! তা আমি বেশ জানি। দ্বিতীয় বল্‌লেন,—আসল রোগ তাই। অ'াদেবতার সঙ্গে কে পার্‌বে!

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—কেন, আপনারা অত মন্ত্রতন্ত্র জানেন, অপদেবতার শান্তি করতে পারেন না?

সর্ব্বজ্ঞরা কানে হাত দিয়ে বল্‌লেন,—শুনলে ধৃষ্টের কথা! অপদেবতার সঙ্গে তুল্যবল হ'তে চায়! তা মরণের আগেই পিপীলিকার পাখা ওঠে বটে!

সদাগরপুত্র রাজাকে বল্‌লেন,—রাজকন্যার কি হয়েছে, তিনি এখনি নিজের মুখে বলবেন। তার পর আমি রোগের প্রতিবিধান কর্‌ব। রাজকন্যার মুখে আজ সকলে হাসি দেখিতে পাবেন।

রাজা বল্‌লেন,—রাজকন্যা ত কারুর সঙ্গে কথাই ক'ন না।

সর্ব্বজ্ঞরা বল্‌লেন,—ও দাম্ভিকটার কথা শোনেন কেন? ওর সব বিদ্যা এখনি জানা যাবে।

সদাগরপুত্র রাজকন্যার চক্ষুর দিকে চেয়ে অঙ্গুলি চালনা করতে লাগলেন। সর্ব্বজ্ঞরা চেঁচিয়ে উঠলেন,—ওকি ও! অঙ্গুলি বা হস্ত চালনা কি রকম?

সদাগরপুত্র রাজাকে বল্লেন,—এ সময় যদি কেউ গোল করে কিম্বা আমাকে বাধা দেয়, তা হ'লে আমার চেষ্টা বৃথা হবে।

রাজা চোখ পাকিয়ে সর্ব্বজ্ঞদের বল্লেন,—চুপ ক'রে থাক!

রাজকন্যার দৃষ্টি স্থির হয়েছে দেখে সদাগরপুত্র বল্লেন,—রাজকন্যে, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিতে পারবে?

—পারব।

—তোমার কি অপদেবতার দৃষ্টি লেগেছে?

—না।

—তবে তুমি কথা কও না কেন, হাস না কেন?

—যে দেশে পাখী ডাকে না, সেখানে সব নিরানন্দ, কিসে আমার হাসি আসবে?

—এ-দেশ থেকে কারা পাখী বিদায় ক'রে দিয়েছে?

—ওই সর্ব্বজ্ঞ দু-জন। ওরা বলে, বধ আর বন্ধন ছাড়া পাখীর আর কোন দরকার নাই।

—পাখী দেখলে তোমার আনন্দ হয়?

—কার না হয়?

—তুমি একটা পাখী পেলে কি কর?

—পুষি আর তাকে পড়াতে শেখাই।

সদাগরপুত্র রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—রাজবাড়ীতে পাখী নেই? রাজার মুখ শুকিয়ে গেল, বল্লেন,—কই, এখানে ত কোথাও পাখী নেই।

—আমি যদি একটি পাখী আন্‌তে পারি?

—তা হ'লে হয় ত রাজকন্যা খুসী হবেন।

হঠাৎ কোথা থেকে কে বল্‌লে,—সর্ব্বজ্ঞ বিট্‌লে!

সর্ব্বজ্ঞ দু'জন চ'টে উঠে বল্‌লেন,—শুনেছেন, মহারাজ, আমাদের গাল দিচ্ছে।

রাজা বল্‌লেন,—কে দিচ্ছে, দেখিয়ে দাও।

—এইখানে কোথাও হরবোলা আছে।

আবার কে বল্‌লে,—চুপ বিট্‌লে!

চারিদিকে সকলে চেয়ে দেখে, কে যে কথা কইচে, কিছুই বুঝতে পারা যায় না। তখন সদাগরপুত্র কাপড়ের ভিতর থেকে সোনার দাঁড়ে বসান পাখী বের করলেন। রাজকন্যা হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন,—দেখি, দেখি! আমার হাতে দাও!

পাখী বল্‌লে,—রাজকন্যে, হাস দেখি!

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—রাজকন্যে, তুমি হাসলে এই পাখী পাবে।

গোলাপফুল যেমন ফোটে, সেই রকম রাজকন্যার রাঙা ঠোঁটে হাসি ফুট্‌ল। তার পর তিনি খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর মুখে আনন্দের আলো ফুটে উঠ্‌ল, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থেকে আনন্দের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'ল। রাজার কানে, রাজার প্রাণে, যেন অমৃতবৃষ্টি হ'ল, সখী দুইজনের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হ'ল, সভাশুদ্ধ লোকের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কেবল সর্ব্বজ্ঞ দুই জনের মুখ কালিমায় ঢেকে গেল।

সদাগরপুত্র দাঁড়সুদ্ধ পাখী রাজকন্যার হাতে দিলেন। পাখী অনর্গল কথা কইতে লাগল।

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—রাজকন্যে, এখন এদেশে কি করা উচিত?

—পাখীর বধ-বন্ধন নিবারণ হবে। মুক্ত পাখী সর্ব্বত্র উড়ে গান গেয়ে বেড়াবে, নিরানন্দ রাজ্য আনন্দপূর্ণ হবে!

—আর কি ?

—সর্ব্বজ্ঞ দু'জনের মাথা মুড়িয়ে একজনের গলায় একটা মরা কাক, আর একজনের গলায় একটা মরা বাদুড় ঝুলিয়ে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেবে।

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজকন্যার হাত ধ'রে তুললেন। সদাগরপুত্রকে বল্‌লেন,—এই কন্যা আর অর্দ্ধেক রাজ্য তোমার।

—না মহারাজ, রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজ্য রাজপুত্রের প্রাপ্য।

—রাজপুত্র কোথায় ? তুমি কি রাজপুত্র ?

—রাজপুত্র আপনার সম্মুখে।

রাজপুত্র উঠে এলেন। কুকুর এসে রাজকন্যার কাছে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

রাজকন্যা বল্‌লেন,—আমি এই কুকুরটাও নেব।

সদাগরপুত্র বল্‌লেন,—এ কুকুর, আর যার কুকুর দু-ই তোমার।

রাজপুত্রের দিকে চেয়ে রাজকন্যা মাথা হেঁট করলেন।

ক'দিন পরেই রাজবাড়ীতে বিয়ের বাদ্য বেজে উঠল। সর্ব্বজ্ঞ দু'জনের মাথা মুড়িয়ে গলায় মরা কাক আর বাদুড় ঝুলিয়ে কুলো পিটিয়ে রাজ্য থেকে বের ক'রে দেওয়া হ'ল।

পণ্ডিতের পরাজয়

(থিউয়েন স্যাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অবলম্বনে)

পুরাকালে দাক্ষিণাত্যে কর্ণসুবর্ণ নামে সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। রাজধানীরও ঐ নাম। নগরে অনেক ধনীর বাস, অনেকে বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মলয় পর্ব্বত হইতে চন্দন, খনি হইতে সুবর্ণ ও হীরক পাওয়া যাইত। নানা জাতীয় উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এইরূপে বিবিধ উপায়ে নগরবাসিগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

পূর্ব্বে কর্ণসুবর্ণ নগরে অনেক পণ্ডিত বাস করিতেন। বিচার-সভায় সর্ব্বদা দেশবিদেশ হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া বিচার করিতেন; ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যে, যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের সংঘর্ষে বিচার-সভা মুখরিত হইয়া উঠিত। কোন পণ্ডিতের জয় হইলে জয়! জয়! শব্দে সভা ধ্বনিত হইত ও তাহার পর জয়শীল পণ্ডিতকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগর পরিভ্রমণ করান হইত; জয়ধ্বনিতে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। অবশেষে রাজা তাঁহাকে বহুবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন দিতেন।

কয়েক বৎসর হইতে সেরূপ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। নগরের পণ্ডিতেরা অনেকে কাশীবাসী হইয়াছেন, কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভিক্ষু হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিহারে বাস করিতেছেন। দেশান্তর হইতে পণ্ডিতেরাও আর বড়-একটা আসেন না। বিস্তীর্ণ

বিচারসভা শূন্য পড়িয়া আছে, বৃহৎ প্রবেশদ্বারে ঢাকে কেহ আঘাত করে না, শাস্ত্র-বিচারের সংবাদ নগরে আর ঘোষিত হয় না।

এমন সময় সংবাদ আসিল, একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত নগরের অভিমুখে আসিতেছেন, বিচার করিবেন। নগরবাসীরা উদ্‌গ্রীব হইয়া পণ্ডিতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল, এমন পণ্ডিত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, পাণ্ডিত্যে যেমন অদ্বিতীয়, বিচারে তেমনি সূক্ষ্ম-যুক্তি। ইঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত কোথায় পাওয়া যাইবে? সর্ব্বত্র এই জল্পনা হইতে লাগিল। রাজসভায় বড় পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। রাজ-পণ্ডিত বৃদ্ধ, পুরুষানুক্রমে এই পদে অধিষ্ঠিত, পাণ্ডিত্যের কোন অভিমান ছিল না।

পণ্ডিত যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল যে, এমন পণ্ডিত কেহ কখন দেখে নাই। ঐন্দ্রজালিকের বিচিত্র বিদ্যা দেখিবার জন্য যেমন জনতা হয়, পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য সেইরূপ লোক-সমাগম হইল। এমন পণ্ডিত কে কোথায় দেখিয়াছে? পণ্ডিতের সমুন্নত বিশাল দেহ, যেমন দীর্ঘ সেইরূপ স্থূল, বর্ণ শ্যাম, বৃহৎ মুখমণ্ডল শ্মশ্রুকেশে শোভিত, চক্ষের দৃষ্টি দাম্ভিকতাপূর্ণ। পণ্ডিতের হস্তে দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড, প্রকাণ্ড উদর তাম্রনির্ম্মিত বর্ম্মে আবৃত, মস্তকের উপর উষ্ণীষ, তাহার উপর তাম্রাধারে মশাল জ্বলিতেছে! পণ্ডিত ধীর, গম্ভীর, দীর্ঘপদক্ষেপে শনৈঃ শনৈঃ বিচার-সভার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, ঢাকের কাঠি তুলিয়া তিন বার আঘাত করিলেন। নগরবাসীর শ্রবণে সে শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইল। অতঃপর পণ্ডিত সেইরূপ গজেন্দ্র-গমনে পান্থনিবাসে প্রবেশ করিলেন।

রাজার নিকট সংবাদ গেল, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচার করিবার নিমিত্ত নগরে আগমন করিয়াছেন। বিচার-সভার দ্বারে ডঙ্কা বাজাইয়া

তিনি অপর পণ্ডিতবর্গকে বিচারক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। রাজা ব্যস্ত হইয়া রাজপণ্ডিতকে ডাকাইলেন; কহিলেন,—এই যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছেন, ইঁহার সহিত কে শাস্ত্রবিচার করিবে?

রাজপণ্ডিত কহিলেন,—মহারাজ, নগরে ত বড় শাস্ত্রীয় পণ্ডিত কেহ নাই, বিচারের ত কোন সম্ভাবনা দেখি না।

রাজা কহিলেন,—কি লজ্জার কথা! নগরে বড় বড় শ্রেষ্ঠীর অভাব নাই, কিন্তু একজনও ভাল পণ্ডিত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! এই একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন, ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই! দেশের পক্ষে, নগরের পক্ষে কি কলঙ্ক! আমারও মাথা হেঁট হইবে।

রাজা চারিদিকে দূত পাঠাইলেন, চরেরা সর্ব্বত্র খুঁজিতে লাগিল, কোথাও উত্তম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যায় কি না। অবশেষে একজন আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিল,—মহারাজ, অনেক দূরে অরণ্যের মধ্যে একজন শ্রমণ আছেন, বয়স অধিক নয়, কিন্তু শুনিলাম, তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত! তিনি লোকালয়ে আসিতে স্বীকার করেন না।

রাজা কহিলেন,—আমি স্বয়ং যাইব। তাঁহাকে আনিতেই হইবে, নহিলে আমার মুখ দেখান ভার হইবে।

রাজা লোকজন সঙ্গে লইয়া অরণ্যে শ্রমণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন,—আপনাকে কৃপা করিয়া আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, নচেৎ লোকলজ্জা নিবারণের উপায় নাই।

শ্রমণ কহিলেন,—মহারাজ, বনবাসী হইলেও আমি আপনার রাজ্যে বাস করি, সুতরাং আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কিন্তু আমি তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থী, প্রথিতনামা পণ্ডিতের সমকক্ষ নহি।

রাজা কহিলেন,—সে বিচারভার আমার উপর রহিল। যথার্থ পাণ্ডিত্যের প্রধান লক্ষণ বিনয়, আপনাতে তাহা বর্ত্তমান।

শ্রমণ কহিলেন,—মহারাজ! আপনার নিকট একটি প্রার্থনা আছে।

—আপনি বলিবার পূর্ব্বেই তাহা পূর্ণ হইল।

—যদি ভগবান্ বুদ্ধদেবের কৃপায় বিচারে আমি পরাজিত না হই, তাহা হইলে কর্ণসুবর্ণ নগরের বাহিরে ভিক্ষু-শ্রমণের বাসের উপযোগী একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

—আমি সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। ধর্ম্মযাজকদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইব।

শ্রমণ দ্বিরুক্তি না করিয়া মহারাজার সঙ্গে নগরে আগমন করিলেন।

ওদিকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রতিদিন একবার করিয়া বিচারসভার সম্মুখে ডঙ্কা মারিয়া যান। আর বলেন, এ দেশের এত নাম, কিন্তু এমন একজন পণ্ডিত নাই যে, আমার সঙ্গে বিচার করিতে সাহস করে। সপ্তম দিবসে যখন ঢাকে ঘা মারিলেন, সেই সময় রাজপণ্ডিত সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন,—প্রাতঃপ্রণাম!

পণ্ডিত তাঁহার প্রতি অবহেলাসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—প্রণাম। আপনি কে?

—আমি রাজসভায় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত। পদ আছে বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্য কিছুমাত্র নাই।

—তাহা ত দেখিতেই পাইতেছি। সপ্তাহকাল প্রতিদিন আমি এখানে পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করিতেছি, আজ পর্য্যন্ত কাহারো দেখা নাই।

—এ অনুযোগ আপনি করিতে পারেন। এখন আপনি নিশ্চিন্ত

হইতে পারেন, কাল সূর্য্যোদয়ের পর এই বিচারসভায় শাস্ত্রার্থ বিচার হইবে। আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

পণ্ডিত বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন,—কে বিচার করিবে? আপনি?

—মহাভারত! আমি ত বলিয়াছি যে, আমার ঘটে কিছু নাই। সাপ নামে মাত্র—ঢোঁড়া, ফণাও নাই, বিষও নাই।

—বটে, বটে! পণ্ডিতকে আপনি সর্পজাতি বিবেচনা করেন?

—উপমা ভাল হইল না? না হইবারই কথা। এখন প্রণাম করিয়া আমি বিদায় হই, সভার আয়োজন ও নগরে ঘোষণা করিতে হইবে।

—যিনি বিচার করিবেন,—তিনি কে?

—সভায় তাঁহার পরিচয় পাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখি নাই।

রাজপণ্ডিত চলিয়া গেলেন। পণ্ডিতও অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত, ধীরপদবিক্ষেপে নিজস্থানে গমন করিলেন।

সমস্ত দিন বিচার-সভা সজ্জিত ও সংস্কৃত হইল। রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গের নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চে স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। পণ্ডিত-দিগের জন্য সভার মধ্যস্থলে বেদী নির্ম্মিত হইল, যাহাতে সভাস্থ সকলে সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পায়। দ্বার ও তোরণ পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইল। বন্দিগণ নগরের সর্ব্বত্র বিচারের স্থান ও নির্দ্ধারিত সময় ঘোষণা করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া কৌতুকপ্রিয় নাগরিকগণ রহস্য করিতে লাগিল।

একজন বলিল,—এমন পণ্ডিত কেহ কখন দেখিয়াছে? মানুষ ত নয়, যেন একটা দৈত্য!

—মাথায় কি উটি?

—দেউটি। সাপের মাথায় মাণিক থাকে না? অশ্বত্থামার মাথায় মাণিক ছিল, ইঁহার মাথায় মশাল।

—পণ্ডিতের বুদ্ধি হারাইয়াছে, তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায়।

—বিচারের গোলকধাঁধায় পড়িলে পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে।

—আর পেটে কি বাঁধা?

—ওটা পাঁচিল গাঁথা। লম্বোদর যদি বাড়িতে বাড়িতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে? দুর্গের যেমন প্রাচীর, উহাও তেমনি উদরের প্রাচীর।

পর দিবস প্রত্যূষ হইতেই নগরবাসীরা সভায় ছুটিল। রাজ-বাটীর কর্ম্মচারীরা সকলকে বসাইয়া দিল। সভার ভিতর যখন আর স্থান রহিল না লোকেরা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রীলোকেরা এমন স্থানে কখন আসে না, আজ তাহারা পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রথে অশ্বারোহণে রাজবংশীয়েরা ও শ্রেষ্ঠিগণ আসিতে লাগিলেন। সভাদ্বারে তূর্য্যধ্বনি হইল—রাজা আসিতেছেন। কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত রাণীও আসিয়াছেন। সভা পরিপূর্ণ, সকলের দৃষ্টি দ্বারদেশে, সকলে পণ্ডিতদ্বয়ের আগমন অপেক্ষা করিতেছে।

পথে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা দেখিল, মহাকায় মাতঙ্গের মত রাজপথের মধ্যস্থল দিয়া পণ্ডিত আসিতেছেন। হস্তে দণ্ডকাষ্ঠ, মস্তকে মশাল, উদরে বর্ম্ম। সাটোপ পদক্ষেপ, চারিদিকে গর্ব্বিত দৃষ্টি। থাকিয়া থাকিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছেন, সোঽহং! তত্ত্বমসি! সভা-দ্বারে উপনীত হইলে আবার তূর্য্যধ্বনি হইল। রাজপণ্ডিত, রাজ-কর্ম্মচারিগণ সসম্ভ্রমে পণ্ডিতকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করাইলেন।

সকলের শেষে শ্রমণ আসিলেন। মধ্যাকৃতি, শীর্ণ দেহ, উজ্জ্বল কান্তি, মুণ্ডিত কেশ, মুণ্ডিতমুখ, অঙ্গে ভিক্ষুর পীত কাষায় বসন। পথের এক পার্শ্ব দিয়া অবনত মস্তকে, কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া

অতিশয় সঙ্কোচের সহিত আগমন করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে কহিতেছিলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি! দ্বারের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া তৃতীয় বার তূর্য্যনাদ হইল। তাঁহাকেও সসম্মানে বেদীর উপর যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল।

রাজা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—পণ্ডিতেরা উপস্থিত, সভাও পরিপূর্ণ, এইবার বিচার আরম্ভ হউক।

রাজপণ্ডিত প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত দুইজনের সম্মুখে গিয়া কহিলেন,—সভাস্থ লোকদিগের অবগতির জন্য আপনাদের পরিচয় আমাকে দিতে হইবে।

পণ্ডিত কহিলেন,—আমি নিজেই দিতেছি। এই বলিয়া উন্নত মস্তক আরও উন্নত করিয়া, সভাস্থল ধ্বনিত করিয়া কহিলেন,—আমার নাম দীপঙ্কর পণ্ডিত। এরূপ নাম কেন? আমি মস্তকে দীপ ধারণ করি বলিয়া। কেন মস্তকে দীপ ধারণ করি? এই জগতে লোক অজ্ঞানান্ধকারে পথহারা হইয়া ঘুরিতেছে,—তাহাদের প্রতি অহেতুকী কৃপাপরবশ হইয়া, তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছি। উদরে কেন বর্ম্মধারণ করিয়াছি? আমার পেটে এত বিদ্যা, এত জ্ঞান যে, পাছে পেট ফাটিয়া যায় এই আশঙ্কায় আমি কঠিন তাম্রফলক দ্বারা সর্ব্বদা পেট বাঁধিয়া রাখি। আমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, অনেক দেশে অনেক পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করিয়াছি। এ দেশে যে আমার যশ প্রথিত হয় নাই তাহার কারণ এ দেশে পণ্ডিতের অভাব। এক সপ্তাহ আমি নিত্য ডঙ্কা দিয়া বিচার আহ্বান করিতেছি, এতদিন কোন সংবাদ পাই নাই। এখন এই সভাস্থলে আমার সহিত শাস্ত্রবিচার করিবার উপযুক্ত পণ্ডিত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

পণ্ডিত ক্ষান্ত হইলেন। শ্রমণ রাজপণ্ডিতকে কহিলেন,—আমার পরিচয় দিবার কিছুই নাই, আমি সামান্য বিদ্যার্থী মাত্র। কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেবের কৃপায় আমি বিচার করিতে প্রস্তুত।

এই কয়েকটি কথা রাজপণ্ডিত সকলকে শুনাইয়া বলিলেন। সভাস্থ সকলে শ্রমণের বিনয়ে প্রীত হইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিত দীপঙ্কর শাস্ত্রোক্ত নানা মতের উল্লেখ করিলেন। জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র অথবা অভিন্ন, মায়া কাহাকে বলে, বীজ হইতে বৃক্ষ অথবা বৃক্ষ হইতে বীজ, বহ্নি হইতে ধূম অথবা ধূম হইতে বহ্নি, ভ্রান্তির স্বরূপ কি, রজ্জুতে অহিভ্রম, হস্তামলক, স্থূল সূক্ষ্ম, ঈশ্বর সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ, অনুলোম ও বিলোম, সাকার ও নিরাকার, কুণ্ডলিনী ও পিঙ্গলা, ধারণা ধ্যান, বদ্ধ ও মুক্ত, স্বর্গ নরক ও সপ্তলোক এই নানা মতের অবতারণা করিলেন। শ্লোক ও শব্দের সংখ্যা ত্রিশ সহস্র।

পণ্ডিতের কথায় সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে অভিভূত হইল, কিন্তু তিনি যে কি প্রতিপাদন করিতেছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। শ্রমণ মধুর, মুক্ত কণ্ঠে, স্বল্প কথায় যুক্তিপূর্ণ বাক্যবিন্যাসে পণ্ডিতের শব্দজাল ছেদন করিলেন। কহিলেন, সত্য এক, মত বহু। নানা গুরুর নানা মত, সেই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলে মানব পথ কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? সত্যের অনুসন্ধিৎসাই শাস্ত্রের মূল। এমন কোন শাস্ত্র নাই যাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয় না। উপনিষদের কেহ দ্বৈত মতে, কেহ অদ্বৈত মতে ব্যাখ্যা করেন। সত্য গূঢ়নিহিত, বিচারে অথবা শাস্ত্রার্থে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত দীপঙ্কর যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা তাঁহার আচরণেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য্যের আলোকে যে তিমির বিনষ্ট হয় না তাহা কি তাঁহার মস্তকস্থিত দীপে দূরীভূত হইবে?

অজ্ঞানের অন্ধকার বাহিরে, না মানবের হৃদয়ে? জ্ঞানের আলোক অন্তরে উৎপাদিত হইয়া বাহিরে সর্ব্বত্র আলোক বিকীর্ণ করে। মহা-নির্ব্বাণের পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে কহিয়াছিলেন,—তোমরা স্বয়ং নিজের আলোক হইবে। বিদ্যার প্রাচুর্য্যে পাছে উদর বিদীর্ণ হয় বলিয়া পণ্ডিত বর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন। এরূপ হাস্যকর কথা কেহ কোথাও শুনিয়াছে? নৃসিংহ অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর বক্ষ ও উদর বিদীর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যার ভারে এরূপ দুর্ঘটনা কোন কালে হয় নাই। বিদ্যার স্থান উদরে, না মেধায়, মস্তকে না অন্নকোষে? তবে পণ্ডিতের পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। ইঁহার পেটে বিদ্যা অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি তাহা জীর্ণ করিতে পারেন নাই, ইহা প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে।

সাধু সাধু রবে সভাস্থল ধ্বনিত হইল, চারিদিকে হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। লজ্জিত, ক্রুদ্ধ হইয়া পণ্ডিত দীপঙ্কর চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কোলাহল থামিলে পর পণ্ডিত প্রশ্নের আবর্ত্তচক্রে শ্রমণকে নিমগ্ন করিবার প্রয়াস করিলেন। কহিলেন,—বিচারস্থলে পণ্ডিতদের নাম প্রকাশ করিতে হয়। আপনার—তোমার নাম কি?

—লোকে আমাকে দেব বলে।

—দেব কে?

—আমি।

—আমি? এই আমি কে?

—অজ্ঞানী।

—এই যে অজ্ঞানী বলিলেন,—এ ব্যক্তি কে।

—তুমি।

—তুমি বলিতে কাহাকে বুঝাইবে? তুমি কে?

—দেব।

—দেব কাহাকে বলিতেছ?

—আমাকে।

নিজের ঘূর্ণাবর্ত্তে পণ্ডিতকে মজ্জমান দেখিয়া সভাসুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির হইল। পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন। রাজা স্বয়ং উঠিয়া শ্রমণ দেবধরের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। বাহিরে রাজবাদ্য বাজিয়া উঠিল। শ্রমণের ললাটে রাণী বিজয়তিলক দিলেন। রাজা নিজের রথে শ্রমণকে আরোহণ করাইয়া রাজবাটীতে লইয়া গেলেন।

সভার বাহিরে আসিয়া পণ্ডিত দীপঙ্কর মস্তকের পাত্রাধার ও মশাল এবং অঙ্গের বর্ম্ম দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোথায় গেলেন, কেহ জানিতে পারিল না। লোকালয়ে আর ফিরিলেন না।

অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া রাজা নগরের বাহিরে উদ্যান, তড়াগ-শোভিত বৃহৎ মনোরম সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সঙ্ঘারামের নামকরণ হইল রক্তবীথি। সেখানে এক সহস্র ভিক্ষু ও শ্রমণ বাস করিতেন।

নিষ্কণ্টক

—১—

খরস্রোতা প্রবাহিণীর তীরে মনোহর উদ্যান, উদ্যানের মধ্যে মীরমঞ্জিল নামক প্রাসাদ। বাগানে চামেলী, জুঁই, মল্লিকা, গন্ধরাজ, চাঁপা, নাগকেশর ফুলের গাছ, পুষ্করিণীতে জল তক্ তক্ করিতেছে, তাহার পাশ দিয়া বড় বড় ঝাউ গাছের সারি। এক দিকে ফলের গাছ,—আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল।

বাড়ীর বাহিরে সিংহদরজার মত ফটক, সেখান হইতে দুই দিক দিয়া বাড়ীর সদর দরজার পথ আসিয়াছে, দরজার সম্মুখে গাড়ীবারান্দা। বাগানবাড়ী, দোতালা, সব-সুদ্ধ দশ-বারটা বড় বড় ঘর আছে। একটু দূরে মোটর ও গাড়ী রাখিবার ঘর, চাকর-বাকরদিগের থাকিবার ঘর।

বাড়ীতে লোকজন অধিক ছিল না। নসীর খাঁ নামক একজন ধনী মুসলমান যুবক সে গৃহে বাস করিতেন। দুইজন ভৃত্য, একজন বাবর্চি ও একজন মোটরচালক ছিল। বাড়ীর নীচে নদীর ধারে একটা নৌকার ঘর ছিল। তাহাতে তালা-বন্ধ-করা একটি ছোট বোট, বোটের জন্য একজন মাঝি। নসীর খাঁ কখন মোটরবোটে, কখন মোটরে বেড়াইতে যাইতেন, কখন সঙ্গে লোক থাকিত, কখন একা যাইতেন।

অল্পদিন হইল এ বাড়ীতে তিনি আসিয়াছেন। কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত না, তিনিও কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। খুব কাছাকাছি না হইলেও অল্প দূরে আরও বাড়ী ছিল, পথে যাইতে সময় সময় নৃত্যগীতের শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু মীরমঞ্জিল শুব্ধ, মনুষ্যকণ্ঠও শুনিতে পাওয়া যাইত না। সে-পথে গাড়ী ঘোড়া কি মোটর অধিক চলিত না, সুতরাং নসীর খাঁর মোটরও প্রায় নিঃশব্দে আসা-যাওয়া করিত, হর্ণের শব্দ বড়-একটা শোনা যাইত না। তিনি কখন্ বাড়ী থাকিতেন, কখন্ বাহিরে যাইতেন তাহার কোনো স্থিরতা ছিল না। ভৃত্যেরা কলের মত কাজ করিত, বাহিরে কোথাও বেড়াইতে যাওয়া বা অন্য বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করা তাহাদের ছিল না। দুই-একবার অপর লোকেরা তাহাদের সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অল্পভাষী দেখিয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

নসীর খাঁকে দেখিলে তাঁহার এরূপ একা বাস করিবার কারণ কিছুই বুঝা যাইত না। নবীন যুবা পুরুষ, উন্নতকায়, দীর্ঘমূর্ত্তি, সুশ্রী সতেজ মুখ, অল্প শ্মশ্রু, আয়ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি ; বলিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ আকৃতি। অর্থের অপ্রতুল মনে হয় না, মোটর-গাড়ী আর মোটর-নৌকা ধনী না হইলে রাখিতে পারে না, আর এই বয়সে যৌবনের উত্তেজনা, কত রকম আমোদ-প্রমোদে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নসীর খাঁর পরিচ্ছদ, আহার ইত্যাদি ধনীর মত, কিন্তু কোনো রকম সখ তাঁহার দেখিতে পাওয়া যাইত না। ঘরে ঘরে বিনা তারের রেডিও, তাঁহার তাহা ছিল না। বাড়ীতে একটা গ্রামোফোন পর্য্যন্ত নাই। সখের মধ্যে মোটর স্থলপথে ও জলপথে। কোথায় বেড়াইতে যাইতেন তাহাও বড়-একটা কেহ জানিত না।

—২—

একদিন বৈকাল বেলা নসীর খাঁ মোটরে করিয়া একটা বড় সহরে উপস্থিত হইলেন। সহর তাঁহার বাড়ী হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ। সহরের বড় রাস্তার উপর একট বড় বাড়ীর সম্মুখে মোটর দাঁড়াইল। মোটরচালককে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া নসীর খাঁ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বসতবাড়ী নয়, একজন বড় মহাজনের কুঠি। দোতালায় উঠিয়া নসীর খাঁ দেখিলেন, একটা বড় ঘরে মেঝের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি বসিয়া আছে, মাথায় পাগড়ী, কপালে ফোঁটা। ইনি গদিওয়ালা মহাজন বংশীলাল আগরওয়ালা। সামনে একটা কাঠের বড় বাক্স, পাশে হিসাবের খাতাপত্র। নসীর খাঁকে দেখিয়া বলিলেন, —আসুন খাঁসাহেব, বসুন।

নসীর খাঁ বলিলেন,—শেঠ-সাহেব, মিজাজ ভাল ত?

বংশীলাল বলিলেন,—আপনার অনুগ্রহ।

নসীর খাঁ জুতা খুলিয়া বসিলেন। মহাজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হুকুম?

—একটা হুণ্ডি আছে।

—কই, দেখি, বলিয়া বংশীলাল হাত বাড়াইলেন।

শেরওয়ানীর পকেট হইতে নসীর খাঁ হুণ্ডি বাহির করিয়া দিলেন। বংশীলাল চক্ষে চসমা দিয়া হুণ্ডি ভাল করিয়া দেখিলেন। কহিলেন,—৫০০৲ টাকা। নোট, না রোক দিব?

—ছোট নোট হইলেই চলিবে।

বংশীলাল বাক্স খুলিয়া ১০০৲ টাকা করিয়া ১০৲ টাকার নোটের

পাঁচখানি তাড়া বাহির করিয়া গণিয়া দিলেন। নসীর খাঁ শেরওয়ানীর নীচে মেরজাইয়ের পকেটে নোটের তাড়া পূরিলেন।

বংশীলাল একবার এদিক ওদিক দেখিলেন, ঘরে বা সম্মুখে আর কোনো লোক ছিল না। গলা নীচু করিয়া কহিলেন,—আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।

বড় বাক্সের ভিতর আর একটি ছোট ইস্পাতের ক্যাস-বাক্স ছিল। বংশীলাল কোমরের ঘুনসী হইতে একটি ছোট চাবি লইয়া বাক্স খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে শিলমোহর-করা একখানি চিঠি নসীর খাঁর হাতে দিলেন। চিঠি খুলিয়া পড়িয়া নসীর খাঁ কহিলেন,—ইনি কয়দিন আসিয়াছেন? আমাকে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন। কোন্ বাড়ীতে তাঁহার দেখা পাইব?

—দুই দিন হইল আসিয়াছেন। আপনাকে প্রকাশ্যভাবে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আপনার মোটর আছে?

—আছে।

—মোটর এখানেই থাকুক। আমরা হাঁটিয়া যাইব।

—বেশ, চলুন।

বংশীলাল নসীর খাঁকে সঙ্গে করিয়া একটা ছোট ঘরে লইয়া গেলেন। সে-ঘরে কাপড়চোপড় থাকিত। নসীর খাঁকে বসাইয়া বংশীলাল বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন,—মেহেতা জী!

মেহেতা জী নিজের ঘর হইতে হিসাবপত্র রাখিয়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন। বংশীলাল কহিলেন,—আমি একবার বাহিরে যাইতেছি। আপনি আমার বাক্স ও খাতাপত্র তুলিয়া রাখুন।

—যে আজ্ঞা।

নসীর খাঁ যে-ঘরে বসিয়াছিলেন বংশীলাল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কহিলেন,—আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধানে যাইতে হইবে, বুঝিতেই পারিতেছেন?

—হাঁ, বুঝিতে পারিতেছি।

—আমরা যতই গোপনে যাই না কেন, আমাদের পিছনে লোক লাগিবেই।

—তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে যাইতেছেন কেন? আপনারও বিপদ হইতে পারে।

বংশীলাল অল্প হাসিলেন,—কহিলেন, আপনার ও আমার একই অবস্থা। আপনার আশঙ্কা অধিক, কেননা আমার লোকবল আছে, আপনি একা।

এবার নসীর খাঁ হাসিলেন, কহিলেন,—একা যেটুকু পারি সাবধান থাকিব।

বংশীলাল একটি ছোট দরজা খুলিয়া নসীর খাঁর সঙ্গে বাড়ীর পিছনের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। সেখানে দরজা খুলিতেই একটা গলি। গলির মোড়ে দুইজন বলবান পুরুষ লাঠি-হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বংশীলাল সঙ্কেত করিবামাত্রই তাহারা দুইজন তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

—৩—

বংশীলাল বরাবর গলির ভিতর দিয়া চলিলেন, কোথাও বড় রাস্তা পড়িলে পাশ কাটাইয়া অন্য একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর এইরূপে গিয়া তাঁহারা একটা রাস্তার উপর একটা বড় বাড়ীর

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ, সম্মুখের অপর দরজা জানালাও বন্ধ। বংশীলাল দরজায় করাঘাত করাতে ভিতর হইতে একজন দরজা অল্প খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে ?

—বংশীলাল আগরওয়ালা।

ভিতর হইতে আর একজন বলিল,—দরজা খুলিয়া দাও।

দরজা খুলিতে বংশীলাল ও নসীর খাঁ দেখিলেন, চারজন লোক সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, একজনের হাতে ভরা পিস্তল আর এক জনের হাতে খোলা তলওয়ার। তাহাদের পাশে আর একজন নিরস্ত্র ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, সে এই দরজা খুলিতে বলিয়াছিল। বংশীলাল, নসীর খাঁ ও তাঁহাদের সঙ্গের দুইজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিতেই একজন দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নিরস্ত্র ব্যক্তি বংশীলাল ও নসীর খাঁকে বলিল,—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

দোতালার উপরে কয়েকটা ঘর পার হইয়া তাঁহারা একটা ঘরের দরজায় উপস্থিত হইলেন। সেখানেও একজন প্রহরী। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সে পথ ছাড়িয়া দিল।

ঘরের ভিতর একটা টেবিলের সম্মুখে দুইজন লোক বসিয়া। একজনের বয়স পঞ্চাশ হইবে আর একজন তরুণ বয়স্ক, কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নয়। দুই জনকে দেখিলেই মনে হয় যে, ইঁহারা বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়। যাঁহার বয়স অধিক তাঁহার চুল কিছু পাকিয়াছে, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু আয়ত ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। বর্ণ গৌর, আকৃতি কিছু দীর্ঘ, শরীর কৃশ কিন্তু দুর্ব্বল নয়, মুখের ভাব গম্ভীর। যুবক অনেকটা তাঁহারই মত দেখিতে, অত্যন্ত সুপুরুষ, মুখের ভাব অতি নম্র।

বংশীলাল ও নসীর খাঁকে দেখিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি আসন ত্যাগ

করিলেন না, কিন্তু তাঁহারা দুইজন অত্যন্ত বিনীতভাবে অভিবাদন করিলেন। যুবক উঠিয়া সেলাম করিল।

নসীর খাঁ ও বংশীলাল আদেশ-মত উপবেশন করিলেন। প্রৌঢ় পুরুষ মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—আমাদের বিপদে যে তোমরাও জড়িত হইতেছ ইহাতে আমার ক্ষোভ হইতেছে।

বংশীলাল কহিলেন,—আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদের প্রজা, আমাদের যাহা কিছু আছে আপনাদের কৃপায়। আমাদের জান মাল আপনার আজ্ঞাধীন। এই রাজ্য আপনার, শত্রু আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

পুরুষ নসীর খাঁকে কহিলেন,—তুমি আমার আত্মীয়, কিন্তু তাহা হইলেও এই অল্প বয়সে যে তুমি আমাদের জন্য বিপদগ্রস্ত হইতে চাও ইহাতে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হয়।

নসীর খাঁ হাতজোড় করিয়া কহিলেন,—হজরত, আপনি নাজীর শাহের পৌত্র শাহ সুলেমান। আপনার সহিত আত্মীয়তা আছে বলিয়া আমি গৌরব করিতে পারি, কিন্তু আমিও প্রজা এবং কিঙ্কর, আপনার কার্য্যে প্রাণের আশঙ্কা অতি তুচ্ছ মনে করি।

শাহ সুলেমান কহিলেন,—বড় ভাগ্যবান না হইলে তোমাদের মত বন্ধু মিলে না। দেখ আমি নিজে সব ছাড়িয়া দিয়া ফকীর হইতে পারি, কিন্তু এই বালক আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার অবর্ত্তমানে সিংহাসন ইহার, ইহাকে বঞ্চিত করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। সিকন্দর শাহ, তুমি কি বল?

যুবক সিকন্দর শাহ মস্তক অবনত করিয়া বলিল,—আপনার আদেশ ছাড়া আমার কোনো স্বতন্ত্র অভিপ্রায় নাই। আমার বলিবার কিছুই নাই।

শাহ সুলেমান উঠিয়া বংশীলাল ও নসীর খাঁকে বলিলেন,—তোমরা একবার আমার সঙ্গে আইস্।

পাশের ঘরে গিয়া শাহ সুলেমান তাঁহাদিগকে দেখাইলেন ঘরে বাক্স, সিন্দুক, সমস্ত খোলা পড়িয়া আছে, জিনিষপত্র চারিদিকে ছড়ান। আর এক ঘরেও সেইরূপ।

শাহ সুলেমান বলিলেন,—আমরা এখানে দুই দিন হইল আসিয়াছি, কিন্তু ইহারই মধ্যে কাল রাত্রে কখন কে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাক্স-পেটরা ভাঙিয়া তচনচ করিয়াছে, অথচ কিছু চুরি হয় নাই। সাধারণ চোরের কাজ নয় বুঝিতেই পারিতেছ। যাহা খুঁজিতে আসিয়াছিল তাহা পায় নাই। বাড়ীতে লোকজন, পাহারা, কিন্তু কখন্ ঘরে লোক আসিয়াছিল কেহ জানিতে পারে নাই।

বংশীলাল বলিলেন,—আপনার লোক কি সব বিশ্বাসী?

—আমার লোকেরা পুরুষানুক্রমে আমাদের বংশে কাজ করিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ অবিশ্বাসী হইলে কত কাল পূর্ব্বে চুরি হইয়া যাইত। কি চুরি করিতে আসিয়াছিল তোমরা জান ত?

বংশীলাল বলিলেন,—কিছু কাগজপত্র আছে জানি।

নসীর খাঁ বলিলেন,—একটা প্রাচীন শিলমোহরও আছে।

শাহ সুলেমান বলিলেন,—আছে তিনটি জিনিষ। সেই তিনটি জিনিষ না থাকিলে কেহ এ রাজ্য নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিতে পারিত না। যাহারা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক শঠতা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, সেই তিনটি সামগ্রী না পাইলে তাহারা শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবে। এ সকল রাজ্য শাহান শাহ মোবারক শাহের অধীন, তোমরা সকলেই জান। বৎসরে একবার করিয়া আমাদিগকে তাঁহার রাজধানীতে

যাইতে হয়, সেই সময় সেই সকল নিদর্শন দেখাইতে হয়, না দেখাইতে পারিলে রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়, শাহান শাহ আর কাহাকেও দিয়া দেন। তাঁহার সৈন্যবল এত অধিক যে, তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে কাহারও সাহস হয় না। আমাদের শত্রু দশ মাস হইল রাজ্য অপহরণ করিয়াছে; আর দুই মাস পরে তাহাকে রাজধানী যাইতেই হইবে। সেইজন্য সেই তিনটি জিনিষের খোঁজ করিতেছে।

বংশীলাল বলিলেন,—আপনাদের কোনো আশঙ্কা নাই।

—এখন নয়। আমাদিগকে এখন হত্যা করিলে কোনো ফল নাই। কেননা, তাহা হইলে সে-সকল সামগ্রী একেবারেই না পাওয়া যাইতে পারে, আমরা অপর কাহাকেও দিয়া দিতে পারি। কিন্তু সে-সকল জিনিষ পাইলেই আমাদিগকে হত্যা করিবে।

নসীর খাঁ কিছু বেগের সহিত কহিলেন,—আমরা আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সুলেমান শাহ বলিলেন,—তোমরা আমার পরম মিত্র জানি, কিন্তু গুপ্তশত্রু হইতে কতক্ষণ রক্ষা করিবে? এই দেখ এত লোক থাকিতে এই বাড়ীতে লোক আসিয়াছিল। সিকন্দর ও আমি পিস্তল লইয়া শয়ন করি, রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দুজন সশস্ত্র প্রহরী থাকে, কিন্তু কোথায় কখন্ আমাদের প্রাণের আশঙ্কা, তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে? তবে আমার বিশ্বাস, এখন আমাদের প্রাণের আশঙ্কা নাই।

বংশীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কয়েকটা সামগ্রী সাবধানে রাখিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

অল্প হাসিয়া সুলেমান শাহ বলিলেন,—সেই পরামর্শ করিবার জন্যই তোমাদিগকে ডাকাইয়াছি। সে জিনিষগুলা এখন পর্য্যন্ত

আমার কাছেই আছে, কিন্তু কিছুদিন আর কোথাও রাখিতে পারিলে ভাল হয়। তোমরা একটু অপেক্ষা কর।

সুলেমান শাহ চলিয়া গেলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন তাঁহার হাতে তিনটি সামগ্রী, দুইটি ছাগচর্ম্মের টুকরা, তাহাতে গাঢ় মসীতে লেখা, আর একটি লোহার নাম খোদাই করা মোহর। তিনটিই অত্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু দেখিতে এত সামান্য যে, পথে পড়িয়া থাকিলেও কেহ চুরি করে না। অথচ এই তিনটি সামগ্রী একটা রাজ্যলাভের উপায়, ইহাদের অন্বেষণে কত লোক দিবারাত্র ফিরিতেছে।

—আমার ইচ্ছা এই তিনটি সামগ্রী আর একত্রে না রাখা হয়, তাহা হইলে সবগুলি একসঙ্গে অপহৃত হইবে না।

বংশীলালকে সম্বোধন করিয়া সুলেমান শাহ এই কথা বলিলেন।

বংশীলাল কহিলেন,—হুজুর যেমন আদেশ করিবেন সেইরূপ হইবে। আমাকে যাহা রাখিতে বলিবেন, রাখিব।

নসীর খাঁ কহিলেন,—আমিও রাখিতে সম্মত আছি।

সুলেমান শাহ কহিলেন,—যাহারা এই কয়টি জিনিষ চুরি করিয়া কিংবা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা জানে, এগুলি আমার কাছে আছে। আমার নিকট হইতে অপহরণ করিবার অনেকবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তোমাদিগকে যে সন্দেহ করিবে না, এমন মনে করিও না। আমাদের কাছে কে আসে-যায় সে সন্ধান তাহারা রাখে। তোমরা আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, তাহাও তাহারা জানে। যদি তাহাদের সংশয় হয় যে, এই সকল জিনিষ তোমাদের কাছে আছে, তাহা হইলে তোমাদের বাড়ী ত খুঁজিবেই, তোমাদের অন্য আশঙ্কাও আছে।

নসীর খাঁ বলিলেন,—আপনি সে বিষয়ে কোনো চিন্তা করিবেন না, আমরা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিব।

সুলেমান শাহ এক খণ্ড চর্ম্ম ও মোহর আলাদা করিয়া কহিলেন, —এই দুইটি অধিক প্রাচীন ও এ দুটি না দেখাইতে পারিলে মোবারক শাহ কাহাকেও রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না। তোমরা কে কোন্‌টি রাখিবে?

বংশীলাল বলিলেন,—প্রাচীন সনদ আমাকে দিন্‌।

নসীর খাঁ বলিলেন,—তাহা হইলে মোহর আমি রাখিব।

সুলেমান শাহ কহিলেন,—আমি আরও একটা কথা ভাবিয়াছি। সিকন্দর শাহ কিছুদিন আমার কাছে না থাকিয়া আর কোথাও থাকিলে হয়। তাহাতে আশঙ্কা থাকিলেও লাভ আছে।

নসীর খাঁ যুক্তকরে কহিলেন—যুবরাজ যদি আমার গৃহে পদার্পণ করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব।

সুলেমান শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিকন্দর, তুমি কি বল?

—আপনার আদেশ হইলেই নসীর খাঁর সঙ্গে যাইব।

—আচ্ছা, তুমি নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ লোকের পরিচ্ছদ পরিধান কর।

শিকন্দর শাহ বেশ বদ্‌লাইতে গেলেন। সুলেমান শাহ কহিলেন,— তোমরা হাজার সাবধানে এখানে আসিলেও তোমাদের পিছনে লোক আছে। বংশীলাল তোমার সঙ্গে লোক আছে?

—দু'জন লোক হাতিয়ার সমেত আছে।

—তোমার নিজের কাছে কোনো অস্ত্র আছে?

বংশীলাল বক্ষের ভিতর হইতে একটি ছোট পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইলেন।

সুলেমান শাহ্ নসীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কাছে কি আছে ?

নসীর খাঁর কাছে দুইটি উৎকৃষ্ট পিস্তল ও কটিতে তীক্ষ্ণধার ছুরি ছিল।

সুলেমান শাহ্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি মোটরে আসিয়াছ ?

—আজ্ঞা হাঁ।

—ফিরিবার সময় তুমি নিজে মোটর চালাইবে, আগে-পিছনে দৃষ্টি রাখিবে।

সিকন্দর শাহ্ সাধারণ নগরবাসীর ন্যায় পোষাক পরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সুলেমান শাহের প্রশ্নের উত্তরে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুলেমান শাহ্ নিজের কটি হইতে ছুরি বাহির করিয়া তাঁহাকে দিলেন, বলিলেন,—এটাও রাখ।

বংশীলাল সনদ কটির বস্ত্রে বাঁধিয়া লইলেন, নসীর খাঁ মোহর রুমালে বাঁধিয়া মীরজাইয়ের ভিতর লইলেন।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া বংশীলাল ও নসীর খাঁ লক্ষ্য করিলেন, একজন লোক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছে। তাঁহাদের তিনজনকে দেখিয়া সে একটা গলির ভিতর চলিয়া গেল।

—৪—

বংশীলালের কুঠীতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইল। বংশীলাল নসীর খাঁকে বলিলেন,—আপনারা আর একটু অপেক্ষা করিবেন কি ? তাহা হইলে অন্ধকার হইয়া আসিবে।

সিকন্দর শাহ্ ও নসীর খাঁ একটু বসিলেন। ঘোর ঘোর হইলে নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ্ বাড়ীর বাহিরে আসিয়া মোটরে উঠিলেন। মোটর-চালককে নসীর খাঁ বলিলেন,—মোটর আমি চালাইব, তুমি গাড়ীর ভিতর ব'স। তুমি পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিবে, আমাদের পিছনে কোনো মোটর কি মোটর-বাইক আসিতেছে দেখিতে পাইলে আমাকে বলিবে। সামনের দিকে আমি নজর রাখিব।

সম্মুখ দিকে সিকন্দর শাহ্ নসীর খাঁর পাশে বসিলেন। নসীর খাঁ বলিলেন,—আপনি পিস্তল বাহির করিয়া হাতে রাখুন। প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করিতে বিলম্ব করিবেন না।

একটা পিস্তল নসীর খাঁ নিজের পাশে রাখিলেন, আর একটা মোটর-চালকের হাতে দিলেন, বলিলেন,—পিছন হইতে যদি কেহ আমাদের আক্রমণ করে তখনি গুলি করিবে।

সহর হইতে বাহির হইয়া নসীর খাঁ বেগে মোটর চালাইলেন। মোটর-চালক পিস্তল হাতে করিয়া পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। সিকন্দর শাহ্ পথের দুই পাশে লক্ষ্য রাখিলেন। নসীর খাঁর দৃষ্টি সম্মুখ দিকে, কিন্তু পাশের দিকেও তাঁহার নজর ছিল।

কিছুদূর গিয়া মোটর-চালক বলিল,—পিছন হইতে একখানা বড় মোটর বড় জোরে আসিতেছে।

নসীর খাঁ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, মোটরে দুই জন আছে, তাঁহার মোটরের অপেক্ষা এ মোটর বড় এবং গতির বেগও অধিক। আর কিছুদূর যাইতেই সে মোটর তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িবে। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, একটু আগেই রাস্তা বাঁ-দিকে বেঁকিয়া গিয়াছে। সেখানে জঙ্গলের মত, পথের ধারে কয়েকটা বড় বড় অশ্বত্থ ও বটগাছ। নসীর খাঁ হঠাৎ মোটরের পিছন হইতে

ধোঁয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। পথ ধোঁয়ায় অন্ধকার হইয়া গেল, পিছন হইতে আর কিছু দেখা যায় না। সেই অবসরে নসীর খাঁ রাস্তার মোড় ফিরাইয়া মোটর একপাশে দাঁড় করাইলেন। তাঁহার ইঙ্গিত-মত মোটর-চালক পিস্তল-হাতে নামিল। সিকন্দর শাহ নসীর শাহের সঙ্গে নামিলেন। তিনজনে একটা বড় বটগাছের আড়ালে দাঁড়াইলেন। তখনও পিছনের মোটর আসিয়া পৌছায় নাই, বাতাসে ধোঁয়া অল্পে অল্পে উড়িয়া যাইতেছে।

বড় মোটর মোড় ফিরিতেই আরোহীরা দেখিল, অন্য মোটর পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখনি ব্রেক বাঁধিয়া আরোহী দুইজন লাফাইয়া পড়িল, দুইজনেরই হাতে পিস্তল। তাহারা নসীর খাঁর মোটরের দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাদের পশ্চাৎ হইতে কে স্পষ্ট, কঠোর স্বরে কহিল,—তোমরা যেমন আছ তেমনি দাঁড়াইয়া থাক। পিছনে মুখ ফিরাইও না। হাতের পিস্তল মাটিতে ফেলিয়া দাও।

সে দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অল্প ঘাড় বাঁকাইয়া পিছনে দেখিবার চেষ্টা করিল। তৎক্ষণাৎ—দুম্! তাহার কানের পাশ দিয়া শোঁ করিয়া গুলি বাহির হইয়া গেল।

নসীর খাঁ সেইরূপ কঠিন কণ্ঠে কহিলেন,—এবার মুখ ফিরাইলে গুলি তোমার মাথায় লাগিবে। তোমাদের পিছনে তিনটি পিস্তল। তোমরা পিস্তল ফেলিয়া দাও, নহিলে হাতে গুলি করিব।

পিস্তল দুইটা পথের মাঝখানে সশব্দে পড়িয়া গেল। নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ সেই দুই ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদের পিস্তলের লক্ষ্য তাহাদের বক্ষঃস্থল। নসীর খাঁ মোটর-চালককে কহিলেন,—ইহাদের কাছে কি আছে দেখ।

নসীর খাঁ তাহাদের কাপড়চোপড় দেখিয়া দুইখানা ছুরি পাইল, একজনের পকেটে একখানা কাগজ ছিল, সেখানা নসীর খাঁ লইলেন। তাহার পর আদেশ করিলেন,—ইহাদিগকে বাঁধ।

তাহাদের মাথার পাগড়ী খুলিয়া মোটর-চালক তাহাদিগকে বাঁধিল। নসীর খাঁ বলিলেন,—ইহাদের মোটরের চাকা ফাটাইয়া দাও।

মোটর-চালক পিস্তলের গুলি দিয়া সব টায়ারগুলা ফাটাইয়া ফেলিল। বোমা ফাটার মত শব্দ হইল।

নসীর খাঁর আদেশে মোটর-চালক সেই দুই ব্যক্তিকে তাহাদের নিজের মোটরে বাঁধিল।

নসীর খাঁ সেই দুই ব্যক্তিকে বলিলেন,—আবার তোমাদের দেখিলে চিনিতে পারিব, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই তোমাদের মঙ্গল। এবার তোমরা রক্ষা পাইলে, দ্বিতীয়বার পাইবে না।

—৫—

বাড়ীতে ফিরিয়া নসীর খাঁ মোটর-চালককে বলিলেন,—রাত্রেও সাবধান থাকিতে হইবে।

মোটর-চালক এ পর্য্যন্ত, একটা কথাও বলে নাই, নসীর খাঁর আদেশ নীরবে পালন করিয়াছিল। এখন বলিল,—সেই দুইটা লোক আবার আসিতে পারে?

—তাহারাই হউক কিংবা অন্য লোক। ইহারা চোর নয়, আমাদের দুশমন।

—বাড়ীর অন্য লোককে বলিব?

—সকলকে বলিবে। সকলের কাছে যেন অস্ত্র থাকে।

সিকন্দর শাহ বাগান দেখিয়া, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—আপনার বাড়ী বেশ সুন্দর।

নসীর খাঁ কহিলেন,—এখানে আপনার কোনো কষ্ট হইবে না। আমাকে আপনার ভৃত্য বিবেচনা করিবেন।

সিকন্দর শাহ লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—অমন কথা বলিবেন না, আপনি আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের জন্য বিপদ স্বীকার করিয়াছেন।

আহারাদির পর নসীর খাঁ সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কুকুরের সখ আছে?

—খুব আছে, কিন্তু সঙ্গে আনিতে পারি নাই। আমাদিগকে গোপনে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

—আসুন, আমার কুকুর দেখিবেন।

বাড়ীতে, বাড়ীর বাহিরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল। যেখানে মোটর রাখা ছিল তাহার পাশের ঘর খুলিয়া নসীর খাঁ আলো জ্বালিলেন। সিকন্দর শাহ দেখিলেন, বাঘের মত চারিটা কুকুর লোহার শিকলে বাঁধা রহিয়াছে। বলিলেন,—এ ত তাজী কুকুরের অপেক্ষাও বড়। কোথায় পাইলেন?

—এগুলি বিদেশী কুকুর। আর এক দেশে গিয়া দুই জোড়া পাইয়াছিলাম।

—ইহাদের নাম কি রাখিয়াছেন?

—এইটি রুস্তম, সকলের অপেক্ষা বলবান, ইহার পাশে ইহার জোড়া বানু। আর ও-পাশে খুসরু ও হনিফা।

নসীর খাঁকে দেখিয়া কুকুরগুলা ল্যাজ নাড়িতেছিল, সিকন্দর শাহকে দেখিতেছিল। তিনি রুস্তম বলিয়া ডাকিয়া রুস্তমের মাথায় হাত দিলেন। কি করেন? সাবধান! বলিয়া নসীর খাঁ তাড়াতাড়ি

সিকন্দর শাহের হাত ধরিতে গেলেন, কিন্তু সিকন্দর শাহ হাসিতে লাগিলেন। রুস্তম তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

নসীর খাঁ বলিলেন,—ইহারা অপরিচিত কোনো লোককে কাছে আসিতে দেয় না। কুকুর বশ করিবার আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।

সিকন্দর শাহ বলিলেন,—আমি কুকুর ভালবাসি। ইহারা থাকিতে আপনার পাহারার প্রয়োজন কি?

—সকল রাত্রে ইহাদিগকে খুলি না, কিন্তু এখন ইহাদের দরকার। দশজন অস্ত্রধারী সিপাহী অপেক্ষা রাত্রিকালে ইহাদের উপর ভরসা অধিক। ইহারা বড় একটা ডাকে না, যাহাকে ধরে তাহাকে প্রাণেও মারে না, মানুষ ধরিয়া তাহার পর সাড়া দেয়।

নসীর খাঁ কুকুর চারিটা খুলিয়া দিলেন। তাহারা নিঃশব্দে তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিল। নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিলেন, লোকজনকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় রুস্তমকে ভিতরে ডাকিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, বলিলেন,—রুস্তম, তুমি আজ আমাদিগকে পাহারা দিবে।

রুস্তম একবার ল্যাজ নাড়িয়া নসীর খাঁর শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে গিয়া বসিল।

সেই ঘরে সিকন্দর শাহেরও শয্যা পাতা হইয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া নসীর খাঁ কহিলেন,—আমরা এখানে শয়ন করিব না, সাধ্যমত আমাদিগকে সাবধানে থাকিতে হইবে।

দুইটি শয্যায় বালিশ ও বিছানা নসীর খাঁ এরূপভাবে সাজাইলেন যেন দুইটি লোক শুইয়া আছে। সেই ঘরের ভিতর দিয়া আর একটি

ঘরে প্রবেশ করিয়া নসীর খাঁ সিকন্দর শাহকে আর দুইটি শয্যা দেখাইলেন। বলিলেন, আমরা এইখানে শয়ন করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত হউন, আমি জাগিয়া থাকিব।

সিকন্দর শাহ বলিলেন,—সে কেমন কথা! আমার জন্য আপনার আশঙ্কা, আর আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইব? নূতন স্থানে সহজেই আমার ঘুমের একটু ব্যাঘাত হইয়া থাকে, অতএব প্রথম রাত্রে কিছুতেই আমার নিদ্রা হইবে না। আপনি এখন নিদ্রিত হউন, আমার নিদ্রা আসিলে আপনাকে উঠাইয়া দিব।

—সেই ভাল কথা, বলিয়া নসীর খাঁ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত কোনো রকম সাড়াশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় একবার বাড়ীর বাহিরে কুকুরের ডাক শোনা গেল। ঘরের ভিতর রুস্তম একবার ডাকিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সিকন্দর শাহ তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। নসীর খাঁ পিস্তল-হাতে উঠিয়া আসিলেন, সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার পিস্তল?

সিকন্দর শাহ নিজের হাতের পিস্তল দেখাইলেন।

নসীর খাঁ কহিলেন,—কুকুর অকারণে ডাকিবে না, নিশ্চিত কোনো লোক দেখিয়া থাকিবে।

নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। রুস্তম বেগে বাগানের একদিকে দৌড়িয়া গেল।

নসীর খাঁ বলিলেন, চলুন, আমরাও উহার পিছনে যাই।

মোটর চালক ও অপর ভৃত্যেরা উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল।

যেদিকে রুস্তম দৌড়িয়া গিয়াছিল সেইদিকে সকলে গিয়া দেখিলেন, যেখানে বাগান বড় অন্ধকার সেইখানে একটা বকুল গাছের তলায় একটা লোক পড়িয়া আছে। খুসরু নামক কুকুর তাহার বুকে দুই থাবা দিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, আর দুইটা কুকুর তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যে লোকটা মাটিতে পড়িয়াছিল সে মানুষ দেখিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—আমাকে রক্ষা কর। কুকুরে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

নসীর খাঁ চাকরদের নিকট হইতে একটা লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। নিকটেই একটা পিস্তল পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইলেন।

তিনি খুসরু বলিয়া ডাকিতেই খুসরু সে লোকটাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যক্তির শরীর অক্ষত, কেবল ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

নসীর খাঁর আদেশ-মত ভৃত্যেরা সে লোকটাকে টানিয়া তুলিয়া তাহার বস্ত্রের মধ্যে এক টুকরা কাগজ খুঁজিয়া পাইল।

ইহার পূর্ব্বে নসীর খাঁ মোটরের লোকদের কাছে এক খণ্ড কাগজ পাইয়াছিলেন। সেখানা তাঁহার পকেটে ছিল। সেখানা বাহির করিয়া দ্বিতীয় কাগজের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, দুখানিই এক রকম, তাহাতে শুধু লেখা আছে, এই কাগজ আর মাল আনিলে প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাইবে।

নসীর খাঁ কাগজে-লেখা সিকন্দর শাহকে দেখাইলেন। সিকন্দর শাহ পড়িয়া বলিলেন,—ইহা জানা কথা।

নসীর খাঁ চাকরদের বলিলেন,—এই লোকটাকে আমার বসিবার ঘরে লইয়া আইস।

নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ রুস্তমকে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা-ঘরে আসিলেন। যে লোকটা ধরা পড়িয়াছিল তাহাকে লইয়া আসিলে পর নসীর খাঁ ভৃত্যদিগকে কহিলেন,—তোমরা যাও, ইহাকে আমি বন্ধ করিয়া রাখিব।

—৬—

ভৃত্যেরা বাহির হইয়া গেলে পর নসীর খাঁ দরজা বন্ধ করিলেন। ঘরের সব কয়টা আলো জ্বলিতেছিল। নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ পাশাপাশি বসিলেন, রুস্তম নসীর খাঁর পায়ের কাছে বসিল। হাতের পিস্তল দুইটা নসীর খাঁ নিজের পাশে রাখিলেন।

যে লোকটা ধৃত হইয়াছিল সে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন শাস্তি হয় নাই দেখিয়া তাহার সাহস ফিরিয়া আসিতেছিল।

নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে?

—আমি চোর, দেখিতেই পাইতেছেন।

—চোরের কাছে কি পিস্তল থাকে?

—আত্মরক্ষার জন্য কেহ ছুরি রাখে, কেহ পিস্তল রাখে।

—পিস্তল থাকিতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে না কেন, এত সহজে ধরা পড়িলে কেন?

চোরের মুখ শুকাইল। কহিল,—বিপদ জানিলে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। আমি কুকুর দেখি নাই, কুকুরের ডাকও শুনি নাই, হঠাৎ আমার ঘাড়ে ও পিঠে যেন একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়িল, পিস্তল কোথায় পড়িয়া গেল, আমি পড়িয়া গিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় বাঘের মত একটা কুকুর আমাকে চাপিয়া ধরিল।

নসীর খাঁ অল্প হাসিলেন, সে হাসি দেখিয়া চোরের ভয় হইল। নসীর খাঁ বলিলেন,—আমি একবার ইসারা করিলেই কুকুরে তোমার টুঁটি ছিঁড়িয়া খাইত, জান ?

চোর বারকতক ঢোক গিলিয়া বলিল,—হুজুর, তা ত জানি।

—এ বাড়ীতে ত চুরি করিবার কিছুই নাই, টাকাকড়ি আমি বাড়ীতে রাখি না, এখানে চুরি করিতে কেন আসিয়াছিলে ?

—কিছু আছে কি না কেমন করিয়া জানিব ?

—তুমি কি চুরি করিতে আসিয়াছিলে, কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল, আর এ কাগজে কাহার লেখা, সত্য করিয়া বল।

—আমার আর কিছু বলিবার নাই, আমি আর কিছু বলিব না।

—বটে ? কুকুর দিয়া খাওয়াইলে বলিবে ! রুস্তম !

রুস্তম উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোরের দিকে চাহিয়া লাফাইবার উপক্রম করিল।

চোর ভয়ে অস্থির হইয়া বলিল,—হুজুর, হুজুর, আমি সকল কথা বলিতেছি, কুকুর লেলাইয়া দিবেন না।

নসীর খাঁ হাত নাড়িতেই রুস্তম আবার বসিল। নসীর খাঁ চোরকে বলিলেন,—আমার কথার উত্তর দাও।

—আমি মোহর আর কাগজ চুরি করিতে আসিয়াছিলাম। এ কাগজে কাহার লেখা, আমি জানি না। যে আমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিল তাহাকে আমি চিনি না। আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়া বলিয়াছিল জিনিষ আনিতে পারিলে আরও পাঁচশো টাকা পাইবে।

—যে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছিল সে কোথায় থাকে ?

চোর সহরে একটা বাড়ীর ঠিকানা দিল, বলিল, সে ব্যক্তি সে বাড়ীতে থাকে কি না বলিতে পারি না।

—আচ্ছা, আজ রাত্রে তুমি বন্ধ থাক, কাল সকালবেলা একটা ব্যবস্থা করিব।

নসীর খাঁ চোরকে একটা ছোট কুঠুরীতে বদ্ধ করিলেন। একটি দরজা, ভিতরে জানালা ছিল না। বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া রুস্তমকে দরজার সম্মুখে বসাইয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয়বার শয়ন করিবার সময় নসীর খাঁ সিকন্দর শাহকে কহিলেন,—আমার মনে হয় এ ব্যক্তি সত্য বলিতেছে। যাহারা ইহার পিছনে আছে তাহারা ইহার নিকট আত্ম-পরিচয় দিবে না।

সিকন্দর শাহ বলিলেন,—আমারও তাহাই মনে হয়।

—৭—

প্রাতে চোরকে সঙ্গে করিয়া নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ বংশীলালের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন। চোরকে দেখিয়াই বংশীলাল চিনিলেন, কহিলেন,—কি, রামঅবতার! কাল রাত্রে কি তোমার খাঁ-সাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল?

রামঅবতার মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—আপনি কি আমার জাত মারিতে চান?

নসীর খাঁ বলিলেন,—রামঅবতার আমাদের অতিথি।

রাত্রের ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহাকে আপনি চেনেন?

—বিলক্ষণ চিনি! বড় বাহাদুর লোক, কিছু টাকা পাইলেই সব করিতে প্রস্তুত। রামঅবতার, কাল রাত্রে তোমার জুড়িদার কে ছিল?

—আমি একা ছিলাম, আমার সঙ্গে আর কেহ ছিল না।

—একজন এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বংশীলাল সকলকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর পিছন দিকে লইয়া গেলেন। সেখানে একটা সরু সিঁড়ির পৈঠার স্থানে স্থানে রক্তচিহ্ন। বংশীলাল বলিলেন,—রামঅবতার, এই তোমার জুড়িদারের চিহ্ন। অন্ধকারে কোথায় চোট লাগিয়াছিল, আমাদিগকে না দেখাইয়াই চলিয়া গিয়াছে।

নসীর খাঁ হাসিয়া বলিলেন,—রামঅবতারের গলাটাও বড় রক্ষা পাইয়াছিল, নহিলে আর কথা কহিবার শক্তি থাকিত না।

বংশীলাল বলিলেন,—এখানে যে আসিয়াছিল তাহার পায়ে আমি গুলি করিয়াছিলাম। মাস কয়েক তাহাকে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইবে।

নসীর খাঁ বলিলেন,—রামঅবতার আমার বাড়ীতে খাইবে না, তাহার আতিথ্য সেবা কেমন করিয়া হইবে?

—তাহার আর ভাবনা কি? এখানে কে অছে?

একজন বলবান দরওয়ান আসিল। বংশীলাল কহিলেন,—রাম-অবতার কাল রাত্রে খাঁ-সাহেবের বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছিল। ইহাকে খাইতে দাও, কিন্তু আমি হুকুম না দিলে ইহাকে ছাড়িবে না।

—বহুত খুব, শেঠজী, বলিয়া দরওয়ান রামঅবতারকে ধরিয়া লইয়া গেল।

তাহার পর সকলে গিয়া সুলেমান শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বংশীলাল ও নসীর খাঁকে ধন্যবাদ দিয়া সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি নসীর খাঁর বাড়ীতেই থাকিবে?

সিকন্দর শাহ কহিলেন,—আমি বেশ আছি। খাঁ-সাহেবের যে কুকুর আছে তাহাতে চোর-ডাকাতের কোনো ভয় নাই!

সুলেমান শাহ্ কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নসীর খাঁ বলিলেন,—জাঁহাপনা, যদি একদিন আমার গৃহে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আপনাকে কুকুর দেখাই।

সুলেমান শাহ্ বলিলেন,—আমি নিশ্চিত একদিন যাইব। আমার এখানে আর কোনো উপদ্রব হয় নাই, উহাদের বিশ্বাস হইয়া থাকিবে, জিনিষগুলা আমার কাছে নাই।

—৮—

নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ্ মীরমন্‌জীলে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নৌকার ঘর দেখিয়া সিকন্দর শাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার ভিতর নৌকা আছে?

নসীর খাঁ বলিলেন,—একটা ছোট মোটর-বোট আছে। আমি কখনও কখনও নদীতে বেড়াইতে যাই।

নৌকার ঘরের সম্মুখে আসিয়া লোহার গরাদের ভিতর দিয়া সিকন্দর সাহ্ মোটর বোট দেখিতে পাইলেন। কহিলেন,—আপনার অনুমতি হইলে আমি নদীতে একবার ভ্রমণ করিয়া আসি।

নসীর খাঁ কহিলেন,—আসুন, আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

তালা খুলিয়া নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ্ বোটে উঠিলেন। নদীতে যাইবার আর একটা দরজা ছিল, নসীর খাঁ সেটা খুলিয়া বোট বাহিরে আনিলেন। স্রোতে পড়িয়া বোট ভাসিয়া চলিল।

নসীর খাঁ বলিলেন,—বোট আপনি চালাইবেন?

সিকন্দর শাহ এঞ্জিন চালাইয়া বোটের হাল ধরিলেন। নসীর খাঁ তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। নৌকায় গদি পাতা, মাঝখানে একটি ছোট কামরা, তাহার ভিতর দুইজন লোক আরামে বসিতে ও শুইতে পারে।

নদীর স্রোত একটানা, জলের প্রবাহ তীব্র। প্রশস্ত গভীর নদী, পর পারে চাষের জমি, কাছাকাছি নৌকা ও লোকজন নাই। সিকন্দর শাহ বোটের মুখ ফিরাইয়া উজানে চলিলেন। বোট জল কাটিয়া আশে পাশে ঢেউ ও ফেনা তুলিয়া তীরের মত চলিল।

মাঝে মাঝে কোথাও নদীর ধারে বাড়ী, বাড়ীর লোকেরা বোটের শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। এ ধারে চাষবাস নাই, যেখানে বাড়ী নাই সেখানে হয় উপবন, না হয় জঙ্গল।

সিকন্দর শাহ একহাতে হাল ধরিয়া আর এক হাত মাঝে মাঝে জলে ডুবাইতেছিলেন। জলপথে তাঁহার আলস্যের আবেশ হইতেছিল। নসীর খাঁ গদি ঠেসান দিয়া পা ছড়াইয়া ওপারে চাষীদের চাষ-করা দেখিতেছিলেন।

সিকন্দর শাহ বলিলেন,—কাছাকাছি দেখিবার মতন কিছু আছে?

—কিছু দূরে লালবিবির কবর আছে। চলুন দেখিতে যাওয়া যাক্।

আর কোনো কথা হইল না, বোট সশব্দে জল তোলপাড় করিয়া চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে নসীর খাঁ কহিলেন,—এইবার কিনারায় লাগান।

সিকন্দর শাহ বোটের বেগ সংযত করিয়া নিকটেই প্রাচীন ঘাট দেখিতে পাইয়া তাহার পাশে বোট লাগাইলেন। নসীর খাঁ কল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিলেন।

ঘাটের কাছে একটা লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, চলুন হুজুর, ভাল করিয়া আপনাদিগকে মকবরা দেখাইয়া আনি।

নসীর খাঁ কহিলেন,—আমাদের সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে না, তুমি আমাদের নৌকা আগ্‌লাও, ফিরিয়া আসিয়া বখসিস দিব।

—বহুত আচ্ছা, জনাব, বলিয়া সে ব্যক্তি নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

নদীর ধারের নিকটেই কবর। দেখিতে বড় নয়, কিন্তু শ্বেত মর্ম্মরের উপর কারুকার্য্য বড় সুন্দর। সিকন্দর শাহ ও নসীর খাঁ চারিদিকে ঘুরিয়া উত্তমরূপে দেখিলেন। ফিরিবার সময় নসীর খাঁ যে ব্যক্তি তাঁহাদের বোটের কাছে দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে কিছু পুরস্কার দিলেন।

সিকন্দর শাহ পূর্ব্বের ন্যায় হাল ধরিলেন, নসীর খাঁ পরপারের দিকে দেখিতে লাগিলেন।

ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইল না। একে স্রোতের টান, তাহার উপর মোটরের বেগ; বোট নক্ষত্রগতিতে চলিল। বাড়ীর কাছে আসিয়া সিকন্দর শাহ দেখিলেন, আর একটা বাড়ীর দোতলায় খোলা জানালায় একটি সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বোট দেখিতেছে। সহসা চারিচক্ষে মিলন, রমণী সিকন্দর শাহকে দেখিয়া মৃদুমন্দ হাসিল।

নসীর খাঁ রমণীকে দেখিতে পান নাই, তিনি সেদিকে পৃষ্ঠ করিয়া বসিয়াছিলেন। সিকন্দর শাহ নৌকার বেগ সংযত করিলেন দেখিয়া, নসীর খাঁ উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে?

সিকন্দর শাহ কহিলেন, কিছুই না। বাড়ীও আর বেশী দূর নয় সেইজন্য নৌকার বেগ মন্দীভূত করিয়াছি।

মুক্ত গবাক্ষপথে রমণীকে দেখিয়া সিকন্দর শাহ নৌকার গতি

সংযত করিয়াছিলেন সে-কথা প্রকাশ করিলেন না। নসীর খাঁকে উঠিতে দেখিয়াই যুবতী গবাক্ষ হইতে সরিয়া গিয়াছিল। সিকন্দর শাহ বুঝিলেন, রমণী কেবল তাঁহাকেই দেখা দিয়াছিল। নৌকা হইতে দুই জনে যখন নামিলেন তখন সিকন্দর শাহ কিছু অন্যমনস্ক।

৯

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সিকন্দর শাহ বলিলেন, আমি একটু বাগানে ঘুরিয়া বেড়াই।

নসীর খাঁ বলিলেন,—অধিক দূরে যাইবেন না। পকেটে পিস্তল আছে ত? আর আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনি একা কোথাও যাইবেন না, রুস্তমকে সঙ্গে রাখিবেন।

দিনের বেলা সব কুকুর বাধা থাকিত। সিকন্দর শাহ আদেশ করাতে মোটর চালক রুস্তমকে খুলিয়া দিল। সিকন্দর শাহ ডাকিতেই তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

সিকন্দর শাহ বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে গেলেন। সিকন্দর শাহ সচ্চরিত্র যুবক, মহৎ বংশের সন্তান, বিনয়ী, লজ্জাশীল। তাহা হইলেও যৌবনের স্বভাবিক চঞ্চলতা কিরূপে অতিক্রম করিবেন? রমণী রূপসী, যুবতী, সিকন্দর শাহকে দেখিয়া মুচকিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু পাছে নসীর খাঁ তাহাকে দেখিতে পান এই আশঙ্কায় সরিয়া গিয়াছিল। সিকন্দর শাহও তাহাকে ভাল করিয়া দেখেন নাই, একবার চকিতের মত দেখা। এখন তাঁহার মনে কিছু কৌতূহল, কিছু চক্ষের অতৃপ্তির লালসা। আর একবার কি তাহাকে দেখিতে পাইবেন?

সিকন্দর শাহ্ কাহাকেও কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। রমণী কে, তাহা নসীর খাঁ না জানিতে পারেন, কিন্তু বাড়ী কাহার, কে সেখানে বাস করে তাহা নিঃসন্দেহই জানিতেন। সিকন্দর শাহ্ তাঁহাকে কিংবা বাড়ীর অপর কোনো লোককে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যথার্থ পক্ষে গোপন করিবার কিছুই ছিল না অথচ সিকন্দর শাহের বিবেচনায় তৃতীয় ব্যক্তিকেও কোনো কথা বলা যায় না।

নদীর ধার দিয়া সিকন্দর শাহ্ যে বাড়ীতে রমণীকে দেখিয়াছিলেন সেইদিকে গমন করিলেন। রুস্তম কুকুর তাঁহার সঙ্গে ছিল। সেই বাড়ীর নিকট উপনীত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। নীচেকার দরজা জানালা বন্ধ, দেখিয়া মনে হয় সে বাড়ীতে কাহারও বাস নাই। সিকন্দর শাহ্ ভাবিতেছিলেন যদি কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি বলিবেন? কিন্তু কোথাও জনমনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। যে গবাক্ষের সম্মুখে রমণী দাঁড়াইয়া ছিল সিকন্দর শাহ্ সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন, জানালা বন্ধ। সেটা বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগ, বাড়ীতে প্রবেশ করিবার দরজা অন্যদিকে। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া কিছু নিরাশ হইয়া সিকন্দর শাহ্ ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় সেই গবাক্ষ ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। গবাক্ষপথে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই রমণীমূর্ত্তি!

সিকন্দর শাহ্ নির্নিমেষনয়নে সেই রূপের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। আলুলায়িতকুন্তলা, কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ পৃষ্ঠে বক্ষে পড়িয়াছে, অনিন্দিত আনন বেষ্টন করিয়াছে। আয়ত চক্ষের অলস দৃষ্টি সিকন্দর সাহের মুখের দিকে। আবার চক্ষে চক্ষে মিলিল, আবার সুন্দরী বিকচ কমলের ন্যায় স্মেরমুখী, ঈষন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের মধ্যে মুক্তাপঙ্‌ক্তির ঈষৎ বিকাশ। দৃষ্টির তরলতায় অপূর্ব্ব মোহিনী।

বেশ কিছু শিথিল, মস্তকের ওড়না সরিয়া গিয়াছে, কণ্ঠ অনাবৃত। গবাক্ষ হইতে অল্প মুখ বাড়াইয়া রমণী দক্ষিণ হস্ত জানালার উপর রাখিল। কোমল চম্পক অঙ্গুলি, অর্দ্ধেক বাহু, দেখা যাইতেছে। মসৃণ, ললাম, বলয়িত বাহু সর্ব্বাঙ্গে স্তরে স্তরে লাবণ্য পুঞ্জীকৃত, রূপের পূর্ণতায় অলক্ষ্যে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সিকন্দর শাহের চক্ষু নমিত হইল।

আবার তিনি উর্দ্ধমুখ হইয়া রমণীকে চাহিয়া দেখিলেন। মুখের হাসি আর একটু ফুটিয়াছে, চক্ষের আকর্ষণী আর একটু প্রবল। ধীরে ধীরে রমণী বক্ষের বস্ত্রের ভিতর হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী বাহির করিয়া সেই কাগজে জড়াইয়া সিকন্দর শাহের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

সিকন্দর সাহ তুলিয়া লইয়া পড়িলেন—আজ সন্ধ্যার পর শিরীষ গাছের তলায়।

সিকন্দর শাহ উপরে চাহিলেন। রমণী অঙ্গুলি দিয়া বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। বাগানের একপাশে একটা বড় শিরীষ গাছ, তাহাতে ফুল ভরিয়া আছে, তাহার আশেপাশে ছোট ছোট গাছপালায় অন্ধকার।

আংটী, সোনার সিল আংটী, কোনো অক্ষর বা নাম নাই। সিকন্দর শাহ আংটী তুলিয়া ধরিলেন। রমণী হাত দিয়া সঙ্কেত করিল, এখন থাকুক।

রমণী মস্তক অবনত করিয়া বিদায় জ্ঞাপন করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে, অঙ্গুলিসঙ্কেতে সিকন্দর শাহকে আকুলিত করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের আমন্ত্রণে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া, ধীরে ধীরে গবাক্ষ রুদ্ধ করিল।

সিকন্দর শাহ গৃহের অভিমুখে ফিরিলেন, এক হস্তে অভিসারিকার নিমন্ত্রণ, অপর হস্তে অঙ্গুরীয় নিদর্শন !

—১০—

সেইদিন বৈকালে দুইখানা মোটর করিয়া সুলেমান শাহ ও বংশীলাল নসীর খাঁর বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছয়জন লোক, সকলেই সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছেন।

নসীর খাঁ সসম্ভ্রমে সুলেমান শাহকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আপনি কৃপা করিয়া আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আমার পরম সৌভাগ্য।

সুলেমান শাহ নসীর খাঁর পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া কহিলেন,—আমি আমার কথা-মত আসিয়াছি। তোমার কুকুর দেখাও।

সুলেমান শাহ সিকন্দর শাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—তোমাকে বেশ ভাল দেখিতেছি। আজ আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে কি ?

সিকন্দর শাহের চক্ষু উজ্জ্বল, মুখ উৎফুল্ল। ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিতেই তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিলেন,—যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে আরও দিন-কয়েক এখানে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

নসীর খাঁ হাসিয়া বলিলেন,—উনি নৌকায় ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন, আজই একবার গিয়াছিলেন।

সুলেমান শাহ কিছু উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোনো আশঙ্কা নাই ? জলে শত্রু-ভয় নাই ?

—কিছুমাত্র না। আমার মোটর-বোট, কাছাকাছির মধ্যে আর কাহারও. ওরকম নৌকা নাই। কোনো নৌকা আমার বোটকে ধরিতে পারে না।

সিকন্দর শাহ সুযোগ পাইয়া বলিলেন—নদীতে বেড়াইলে শরীর ভাল থাকে, আমি প্রতিদিন বোটে বেড়াইব।

সুলেমান শাহ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তোমার কোনো চিন্তা নাই, আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব না, তোমার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাক।

সিকন্দর শাহের মুখ আবার আনন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যুক্তকরে পিতৃব্যকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

নসীর খাঁ কহিলেন, আমার একটি নিবেদন আছে, অনুমতি হইলে জানাইতে পারি।

সুলেমান শাহ কহিলেন,—স্বচ্ছন্দে বল, সঙ্কোচ কিসের ?

—যদি কৃপা করিয়া রাত্রে এখানে আহার করেন—

—এই কথা ! তোমার গৃহে আহার করিব ইহা ত অনন্দের কথা।

নসীর খাঁ বংশীলালের দিকে ফিরিলেন, কহিলেন,—শেঠ-সাহেব, আপনাকে কি বলিব ?

বংশীলাল কহিলেন,—আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই, আমি আহার করিয়া আসিয়াছি। আমাদের রাত্রিকালে আহার করা নিষিদ্ধ।

নসীর খাঁ সুলেমান শাহকে বলিলেন,—কুকুরগুলা এইখানে আনিতে বলিব ?

—না, না, চল, আমরা গিয়া দেখিব।

সকলে বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। নসীর খাঁর আদেশক্রমে কুকুর চারিটাকে খুলিয়া দিল। রুস্তম একেবারে সিকন্দর শাহের নিকট লাফাইয়া আসিল, আর কয়েকটা কুকুর অপর লোক দেখিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, আবার নসীর খাঁর ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিল।

সুলেমান শাহ কুকুরগুলিকে উত্তমরূপে দেখিয়া বলিলেন,—এই জাতের কুকুর এদেশে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক দিন পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম। এমন বলবান কুকুর কখন দেখি নাই। তোমার এই চারিটা কুকুর দশজন প্রহরীর সমান। ইহাদের আর একটা বড় গুণ, বড়-একটা ডাকে না, চোর কিংবা অপর লোক দেখিলে নিঃশব্দে আক্রমণ করে, কিন্তু যাহাকে ধরে তাহার রক্ষা নাই।

নসীর খাঁ কহিলেন,—আমি ইহাদিগকে শিখাইয়াছি সহজে কাহাকেও প্রাণে মারে না, ফেলিয়া দিয়া চাপিয়া ধরে। সে-রাত্রেও তাহাই করিয়াছিল, তবে যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে কিংবা এ বাড়ীর কাহাকেও আক্রমণ করে তাহাকে দেখিতে পাইলে মারিয়া ফেলিতে পারে।

সুলেমান শাহ বাগানে, নদীর ধারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, আর সকলে তাঁহার পশ্চাতে। একবার মোটর-বোট দেখিলেন, নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—নৌকায় আর একদিন বেড়াইতে যাইবেন, আজ নয়।

কথা কহিতে কহিতে সুলেমান শাহ, সিকন্দর শাহ, বংশীলাল ও নসীর খাঁ কিছু অগ্রসর হইয়া গেলেন, আর সকলে পিছনে পড়িল। সুলেমান শাহ বলিলেন,—আর অধিক সময় নাই, শত্রু প্রাণপণে ঐ জিনিষগুলির সন্ধান করিতেছে, যদি না পায় তাহা হইলে হয়ত ক্রোধান্ধ

হইয়া আমাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে। আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমার বিশ্বাস, যতদিন তাহারা ঐ তিনটি সামগ্রী না পায় ততদিন আমাদের প্রাণের আশঙ্কা নাই; কিন্তু যদি নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া যায় আর তাহাদের অনুসন্ধান নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে রাজ্য ত তাহাদের হইবেই না, কিন্তু আমাদিগকে হত্যা করিলে তাহাদের ক্রোধের উপশম হইবে।

নসীর খাঁ বলিলেন,—এই তিনটি প্রমাণ লইয়া আপনিই কেন মোবারক শাহের নিকট যান না?

—তাহা হইলে পথে আমাদিগকে নিঃসন্দেহ মারিয়া ফেলিবে। যদি কোনোরূপে আমরা মোবারক শাহের নিকট যাইতে পারি, তাহা হইলেই বা কি হইবে? যদি তাঁহার নিকট সৈন্যবল প্রার্থনা করি, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, বলিবেন, তোমার রাজ্য তুমি রক্ষা করিতে পার না? এই কয়দিন বলপ্রকাশের কোনো চেষ্টা হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা একদণ্ডও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না। প্রতিদিন তাহারা নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আপাততঃ সকল চেষ্টা গোপনে হইতেছে, প্রকাশ্যরূপে বল প্রকাশ করিবে না। কতক লোক আমাদের বিপক্ষে হইলেও অনেক আমাদের স্বপক্ষে, সুতরাং অনেক লোকবল লইয়া এখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না। অনেকবার অন্বেষণ করিয়া কিছু পায় নাই। তোমাদের দুইজনের বাড়ীতে খুঁজিবার চেষ্টা করিয়া ঠকিয়াছে। এখন কি করিবে?

বংশীলাল বলিলেন,—তাহাই যদি না জানা যাইবে তাহা হইলে এত আশঙ্কা থাকিবে কেন? বিপদ যদি পূর্ব্বে জানিতে পারা যায় তাহা হইলে উদ্ধার হইবার উপায় করা যায়, কিন্তু আমরা ত কিছু জানিতে

পারিতেছি না। সুতরাং সর্ব্বদা সাবধান থাকা ছাড়া আমরা কি করিতে পারি ?

নসীর খাঁ বলিলেন,—আমাদের পক্ষ হইতে কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে শত্রুপক্ষের প্রধান লোকেরা আমাদের পক্ষ অবলম্বন করে। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে আর বিশেষ আশঙ্কা থাকিবে না। তবে এই সময় আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে, কারণ দিন-কয়েকের মধ্যে একটা কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। নসীর খাঁ সুলেমান শাহ্‌কে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা আর একটা ঘরে বসিল। সিকন্দর শাহ্ কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন,—তাহার পর এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে অপরের অলক্ষ্যে পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

—১১—

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী রাত্রি, সন্ধ্যার পরেই গাঢ় অন্ধকার করিয়া আসিল। বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই সিকন্দর শাহ্ দ্রুতপদে নদীতীরে উপনীত হইলেন। নদীর ধার দিয়া সঙ্কেতস্থানে গমন করিলেন।

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, রুস্তম তাঁহার পিছনে আসিতেছে। সিকন্দর শাহ্ গোপনে একা যাইতেছিলেন, সঙ্গে কুকুর লইয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। রুস্তমকে তিনি হাত নাড়িয়া ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, মুখে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর আর কেহ শুনিতে পায়। রুস্তম দাঁড়াইল, ফিরিয়া গেল না।

সিকন্দর শাহ মাটির ঢেলা তুলিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রুস্তম কিছু পিছাইয়া গেল কিন্তু সিকন্দর শাহ আবার যেমন অগ্রসর হইলেন অমনি গাছের আড়ালে আড়ালে তাঁহার পশ্চাতে চলিল, সিকন্দর শাহ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

শিরীষ গাছের তলায় গিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই শুষ্কপত্রের ক্ষীণ মর্ম্মর শব্দ হইল, লঘু পদক্ষেপে তরুণী ছায়াময়ী মূর্ত্তির মত সিকন্দর শাহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে তাহার মুখ ও অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দ্রুত আগমনের জন্য বা অন্য কারণে নিঃশ্বাস কিছু বেগে বহিতেছে, ওষ্ঠাধর কিছু মুক্ত, বক্ষে কিছু চঞ্চলতা। মস্তকের ওড়না স্রস্ত হইয়া কটিদেশে পড়িয়াছিল, তুলিয়া মাথায় দিবার সময় রমণীর হাত সিকন্দর শাহের হাতে ঠেকিল। সিকন্দর শাহ তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার হাতের ভিতর রমণীর ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব ঈষৎ কাঁপিতেছিল, অঙ্গুলিতে অঙ্গুলির ঈষৎ চাপ পড়িতেছিল। রমণী অতি মৃদুস্বরে, তরুপল্লবে মর্ম্মরিত বসন্ত-বাতাসের ন্যায় কহিল, আমি এমন করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতেছি, না জানি তুমি কি মনে করিবে!

সিকন্দর শাহ কহিলেন,—আমি মনে করিতেছি আমার তুল্য কেহ ভাগ্যবান নাই। তোমার মত সুন্দরী আমি কখন দেখি নাই, কখন কোনো রমণীর অঙ্গস্পর্শ করি নাই।

যুবতী হাসিল। হাসির চাপা শব্দ সিকন্দর শাহের শ্রবণে জলতরঙ্গ বাজনার মত মধুর শুনাইল। রমণী কহিল,—তাহা হইলে তোমাকে অত্যন্ত কঠোর শাসনে থাকিতে হয়?

—কই না। আমি অত্যন্ত স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছি। শাসন বংশ-প্রথার। তরুণ বয়সের চাঞ্চল্য আমাকে সংযম করিতে হয়।

যুবতী আবার হাসিয়া সিকন্দর শাহের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল, বলিল,—আর এখন ?

—এখন আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি, একমাত্র তোমার শাসন মানি।

—আমি কে, তাহা ত তুমি জান না, অপরিচিতার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছ।

—তোমার রূপই তোমার পরিচয়। অপর পরিচয় দেওয়া-না-দেওয়া তোমার ইচ্ছা।

—তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব ? না, বিনা পরিচয়ে আমাদের সম্ভাষণ হইবে ?

—তাহাও তোমার ইচ্ছা। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবে আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত।

—যুবরাজ সিকন্দর শাহকে কে না জানে ? বলিয়া রমণী সিকন্দর শাহের কণ্ঠলগ্ন হইল।

যুবতীর পশ্চাতে শুষ্কপত্রে পদশব্দ হইল। সিকন্দর শাহ তাহার স্কন্ধের পার্শ্ব দিয়া দেখিলেন, একব্যক্তি দ্রুতপদক্ষেপে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে, নক্ষত্রালোকে তাহার হাতের ছুরি একবার ঝলসিত হইল।

রমণীও মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, ভীত উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল,—ইঁহাকে আঘাত করিতে পাইবে না, আঘাত করিবার কোনো কথা হয় নাই।

সে-ব্যক্তি দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া অনুচ্চ কঠোরস্বরে কহিল, —তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও। তোমার কর্ম্ম তুমি করিয়াছ, আমার প্রতি যেমন আদেশ হইয়াছে আমি পালন করিব।

সিকন্দর শাহ রমণীর বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পাছে রমণীর অঙ্গে আঘাত লাগে এই ভয়ে অধিক বল প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রমণীও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—মারিতে হয় আমাকে মার, ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পাইবে না।

সে ব্যক্তি কহিল,—তোমার শাস্তি পরে হইবে। এই বলিয়া ছুরি তুলিয়া অগ্রসর হইল।

সহসা তাহার পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দে ব্যাঘ্রের ন্যায় একটা জন্তু এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিল। সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল, হাতের ছুরি তাহার মুষ্টিমুক্ত হইয়া দূরে পড়িল। সে একবার চীৎকার করিয়াই স্তব্ধ হইল।

রুস্তম সিকন্দর শাহের অলক্ষ্যে তাঁহার পিছনে আসিয়া একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। রমণীকে আসিতে দেখিয়া কিছু করে নাই। ছোরা-হস্তে আক্রমণকারীকে দেখিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি সিকন্দর শাহকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেই তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। এবার তাহাকে শুধু ফেলিয়া দিয়া রুস্তম ক্ষান্ত হইল না। বিড়ালে যেমন ইঁদুর ধরে সেইরূপ সে ব্যক্তির টুঁটি ধরিয়া, কয়েকবার ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে হত্যা করিল।

রমণী ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। সিকন্দর দেখিলেন, অন্ধকারে আরও কয়েকজন লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে রমণীকে ঘাসের উপর শয়ন করাইয়া শিরীষ গাছের আড়ালে লুকাইলেন। রুস্তম মৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আরও লোক আসিতেছে দেখিয়া একবার ডাকিল। অতি গম্ভীর শব্দ। তাহার ডাক শুনিয়া যাহারা আসিতেছিল তাহারা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল।

সিকন্দর শাহ পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন পকেটে পিস্তল রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিয়া আনেন নাই, সর্ব্বদাই তাঁহার পকেটে থাকিত, বাহির করিয়া রাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে রুস্তম বলিয়া ডাকিতেই কুকুর তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাঁচ ছয়জন লোক ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। শব নাড়াচাড়া করিতে একজনের হাতে রক্ত লাগিল, সে বলিয়া উঠিল, ইহার গলা কাটিয়া দিয়াছে!

তাহাদের পিছনে কিছু দূরে আর একজন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটাছুটি করিতেছিল না। সে বলিল,—আমার হুকুম তোমাদের মনে নাই? সিকন্দর শাহ এখানেই কোথাও আছে, তাহাকে জীবিত হউক, মৃত হউক, আমার নিকটে লইয়া আইস।

মৃত ব্যক্তি ও মূর্চ্ছিতা রমণীকে ছাড়িয়া অপর লোকেরা সিকন্দর শাহকে খুঁজিতে লাগিল। একজন গাছের পিছনে গিয়া বলিল,—এই যে, এখানে লুকাইয়া আছে!

অমনি পিস্তলের শব্দ হইল। যে কথা কহিয়াছিল সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তাহার পশ্চাতে আর একজন, রুস্তম এক লাফে তাহার টুঁটি ধরিয়া তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল।

—১২—

সুলেমান শাহ, বংশীলাল ও নসীর খাঁ একটা ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। সুলেমান শাহ বলিলেন,—শত্রু এখন কি করিবে তাহা না জানিতে পারিলেও আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে-কয়টা সামগ্রীর সন্ধান করিতেছে তাহা না পাইলে কি করিবে?

নসীর খাঁ কহিলেন,—হুসেন শাহ আপনার রাজ্য অপহরণ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। মোবারক শাহকে সে তিনটি জিনিষ দেখাইতে না পারিলে তিনি তাহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন না, হয়ত বিদ্রোহী বলিয়া তাহাকে ধৃত করিবেন। সময়ও আর অধিক নাই। হুসেন শাহ গোপনে আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া উৎপীড়ন করিতে পারে। আপাততঃ হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে না।

সুলেমান শাহ বলিলেন,—আমারও তাহাই মনে হইতেছে।

বংশীলাল বলিলেন,—এই অনুমান সঙ্গত বিবেচনা হয়। সেইজন্য আমি আরও কয়েকজন বলবান লোককে নিযুক্ত করিয়াছি। শত্রু সহসা আপনাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল,—আহার প্রস্তুত।

সুলেমান শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিকন্দর কোথায়?

নসীর খাঁ উত্তর করিলেন,—বোধ হয় পাশের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।

নসীর খাঁ উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, পাশের ঘরে ছয়জন লোক বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিকন্দর শাহ কোথায়?

তাহাদেব মধ্যে একজন বলিল,—তিনি একবার এঘরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে ত বসেন নাই। অনেকক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছেন।

চারিদিকে খোঁজ পড়িল, নসীর খাঁ ও বংশীলাল কয়েকবার সিকন্দর শাহের নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—কোনো উত্তর নাই। সুলেমান শাহ ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমরা যে আশঙ্কা করিতেছিলাম, হয়ত তাহাই ঘটিয়াছে।

নসীর খাঁ একটা টানা খুলিয়া কয়েকটা বিদ্যুতের পকেট-মশাল বাহির করিয়া সুলেমান শাহ, বংশীলাল ও অপর লোকের হাতে দিলেন, একটা নিজে লইলেন। সকলের কাছে অস্ত্র ছিল।

বাড়ীর বাহিরে তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, মোটরচালক ও অপর ভৃত্যেরা জড় হইয়াছে। কুকুর তিনটাও সেই সঙ্গে আসিয়াছে।

নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিকন্দর শাহকে তোমরা বাগানে বেড়াইতে কিংবা ফটকের বাহিরে যাইতে দেখিয়াছ ?

সিকন্দর শাহকে কেহই দেখে নাই।

সকলে নদীতীরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অকস্মাৎ পুরুষ-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ ও তাহার পরেই নারী-কণ্ঠের চীৎকার শ্রুত হইল। মুহূর্ত্তকাল পরেই কুকুরের গম্ভীর ডাক। নসীর খাঁ বলিলেন—রুস্তম! আর তিনটা কুকুর রুস্তমের গলা শুনিয়া তীরের মত সেইদিকে ছুটিয়া গেল। নসীর খাঁ ও আর সকলে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। সুলেমান শাহ তরুণবয়স্ক না হইলেও যুবকের ন্যায় বেগে চলিলেন।

চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। নসীর খাঁ আর সকলকে ছাড়াইয়া আগে ছুটিলেন, তাঁহার পরেই সুলেমান শাহ। আর সকলে ঠিক তাঁহাদের পশ্চাতে, কেবল বংশীলাল মোটা বলিয়া কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। নসীর খাঁ হাঁকিলেন,—যুবরাজ, আপনি কোথায় ?

শিরীষ গাছের তলা হইতে সিকন্দর শাহ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—এই দিকে! এই দিকে!

নসীর খাঁর বাম হস্তে মশাল ছিল, কল টিপিতেই আলোক জ্বলিয়া উঠিল। দক্ষিণ হস্তে পিস্তল। তাঁহার দেখাদেখি আর সকলে মশাল জ্বালিল। উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

নসীর খাঁ দেখিলেন, সিকন্দর শাহ পিস্তল-হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কোথাও আঘাত লাগে নাই ত ?

সিকন্দর শাহ কিছু লজ্জিতভাবে কহিলেন,—না, আমার কোথাও আঘাত লাগে নাই।

নসীর খাঁ ও বংশীলাল মশাল ঘুরাইয়া দেখিলেন, তিনজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক মাটিতে পড়িয়া আছে, কুকুরগুলা সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে, রুস্তম সিকন্দর শাহের পাশে। আর তিনজন লোক পলায়ন করিতেছে। কিছু দূরে একখানা প্রকাণ্ড মোটর, তাহার এঞ্জিনের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। একবার মোটরে উঠিতে পারিলে এই তিন ব্যক্তিকে আর পাওয়া যাইবে না।

সুলেমান শাহ কোনো কথা কহেন নাই, সিকন্দর শাহকেও কিছু বলেন নাই। যে তিন ব্যক্তি পলায়ন করিতেছিল মশালের আলোকে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি সবেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

নসীর খাঁ কহিলেন,—আপনি কেন যাইতেছেন, আমাদিগকে আদেশ করিলেই হইবে।

সুলেমান শাহ থামিলেন না, নসীর খাঁও তাঁহার সঙ্গে দৌড়িলেন।

তিনজনের মধ্যে একজন আগে যাইতেছিল, তাহার অঙ্গে বহুমূল্য পোষাক। সে যেমন মোটরে উঠিবে অমনি সুলেমান শাহ তাহাকে গুলি করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল, অর্দ্ধেক শরীর গাড়ীর ভিতর, অর্দ্ধেক বাহিরে। আর দুইজন টানাটানি করিয়া তাহাকে মোটরে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুলেমান শাহ আর পিস্তল ছুঁড়িলেন না। নসীর খাঁ দৌড়িয়া

গিয়া একটা চাকা লক্ষ্য করিয়া দুই তিনটা গুলি চালাইলেন, ঘোর শব্দে মোটরের টায়ার ফাটিয়া গেল।

পিছন হইতে আরও লোক ছুটিয়া আসিল। মোটরচালক ও আর দুইজন বন্দী হইল। যাহার গুলি লাগিয়াছিল তাহাকে নীচে নামাইয়া সকলে দেখিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সুলেমান শাহ মৃত ব্যক্তির মুখে মশালের আলোক ধরিয়া নসীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—চিনিতে পার?

নসীর খাঁ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—হুসেন শাহ!

—১৩—

বাড়ীর ভিতর কাহাকেও খুজিয়া পাওয়া গেল না। যে তিনজন ধরা পড়িয়াছিল নসীর খাঁর আদেশমত তাহারা হুসেন শাহের মৃতদেহ বহন করিয়া শিরীষ গাছের তলায় লইয়া গেল। সেখানে তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন মৃত আর দুইজন আহত। রমণী মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উঠিয়া বসিয়াছে। সুলেমান শাহ কহিলেন,—লাশ নদীতে ফেলিয়া দাও, আর সব বন্দীকে নসীর খাঁর বাড়ীতে লইয়া চল।

এ পর্য্যন্ত সিকন্দর শাহকে কেহ কোনো কথা বলে নাই, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, তিনিও নীরব ছিলেন। নসীর খাঁর বাড়ীতে উপনীত হইয়া সুলেমান শাহ সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিজেন,—কি হইয়াছিল? তুমি কেমন করিয়া ওখানে গিয়াছিলে?

সিকন্দর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রমণী কহিল,—জাঁহাপনা! যুবরাজের কোনো অপরাধ নাই, আমি একা অপরাধিনী। আমি উঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। শাস্তি আমাকে দিন্।

সিকন্দর শাহ কহিলেন,—ইনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। ইনি না থাকিলে আমি নিহত হইতাম।

সুলেমান শাহ রমণীকে বলিলেন,—তুমি কে, সকল কথা খুলিয়া বল।

রমণী কহিল,—আমার পিতা-মাতা হুসেন শাহের আশ্রিত, তাঁহার আজ্ঞা আমরা সকলেই পালন করি। আপনারা এখানে আসিবার পরেই হুসেন শাহ গোপনে এখানে আসেন। আমরা কয়েকজন সেই সঙ্গে আসি। যুবরাজ এখানে আসিয়াছেন জানিয়া আমরা পাশের বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। হুসেন শাহের আদেশানুসারে আমি যুবরাজকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়াছিলাম। হুসেন শাহ আমাকে শপথ করিয়া বলেন,—তিনি যুবরাজের কোনো অনিষ্ট করিবেন না, তাঁহাকে বন্দী করিলেই আপনি রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন। যুবরাজের কোনোরূপ আশঙ্কা আছে জানিতে পারিলে আমি তাঁহাকে বিপন্ন করিতে স্বীকার করিতাম না। আমার আপরাধ আমি স্বীকার করিতেছি। আপনার যেমন অভিরুচি হয়, আমার শাস্তি বিধান করুন।

সিকন্দর শাহ কহিলেন,—সকল কথা ইনি বলেন নাই। হুসেন শাহের লোক যখন ছোরা দিয়া আমাকে আক্রমণ করে, সে-সময় ইনি নিজের অঙ্গ দ্বারা আমাকে রক্ষা করেন। সে লোকটাকে রুস্তম মারিয়া ফেলে।

নসীর খাঁ রুস্তমের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—সাবাস রুস্তম!

সুলেমান শাহ বন্দীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের কি বলিবার আছে?

—আমাদের প্রতি আদেশ ছিল যুবরাজকে বন্দী করিতে, হত্যা করিতে নয়। সেইজন্য বড় মোটর আনা হয়। কুকুর দেখিয়া হুসেন

শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—যুবরাজকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় যেমন করিয়াই হউক ধরিতে হইবে।

সুলেমান শাহ কহিলেন,—যে প্রকৃত অপরাধী আমি স্বহস্তে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া আমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছি। বংশীলাল, ইহাদের কি দণ্ড হওয়া উচিত?

—ইহাদের পক্ষে কারাদণ্ড যথেষ্ট।

—তাহাই হইবে। আর এই রমণীর কি শাস্তি হইবে? ইহার কৌশলেই ত যুবরাজের বিপদ হয়।

কেহ কোনো কথা কহিল না, কেবল সিকন্দর শাহ কিছু বেগের সহিত বলিলেন,—এই রমণী না থাকিলে আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতেন না, সে-কথা আপনি শুনিয়াছেন।

সুলেমান শাহ স্মিতমুখে কহিলেন,—অর্থাৎ তোমাকে বিপদে ফেলিয়া তাহার পর আরও কঠিন বিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছে। তাহা হইলে ইহার লঘু দণ্ড হওয়া উচিত।

এবার সিকন্দর শাহও নীরব, শুধু রমণী কথা কহিল, বলিল,—আমার অপরাধ গুরুতর, আমাকে গুরুদণ্ড দিতে আদেশ হউক।

সুলেমান শাহ রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর সিকন্দর শাহের অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। রমণীর মুখে ভয়ের চিহ্ন নাই, চক্ষের দৃষ্টি কঠিন, সিকন্দর শাহের মুখ ম্লান, হস্তের অঙ্গুলি কাঁপিতেছে।

সুলেমান শাহ রমণীকে বলিলেন,—হুসেন শাহ নাই, আমার আশ্রয়ে তুমি থাকিলে তোমার বাপ-মার কোনো আপত্তি আছে?

রমণী বাক্‌শূন্য হইল, বিস্ফারিত স্থির নয়নে সুলেমান শাহের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুলেমান শাহ হাসিয়া বলিলেন,—এখন তুমি শাহজাদীদের মহলে থাকিবে, তাহার পর প্রয়োজন হইলে তোমার নিজের মহল হইবে।

সুলেমান শাহ সিকন্দর শাহের প্রতি কৌতুকপূর্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। রমণী কাঁদিয়া সুলেমান শাহের পা জড়াইয়া ধরিল। সুলেমান শাহ তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, কহিলেন,— আহারাদির পর তোমাকে মহলে পাঠাইয়া দিব। তুমি যুবরাজ সিকন্দর শাহের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, উনি মহলে তোমার বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

বন্দীদিগের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দাও। ইহাদের সহিত আমার কোনো বিবাদ নাই।

সিকন্দর শাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য সুলেমান শাহের করচুম্বন করিলেন।

রমণীকে আহারের নিমিত্ত আর একটা ঘরে লইয়া গেল। সিকন্দর শাহ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় রমণী ফিরিয়া দেখিল সিকন্দর শাহ তাহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে ধারণ করিলেন।

না জলে, না স্থলে

পেন্সন আর পিঞ্জরাপোল দুইটা জিনিষ একই, তফাৎ এই যে, একটা দ্বিপদের জন্য, অপরটা চতুষ্পদের জন্য। বৃদ্ধ বয়সে সকল জানোয়ারের পিঞ্জরাপোলে স্থান হয় না, বুড়া হ'লে সব মানুষের ভাগ্যে পেন্সন জোটে না। সে হিসাবে যদি ধর তা হ'লে আমি ভাগ্যবান, কেন-না আমি যে জলজীয়ন্ত বেঁচে আছি, মাসে মাসে তার একখানা সার্টিফিকেট যোগাড় করে' পেন্সনের টাকা নিয়ে আসি। কিন্তু তার থেকে যখন ইন্‌কাম ট্যাক্স কেটে নিত, তখন আমার মনে হ'ত আমার উপর এটা ভারি জুলুম হচ্চে।

গবর্মেণ্টের উপর আমার রাগের এইটে প্রধান কারণ কিন্তু পিঞ্জরাপোলে ঢুকে শিং দিয়ে গুঁতোবার চেষ্টা করা কিংবা জোয়ান জানোয়ারের মতো তিড়িংমিড়িং করে' লাফানো যেমন ভুল, পেন্সনভোগীর পক্ষে তেড়েমেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়া সেই রকম ভুল। বয়স হ'লে হাতপায়ের গাঁটে গাঁটে যেমন বাত ধরে, মনের গাঁটগুলোও সেই রকম বেতো হয়ে পড়ে।

সে কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল আমার।

পেন্সন পাবার পূর্ব্বে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলুম। কয়েক-জন বন্ধু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন রায় বাহাদুর আর রাজা বাহাদুর সমান, কেন-না রায় মানে রাজা। নতুন উপাধি একখানা তক্তায় লিখিয়ে বাড়ীর দরজা-গোড়ায় ঝুলিয়ে দিলুম। বাড়ীতে ঢুক্‌তে, বাড়ী থেকে বেরুতে সে লেখা আমার চোখে পড়্‌ত—রায় ভোলানাথ মিত্র বাহাদুর। বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যে যেত তার নজরে সেটা ঠেক্‌ত।

আমার জানা একটি লোক রায় বাহাদুর হয়েছিল, তাকে নাম ধরে' ডাক্‌বার জো ছিল না, কেউ রায় বাহাদুর না বল্‌লে চটে' লাল হ'ত। আমার ততটা না হোক্ রায় বাহাদুর বললে যে শুন্‌তে ভাল লাগ্‌ত সে কথা কেমন করে' অস্বীকার করব ?

কোন্ সময় যে লম্বা নামওয়ালা একটা আন্দোলনের বন্যা দেশে এসে পড়্‌ল তা বুঝতেই পারা গেল না। অভিধানে ননকোঅপারেশনের জোড়াতাড়া দিয়ে একটা মানে পাওয়া যায়, কিন্তু কে কার সঙ্গে যে ননকোঅপারেট করে, সে একটা কঠিন হেঁয়ালী হয়ে উঠ্‌ল। গবর্মেণ্টের সঙ্গে যোগ দিতে না হ'লে সরকারী চাকরী এক ধার থেকে ছাড়তে হয়, হয়ত পেন্সন নিয়েও টানাটানি পড়ে। প্রজারা বলে, জমিদারের খাজনা দেবে না, তারপর হয়ত ধোপা-নাপিতও বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, একদিন যদি গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলে' বসেন তোমার সঙ্গে আর কোঅপারেট করব না, কাল থেকে ভাঁড়ার তুমি বের করে' দিও, তোমার সংসার তুমি দেখো—এই বলে চাবির গোছা আমার পায়ের কাছে ঝনাৎ করে' ফেলে দিয়ে যদি ফর্‌কে চলে' যান তখন আমি দাঁড়াই কোথায় ?

কয়েকজন রায় বাহাদুর তাদের সনদ ফিরিয়ে দিলে, জনকতক কবে কোথায় কি মেডেল পেয়েছিল ফেরত পাঠিয়ে দিলে। আমার রায় বাহাদুরীর ঝোলানো তক্তাখানায় লোকে অন্য রকম নজর দিতে আরম্ভ করলে। আমার বস্‌বার ঘর ঠিক রাস্তার উপর, খড়খড়ীর পাখি খুলে লোকের চলাচল দেখ্‌তাম, আর তাদের কথা জানালা বন্ধ করে' দিলেও কানে আস্‌ত। মাঝে মাঝে কথাগুলো শুন্‌তে তেমন মিষ্টি লাগত না, বিশেষ যখন ছেলে-ছোকরার দল সে-পথ দিয়ে যেত।

একজন হয়ত বল্‌লে ওরে, এই একটা রায় বাহাদুর!

—এরাই সব ধামা-ধরার দল!

—যেমন তোপটানা ঘোড়াগুলো ছাপ-মারা, তেমনি এদেরও পিঠে ছাপ!

—গরুর গলায় ঘণ্টা দেয়, এ আবার নামের গলায় ঘণ্টা!

দিন-দুইচার এই রকম শুনে শুনে একদিন সন্ধ্যাবেলা তক্তাখানা খুলে ফেলে যে-ঘরে ভাঙ্গাচোরা জিনিষপত্র ছিল, সেইখানে এক কোণে রেখে দিলুম।

—২—

যুদ্ধস্থলে একদল সৈন্য নিজেদের পতাকা নামিয়ে যদি একটা সাদা নিশান তুলে ধরে, আর তাতে যেমন তাদের পরাজয় সূচিত হয়, আমারও সেই অবস্থা হ'ল। রায় বাহাদুরীর তক্তাখানা ছিল আমার সমর-পতাকা আর সাদা পাঁচিল হ'ল সাদা নিশান। ননকোঅপারেশনের হ'ল জয়, আর আমার হ'ল পরাজয়।

দূত পাঠাবার বেলা হ'ল উল্টা রকম। যারা হারে তারাই সন্ধি করবার জন্য দূত পাঠায়, কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। আমি চুপচাপ ঘরে বসে' আছি, অন্য পক্ষ থেকে আরম্ভ হ'ল দূতের আমদানী। তাই কি এক-আধজন? কেউ বা ভগ্নদূত, কেউ হয়ত রুদ্রদূত, আবার কারুর তর্জ্জন শুনে শেষ দিনের যমদূতকে আমার মনে পড়ত। সকলেই যে অচেনা তা নয়, কেননা, দলের নামটাই নতুন, মানুষগুলা তো আর নতুন নয়! গদাধর পাকড়াসী আমাদের পাড়ার, এককালে আমার বাড়ীতে তাস খেলার আড্ডায় জুটত। সে এখন নতুন দলের একজন পাণ্ডা। আমার নামের আর খেতাবের সাইনবোর্ডের অন্তর্ধান

দেখে সে এসে হাজির। বল্‌লে, বেশ করেচ ভোলানাথ। এখন দেশের কাজে লাগো। তোমার রায়-বাহাদুরীর সনদখানা ফেরত পাঠিয়েচ ?

আমি বল্‌লাম, সে একখানা কাগজ বই ত নয়, সেখানা ফেরত দেওয়া কি নিতান্ত দরকার ?

—দরকার বই কি, তা না হ'লে ওরা কি করে' জান্‌বে তুমি আমাদের দলে এসেচ ? গবর্মেণ্টকে জানাতে হবে যে, তুমি তাদের জন্ম কেয়ার কর না।

—শেষে যদি আমার পেন্সন নিয়ে টানাটানি করে ?

—সে সাধ্য তাদের নেই। আর গেলই বা তোমার পেন্সন ? কত বড় বড় উকীল-ব্যারিষ্টার তাদের হাজার হাজার টাকার আয় ছেড়ে দিলে, আর তুমি এইটুকু ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না ?

—ও বিষয় আমি কিছু ভাবিনি।

—এতে ভাব্‌বার কি আছে ? যেমন কথা তেমনি কাজ। তোমার ঐ তক্তা নামাবার বেলা ভেবেছিলে ? আর দেখ, তোমার কাছে আমাদের আরও লোক আস্‌বে। তুমি বিলাতী ধুতি পরে' আছ কি বলে' ? বিলাতী কাপড় সব পুড়িয়ে ফেলা হচ্চে। তুমি আজই খাদি ধুতি আর জামা তৈরি কর। হয়ত কাল তোমার কাছে ডেপুটেশন আস্‌বে।

গদাধর স্বদেশী গানের সুর ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে চলে' গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে খাদি ধুতি আর খাদি পাঞ্জাবী কিনে আন্‌লাম। তার পরদিনই ডেপুটেশনের আবির্ভাব। দুএকজন ভারিক্কে লোক, বাকি সব নব্য পেট্রিয়ট। প্রথমে ত সকলে মিলে

আমার অনেক সাধুবাদ করলে, তারপর যিনি ডেপুটেশনের মুখপাত, তিনি বল্‌লেন, এই শনিবারে আমাদের একটা মিটিং আছে, আপনাকে সভাপতি হ'তে হবে।

কি বিপদ! পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে' আফিস আর ঘর করেছি, সভার আমি কি জানি? আমি বললাম, মশায়, আর কাউকে দেখুন। আমি কখনো সভায় যাইনি, আর প্রকাশ্য সভায় আমি একটা কথাও বল্‌তে পারব না।

—ও আপনার বিনয়ের কথা। সব কাজই নতুন আরম্ভ করতে হয়। আমাদের এই দল কি এতদিন ছিল? আপনাকে ত বেশী কিছু বল্‌তে হবে না, যা বলবার-কইবার আমরাই করব।

—আমাকে কি বলতে হবে তাও ত জানি নে।

—সে আর কি এমন বড় কথা! হ্যাঁ হে নিতাই, তুমি প্রেসিডেন্টের একটা স্পীচ লিখে ভোলানাথবাবুকে দিয়ে যেও ত। আপনি সেইটে মুখস্থ করে' নিলেই হবে। এখন আমরা যাচ্চি, কর মশায়ের কাছে, আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে। শনিবার বিকেল বেলা ভলণ্টিয়াররা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

ডেপুটেশন বিদায় হ'লে আমি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লাম। এককালে সেই স্কুল-কলেজের গাদা গাদা বহি মুখস্থ করতে হ'ত, আর এই বয়সে আবার বক্তৃতা মুখস্থ করতে হবে! তারপর বক্তৃতায় কি লিখে দেবে কে জানে। সেখানে সি-আই-ডি, রিপোর্টার একটি একটি কথা লিখে নেবে, আমি হয়ত প্রথমবার বক্তৃতা করেই সিডিশনের ঠেলায় পড়ি। আর তাই যদি পড়তে হয় ত পরের কথা তোতা পাখীর মত আউড়ে ধরা পড়ব কেন? সত্যি কি একটা স্পীচ আমি লিখতে

পারিনে ? চিরকাল ত লিখেই এসেচি, তখন না হয় রায় আর রিপোর্ট লিখতাম, এখন না হয় আর একটা কিছু লিখ্‌তে হবে। এতকাল গবর্মেণ্টের চাকরী করে' এখন গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। যাই হোক্ গোটাকতক কথা নোট করে' রাখ্‌লাম, সংযত ভাষায়, সংযতভাবে লিখ্‌ব বলে'।

মাঠে বেড়িয়ে সন্ধ্যার পর ফিরে এসে দেখি, নিতাই বৈঠকখানায় বসে' খবরের কাগজ পড়চে। আমি বল্‌লাম, কি নিতাইবাবু, স্পীচ লেখা হয়েচে না কি ?

—মশায়, আমাদের কি লিখ্‌তে দেরী লাগে ? স্পীচ যা লিখেচি তা শুনে সব তাক্ লেগে যাবে।

—কই, দেখি।

নিতাই পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের কর্‌লে। আমি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে বল্‌লাম, এ যে মস্ত বড় হয়েচে।

—প্রেসিডেণ্টের স্পীচ বড় হ'লে দোষ কি ? সমস্ত কাগজে রিপোর্ট হয়ে যাবে, আপনি একদিনে ফেমাস্ হয়ে পড়বেন।

মনে মনে ভাব্‌লাম লর্ড বায়রণের মতো বুঝি !

স্পীচ পড়বার চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে দেখি, এমন জড়ানো লেখা যে, দু-লাইন পড়তে গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠতে হয়। বললাম, এ লেখা আমি ভাল পড়তে পার্‌চি নে।

ফস্ করে' নিতাই আমার হাত থেকে কাগজগুলা টেনে নিলে। বললে, হ্যাঁ, আমার হাতের লেখা একটু টানা। আমি আপনাকে পড়ে' শুনাচ্ছি।

বলেই পড়তে আরম্ভ করে' দিলে। মিনিট দুইয়ের মধ্যে তার হাত-পা চালা দেখে আমি একটু সরে' বস্‌লাম। গলার চোটে বাড়ীর

ছেলেরা ছুটে এল, দরজার সাম্‌নে পথে লোক জড় হ'ল। আমি বললাম, নিতাইবাবু, এ ত মিটিং নয়, তুমি আমাকেই পড়ে' শোনাবে, রাস্তার লোককে এখন শোনাবার দরকার কি ?

—আপনি কি বলেন মশায়, স্পীচ যেমন করে' দেওয়া উচিত, সেই রকম করে' না পড়লে ভাল শোনাবে কেন ?

—তোমার মত অত জবর গলা ত আমার নেই, আর দশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলাও আমার অভ্যাস নেই।

—আচ্ছা বেশ, আমি আস্তে পড়চি।

খানিক শুনেই আমি স্থির করেছিলাম যে, আস্তে কিংবা জোরে কোনো রকমেই নিতাইকে আর পড়তে দেওয়া হবে না। বল্‌লাম, আর তোমাকে কষ্ট কর্‌তে হবে না, এর পর আমি পড়ে' নেব। একটা কথা তোমাকে জিগ্‌গেস করি, এই যে এতখানি পড়লে, এ সমস্তটা ডাহা সিডিশন নয় কি ?

—তা হ'তে পারে।

—তুমি হ'লে কি এই রকম বক্তৃতা কর্‌তে ?

—ও ত আমি আপনার জন্য লিখেচি। আমি নিজের কথা ভাবিনি।

—আমাকে ত ভাব্‌তে হয়।

—তা হ'লে আপনি ভয় পাচ্চেন ?

—খুব সাহসী বলে' আমার খ্যাতি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কি আমাকে বোকাও সাজতে হবে ? নিজের মনে যা আসে বলে' যদি ধরা পড়ি ত পড়্‌ব, আর একজনের কথা আউড়ে বিপদ ডেকে আন্‌ব কেন ?

—তা হ'লে আপনি আমার লেখা স্পীচ দেবেন না ?

—তুমি রেখে যাও, আমি ভাল করে' পড়ে' ভেবে দেখ্‌ব।

নিতাই কাগজগুলা রেখে দিয়ে, রেগে দুম্ দুম করে' সিঁড়ি নেমে চলে' গেল।

—৩—

সভাতে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ভলন্টিয়ারদের পিছনে আমি প্রবেশ কর্‌তেই চারদিকে হাততালি পড়ে' গেল। কর্ত্তৃপক্ষ থেকে একজন আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচন কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌তেই আবার হাততালি। আমি উঠে গিয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করে' বক্তৃতা আরম্ভ করে' দিলুম। প্রথম প্রথম কথা ঠেকে ঠেকে যেতে লাগ্‌ল, তারপর কোনোমতে খানিক বল্‌লুম।

নিতাইয়ের লেখা স্পীচ থেকে একটা কথাও বলিনি। আমি নিজে যেমন পেরেছিলুম একটুখানি লিখে মুখস্থ করেছিলুম। বক্তৃতা শেষ করে' যখন বসে' পড়লুম, তখন অল্প-স্বল্প হাততালি পড়ল বটে, কিন্তু শ্রোতাদের যে খুব ভাল লেগেছে তা মনে হ'ল না। অপর বক্তারা বেশ তেজের সহিত অনেক কথা বল্‌লেন। সভা ভঙ্গ হবার পর দেখি, নিতাই মুখ ভার করে' দাঁড়িয়ে আছে। দলপতিদের মধ্যে একজন আমাকে বল্‌লেন, প্রথমবারের হিসাবে আপনার বক্তৃতা মন্দ হয়নি। অভ্যাস নেই বলে' আপনাকে একটু সাম্‌লে বল্‌তে হয়েচে, আর দিন-কতক পরে খোলাখুলি সব কথা বল্‌তে পার্‌বেন।

পরের দিন খবরের কাগজে নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ হ'ল। দেশী কাগজে লিখলে, আমি খুব সাবধানে বলেছি, তবে আমার মত লোকের কাছ থেকে এর বেশী আশা করা যায় না। ইংরেজদের কাগজে লিখলে, আমার মতন লোককে এমন দলে মিশতে দেখে তারা বিস্মিত

হয়েচে। গবর্মেণ্টের কাজে আমার বেশ সুখ্যাতি ও সম্ভ্রম ছিল, আমার পক্ষে ইংরেজ-বিদ্বেষ অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। আমার স্পীচের ভাষা সংযত হ'লেও অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তার পর দিন গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছ থেকে এক চিঠি। তিনি লিখচেন—মাই ডিয়ার রায়-বাহাদুর, কাল সকাল বেলা সাড়ে দশটার সময় অনুগ্রহ করে' আমার সঙ্গে দেখা করবে।

এ কথাটা কি সকলের জানা আছে যে, উপাধিপ্রাপ্ত দেশী লোকদের চিঠি লেখবার বেলা ইংরেজরা শুধু উপাধিটাই লেখেন—নাম লেখেন না? উপাধিতে নামটা চাপা পড়ে' যায়, আর যাঁরা এ-রকম চিঠি পান তাঁরা আপ্যায়িত হন। রায়-বাহাদুর কি খাঁবাহাদুর হ'লে কি বাপ-মায়ের রাখা নামটা লোপ পেয়ে যায়? ইংরেজি উপাধির বেলা এ-রকম সম্বোধন করবার প্রথা নেই, নাইট্ হ'লে তাকে সর নাইট্ বলে' কেউ চিঠি লেখে না। নাম বাদ দিয়ে শুধু উপাধি লেখা যে বিসদৃশ, সেটা এইবার আমার চোখে ঠেক্‌ল।

নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট হাউসে হাজির হ'লেম। প্রাইভেট সেক্রেটারীর বাবু আমাকে দেখে কিছু তাচ্ছিল্যভাবে হেসে বল্‌লেন, কি রায়-বাহাদুর, আপনি না কি নতুন দলের চাঁই হয়েছেন?

আমি কিছু রুক্ষভাবে বল্‌লুম,—তাতে দোষ কি?

—জলে বাস করে' কি কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া পোষায়?

—জলটা কি কুমীরের?

এমন সময় লাল চাপকান-পরা চাপরাসী এসে বল্‌লে, সাহেব সলাম দিয়া।

গেলুম সাহেবের কাছে। সাহেব বল্‌লেন, গুড মর্ণিং, রায়-বাহাদুর, বসো।

সাহেবের সাম্‌নে একটা চেয়ারে বস্‌লুম। সাহেবের টেবিলে খান-কতক খবরের কাগজ ছিল, একখানা কাগজের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে, মুখ টিপে একটু হেসে সাহেব বল্‌লেন, এটা ত তোমার স্পীচ?

—হাঁ সাহেব।

—খুব খারাপ না হ'লেও এ তেমন লয়েল স্পীচ হয় নি। তুমি গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলে, গবর্মেণ্ট উপাধি দিয়ে তোমার সম্মান করেচেন, এখনও তুমি পেন্সন পাও। রাজবিদ্বেষীদের দলে তোমার যোগ দেওয়া উচিত নয়।

রায়-বাহাদুরীর সনদ আমার পকেটে ছিল, বের করে' টেবিলে সাহেবের সাম্‌নে রাখলুম। বললুম, এই সনদ ফেরত দিচ্চি। চিরকাল ত গবর্মেণ্টের চাকরী করেচি, বুড়া বয়সে যেটুকু পারি দেশের কাজ কর্‌ব।

সাহেব খানিকক্ষণ আমার সনদের দিকে চেয়ে রইল। তারপর রেগে বল্‌লে,—গবর্মেণ্ট যেমন পুরস্কার দেয়, অপরাধীকে সেই রকম শাস্তিও দিয়ে থাকে।

—শাস্তির জন্য প্রস্তুত আছি, বলে' আমি উঠে চলে' এলুম।

গাড়ীতে উঠে মনে হ'ল, রাগের মাথায় কাজটা ভাল করিনি ভেবে-চিন্তে কাজ করাই আমার অভ্যাস, হঠাৎ এ-রকম মরিয়া হ'য়ে ওদের চটাবার কি দরকার? গলাবাজি করে' যে সিডিশন প্রচার করে' বেড়াব তার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেন-না আমার ধাত সে-রকম নয়। আর লীডার হবারও কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না। মাঝখান থেকে লাট সাহেবের বাড়ী গিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে ঝগড়া করে' কি ফল হ'ল?

এই রকম পাঁচ রকম ভাবনায় মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। বাড়ীতে ফিরে বিকেল বেলা জলখাবার খাচ্চি, এমন সময় গৃহিণী বল্‌লেন, এ বয়সে তোমার আবার এ কি বুদ্ধি হ'ল?

—কি বুদ্ধি?

—এই হই-হই করে' কতকগুলো পাগলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো?

—দেশের উন্নতি কর্‌বার চেষ্টা কি পাগলামি?

—তা নয় ত কি? ইংরেজের সঙ্গে কি তোমরা পার্‌বে? আর তুমি চিরকাল ইংরেজের চাকরী করে' এসেচ, তুমি কোন্ মুখে তাদের বাদ সাধতে যাও?

—ইংরেজ ত আর ঘর থেকে আমাকে মাইনে দেয়নি, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেয়। আর দেশের সব টাকা তারা যে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্চে।

এতদিন ত সে-কথা তোমার মনে পড়েনি। এরি মধ্যে তোমার ভীমরতি হয়েচে। কোন্ দিন তোমায় ধরে' জেলে নিয়ে যাবে।

—তা যায় যাবে। দেশের কত বড় বড় লোককে নিয়ে গিয়েচে।

—তা হ'লে জেলে গিয়ে জাঁতা পিষে তুমিও এইবার বড়লোক হবে।

মুখ আমাকেই বন্ধ কর্‌তে হ'ল, কারণ গৃহিণীর মুখ বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাহিরের ঘরে বসে' ভাবতে লাগলুম, পেট্রিয়ট হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার। এখন পর্য্যন্ত ত কিছুই করিনি, একটা স্পীচ, তাও ফুলঝুরির মতন, তাতে তুবড়ি হাউইয়ের মতো আতসবাজি মোটেই ছিল না। তাতেই সি-আই-ডির কালো কেতাবে আমার নাম উঠেচে, বাইরে বড় সাহেবের চোখ-রাঙানি, ঘরে ভার্য্যার মুখ

ঝামটানি। আমার মতো লোকের পক্ষে পরীক্ষা বড় কঠিন হ'য়ে উঠল।

দিন কয়েক পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম হ'ল তিন মাস প্রকাশ্য সভা কোথাও হবে না, যারা এ-রকম সভা করবে কিংবা সভায় উপস্থিত থাকবে তাদের কারাদণ্ড হবে। অমনি আমার কাছে আর এক ডেপুটেশন এসে উপস্থিত, আদেশ অগ্রাহ্য করে' সভা করতে হবে, তাতে জেলে যেতে হয় সেও ভাল।

এ-রকম বাহাদুরীতে কি লাভ আমি বুঝতে পারলুম না। সভায় লোক জড় হ'য়ে বক্তৃতা আরম্ভ হ'তেই পুলিশ ধরবে জেনেশুনে মিছি-মিছি জেলে গিয়ে কি ফল? যাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন তাঁরা আমাকে বোঝালেন, এ-রকম হুকুম অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়, এ-রকম আদেশ পালন না করাই তার ঠিক প্রতিবাদ। আমার মনে হ'ল যেটুকু রয়-সয় সেইটুকু ভাল, সাধ করে' ঘর ছেড়ে জেলে বাস করায় কোন লাভ নেই। আমি সভায় যেতে অস্বীকার করলুম।

ডেপুটেশনের মুখপাত বললেন, আমরা ভেবেছিলাম আপনার সাহস আছে, দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন। সেটা আমাদের ভুল। চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাবে? ইংরেজের সামনে দাঁড়ানো রায়-বাহাদুরদের কাজ নয়।

আমি বললাম, রায়-বাহাদুরীর সনদ আমি লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ফেরত দিয়েছি।

—তা যাই করুন, কাজের বেলা আপনার সাহসে কুলিয়ে উঠচে না।

ডেপুটেশন তো রেগেমেগে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল আর আমার লাভের মধ্যে হ'ল এই যে, কোন দিক বজায় রইল না।

ধোপার কুকুরের অবস্থা হ'ল, না ঘরের, না ঘাটের। সাহেব-মহলে মুখ দেখাবার পথ ঘুচিয়ে এসেছি, বাড়ীতে গৃহিণীর মুখ তোলোপানা, অবশেষে পেট্রিয়টের দল থেকেও নাম কাটা গেল।

তার পরদিন খবরের কাগজে আমার নামে এক চিঠি, কত রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে' চিঠিতে প্রমাণ করা হয়েচে যে, যেমন চিতাবাঘের গায়ের দাগ বদলানো যায় না, সেই রকম গবর্মেণ্টের চাকরীর ছাপ কখনো মেটে না।

পুরাকালের মতো আমার কথায় যদি ধরণী দ্বিধা হ'ত তাহ'লে আমি ভূগর্ভে প্রবেশ করতাম।

— ৪ —

মনটা খারাপ হ'য়ে যাওয়াতে দিন-কয়েকের জন্য আমি আর এক জায়গায় চলে' গেলাম। সেখানে আমার এক-জন জানা লোক থাকতো; সেখানকার এঞ্জিনিয়র, নাম হরপ্রসাদ। লোকটা কিছু সাহেবী রকম কিন্তু আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ বলে' তার বাংলায় গিয়ে উঠলুম। আমাকে দেখে অন্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ হে, ভোলানাথ, তোমার নামে খবরের কাগজে কত কি দেখছিলুম, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

—ও-সব কিছু নয়, আমাকে নিয়ে নতুন দলে টানা-টানি করেছিল।

—হঠাৎ তুমি পেট্রিয়টা হ'তে গেলে কেন? তুমি সরকারী লোক, রায়-বাহাদুর হয়েচ, তোমার আবার এ রোগ কেন?

—পৃথিবী-সুদ্ধ সকল জাত স্বাধীন, আমরাই কি চিরকাল পরাধীন হয়ে থাকব?

—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ তোমার এ জ্ঞান টন্‌টনে হয়ে উঠ্‌ল যে ? এতকাল যে চাকরী কর্‌তে, কার অধীন ছিলে ?

—তাই বলে' কি দেশের অবস্থা ভাব্‌তে নেই ?

—যারা ভাবে তারা ভাবুক, তোমার-আমার সে খোঁজে দরকার কি ?

আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্চে এমন সময় মিষ্টার চৌধুরী এলেন। ইনি ডেপুটী। হরপ্রসাদ পরিচয় করিয়ে দিলে। মিষ্টার চৌধুরী আমার হাতখানা ধরে' খুব নাড়া দিয়ে বল্‌লেন, ও হো! আপনার নাম আমাদের খুব জানা আছে। আপনি ত একজন নতুন লীডার হয়েচেন।

—ও-সব বাজে কথা। লীডার হওয়া দূরে থাকুক্, দলে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েচে।

—ব্রেভো! এ একটা ভাল খবর বটে। যে দলে বরাবর ছিলেন, সেই দলই আপনার পক্ষে ভাল।

দু'একটা কথা আমি চেপে গেলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা, আর সনদ ফিরিয়ে দেবার কথা প্রকাশ কর্‌লাম না।

সন্ধ্যাবেলা হরপ্রসাদ আমাকে তাদের ক্লাবে নিয়ে গেল। সেখানে জেলার সব কর্ম্মচারী, উকীল, ডাক্তার জড় হয়। ব্রিজ খেলার খুব ধুম। আমাকে নিয়ে খানিক রঙ্গ হ'ল, কিন্তু সকলেই বুঝলে যে, আমার নামে যে-সব রব উঠেছিল, সে বাড়ানো কথা, সত্যিসত্যি আমি গবর্মেণ্টের বিরোধী নই।

দিন দুই পরে হরপ্রসাদ আমাকে বল্‌লে,—ওহে, আজকে মল্লিকদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেচি।

—বেশ, মল্লিক কে ?

—সে একজন ব্যারিষ্টার, বেশ পয়সা আছে আর রোজগারও ভাল। সে মেম বিয়ে করেছে, তারা দু'জনেই আস্‌বে।

—ভাল কথা। মেম কি বিলাতে বিয়ে করেছিল?

—না, সে আগে এক সাহেবের ছেলেদের গবর্ণেস ছিল, অল্পদিন হ'ল মল্লিক তাকে বিয়ে করেচে। তোমাকে আজ রাত্রে পোষাক পর্‌তে হবে।

—কেন, ধুতি কি অপরাধ কর্‌লে?

—মল্লিকের স্ত্রী হাজার হোক্ মেম ত বটে। তার সঙ্গে টেবিলে ধুতি পরে' খেতে বসা ভাল দেখায় না।

আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে' গেল। বল্‌লুম, বাপ পিতামহ চিরকাল ধুতি পরে' এসেচে, আর এখন একজন মেম আস্‌বে বলে' ধুতি অসভ্য বেশ হ'ল? এ যেন গবর্ণেস কিন্তু খোদ গবর্ণর যদি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আসেন, তা হ'লেও বাড়ীতে আমি ধুতি ছাড়া আর কিছু পর্‌ব না।

হরপ্রসাদ মুস্কিলে পড়ল। বল্‌লে, তুমি নিতান্ত ওল্ড ফ্যাশনের লোক। ধুতি না ছাড়লে তুমি তাদের সঙ্গে টেবিলে বসে' কি করে' খাবে?

—না হয় খাব না। আর তোমার গবর্ণেসের সঙ্গে আলাপ কর্‌বারও আমার কোন দরকার নেই। আমি আর একটা ঘরে থাক্‌ব, সেইখানে আমার খাবার দিয়ে যেতে বলো। ইংরেজি খাবার চাই নে, বামুন যা রাঁধবে তাই দিতে বলো।

সে রাত্রে আমার আর খানা খাওয়া হ'ল না, মল্লিক-দম্পতীর দর্শনলাভও হ'ল না। তার পরদিন আমি বাড়ী ফিরে এলুম।

আমার অদৃষ্টে প্যাঁজ-পয়জার দু-ই হ'ল।

বন্দী

চারিদিকে প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। মাথার উপর একখণ্ড আকাশ, আকাশে কখন পাখী উড়িয়া যায়, কখন মেঘ ভাসিয়া যায়, দিনের বেলা কিছুক্ষণ সূর্য্য দেখা দেয়, রাত্রে কিছু নক্ষত্র, জ্যোৎস্না রাত্রে কিছুক্ষণ চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্প স্থানের মধ্যে কয়েক শত মনুষ্য—সকলের এক বেশ, মোটা কাপড়ের হাঁটু পর্য্যন্ত পায়জামা, গায়ে সেই কাপড়ের পিরাণ, মাথায় সেই রকম টুপী। মোটা কাপড়, তাহাতে নীল ডোরা। সকলের গলায় একটা টিনের চাকৃতি, তাহাতে একটা নম্বর খোদা। এই সকল লোকদের নাম নাই, শুধু নম্বর। যাহার যে নম্বর তাহাকে সেই নম্বর বলিয়া ডাকে।

ইহারা বন্দী, ইহাদের বাসস্থান কারাগার।

কতক লোকের পায়ে শৃঙ্খল, সকলের মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা। কারাগারের মধ্যে আর একটা প্রাচীর, এক ভাগে বন্দীরা শয়ন করে, আর এক ভাগে কাজ করে। জাঁতায় আটা পিষিতেছে, ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে। কোথাও শতরঞ্জি, গালিচা প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও ছুতারের কাজ। পাকশালায় কয়েকজন বন্দী সকলের জন্য পাক করিতেছে, মোটা অপরিষ্কার চাউল, মোটা আটার রুটী, জলের মত ডাল, অৰ্দ্ধসিদ্ধ একটা তরকারি। সকল স্থানে কয়েদী ওয়ার্ডার, অপর কয়েদীদের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে ঘণ্টা বাজে, বন্দীদিগকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কাজে যাইতে হয়, দ্বিপ্রহরে আহারের

জন্য এক ঘণ্টা অবকাশ, আবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস; বৎসরের পর বৎসর এই রকম চলিয়াছে, কখন বিরাম নাই, কখন কোন পরিবর্ত্তন নাই।

মাঝে মাঝে যাহা নূতন কিছু হয় তাহাতে বন্দীদের ভয় হয়, আনন্দ হয় না। কখন কোন বন্দী আদেশপালনে আপত্তি করে অথবা কর্ম্মে অবহেলা করে, শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাতের আদেশ হয়। একটা কাঠের তিনকোণা ফ্রেমে অপরাধীর জামা খুলিয়া তাহাকে বাঁধে, আর একজন কয়েদী তাহাকে বেত মারে। জেলের অধ্যক্ষ ও ডাক্তার দাঁড়াইয়া থাকে, চারিদিকে কয়েদীরা ঘিরিয়া দাঁড়ায়। প্রথম কয়েক ঘা পড়িতে অপরাধী আর্ত্তনাদ করে, তাহার পর চীৎকার করিবার ক্ষমতা থাকে না, মাথা স্কন্ধে হেলিয়া পড়ে, কাতরোক্তি বন্ধ হইয়া আসে। যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, কিছুক্ষণ উঠিতে পারে না, তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যায়।

রাত্রে প্রাচীরের উপর ভরা বন্দুক লইয়া, পায়চারি করিয়া প্রহরীরা পাহারা দেয়, মাঝে মাঝে হাঁকে, অল ওয়েল্! চারিদিক হইতে, চারিটা প্রাচীর হইতে সেই সাড়া আসে, অল ওয়েল্! কদাচ কখন, ভারি রাত্রে মহা কোলাহল উত্থিত হয়, দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ, চারিদিকে ছুটাছুটি, চারিদিকে চীৎকার, কয়েদী ভাগা! কয়েদী ভাগা! বন্দীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চায়, অমনি বন্দুকধারী কয়েকজন প্রহরী তাহাদের পথরোধ করে, তাহাদিগকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে আদেশ করে। বন্দিগণ মেষের পালের মতন জড়সড় হইয়া কোন্ কয়েদী পলায়ন করিয়াছে তাহাই আলোচনা করে।

পলায়ন করিয়া কয়জন কয়েদী রক্ষা পায়? তখনি, না হয়

কিছুদিন পরে, আবার ধরা পড়ে, পলায়নের অপরাধে শাস্তি বাড়িয়া যায়! কয়েদীদের নিজের কথা, জেলের ভিতর যেন পোষা পাখী, খাঁচা হইতে উড়িয়া গেলে যেন বাজ তাড়া করে। জেলের মধ্যে শুধু আটক, পলায়ন করিলে পিছন হইতে যেন বাঘ গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসে।

এই সকল নাম-হারা, নম্বরমারা বন্দীদের মধ্যে যাহার গলার চাকৃতিতে ৩৫১ নম্বর খোদা, সে যেন কি-রকম কি-রকম। তাহার বয়স হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স, দেখিতে তাহার অপেক্ষাও বৃদ্ধ। শীর্ণ, ক্ষীণমূর্ত্তি, চক্ষের দৃষ্টি ভয়চকিত, সর্ব্বদাই যেন সঙ্কুচিত, সশঙ্কিত ভাব। মুখে বড়-একটা কথা নাই, কলের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, কলের মত কাজ করে। কেহ ডাকিতেই তাড়াতাড়ি আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়। শ্বাপদকুলের মধ্যে মেষ পড়িলে তাহার যেমন দশা হয়, ইহার যেন সেই অবস্থা। কয়েদীদের অনেকেই দুর্ব্বৃত্ত, নির্ভীক, জেলের শাসনকে তৃণ জ্ঞান করে, নিজেদের মধ্যে আপন আপন দুষ্কর্ম্মের বড়াই করে, কারামুক্ত হইয়া আবার কি করিবে তাহার জল্পনা করে। তাহাদের মুখে সর্ব্বদাই হাসি, সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ততা। ৩৫১ নম্বর যেন তাহাদের দলের কেহ নয়, যথাসাধ্য তাহাদের পাশ কাটায়, আলাদা নিত্য নির্দ্দিষ্ট কাজ করে। কোন কয়েদী তাহাকে কিছু আদেশ করিলে তাহাও করিত।

জেল হইবার পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল কালীচরণ। লেখাপড়া জানিত না, গ্রামে কখন মোট বহিয়া, কখন চাষীর কাজ করিয়া কষ্টে দিনপাত করিত। উপার্জ্জনের লোভে সহরে গিয়াছিল। সহরের সব দেখিয়া অবাক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এমন সময় একজন ভদ্রবেশী লোক তাহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে হে তুমি? এখানে নতুন এসেচ, না?

কালীচরণ নমস্কার করিয়া বলিল,—হাঁ, বাবুমশায়, আমি দেশ থেকে এই সবে এসেচি।

—চাকরী করবে?

—আজ্ঞে, চাকরীর জন্যই এখানে আসা।

—তবে আমার সঙ্গে এস।

কালীচরণ তাহার সঙ্গে গেল। একটা ছোট গলির ভিতর একটি ছোট বাসাবাড়ী, আরও দুই-তিনজন লোক আছে, স্ত্রীলোক কেহ নাই। যে কালীচরণকে ডাকিয়া আনিয়াছিল সে বলিল,—দেখ, আমরা এই চারজন মেসে আছি, বেশী কাজকর্ম্ম নেই, তোমাকে খাওয়া-পরা আর পাঁচ টাকা মাইনে দেব। কি বল?

কালীচরণ যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বাড়ীতে মাসে মাসে পাঁচ টাকা পাঠাইতে পারিলে আর ভাবনা কি? ঘরে তাহার স্ত্রী আর একটি ছোট মেয়ে। স্ত্রী হাটের দিন লাউ, কুমড়া, পটল বেচিয়া কিছু পায়। ঘরে চরকায় সূতা কাটিয়া তাঁতিকে বিক্রয় করে, কুঁড়েঘরের পাশে ফালির মতন এতটুকু জমি—তাহাতে ঝিঙ্গে, ধুঁতুল, লাউ, কুমড়া, লঙ্কা আজ্জায়; চাষীদের ধান কাটা হইলে ধানের বোঝা বহন করিয়া কিছু ধান পায়, ঢেঁশকেলে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া কিছু চাল পায়, ডাল ভাঙিয়া মাসকলাইয়ের খোসা খুদ পায়। আহ্লাদে আটখানা হইয়া কালীচরণ বলিল,—যে-আজ্ঞে, ঐ মাইনেই আমার কবুল।

কালীচরণের চাকরী হইল। মনিবেরা তাহাকে এক জোড়া কাপড় আর একখানা গামছা কিনিয়া দিল। সে বাড়ীর কাজকর্ম্ম করে, বাজার-হাট করে, ফাই-ফরমাস খাটে। সকাল বেলা বাজার করিবার সময় মেসের একজন বাবু তাহার সঙ্গে যায়, বাজারে ঢুকিতেই

তাহার হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিয়া বলে,—আলুর দোকানে এই নোট খানা ভাঙিয়ে তুমি বাজার কর ত, আমি একটা কাজ সেরে আসি। কালীচরণ নোট ভাঙাইয়া বাজার করে কিন্তু বাবুর আর দেখা নাই। বাজার করিয়া কালীচরণ বাড়ী ফিরিয়া যাইত। বাজারের পয়সা হইতে চুরী করা তাহাকে দিয়া হইত না, তার একটা পাড়াগেঁয়ে কুসংস্কার ছিল যে, মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, অধর্ম্মের পয়সা ভোগে আসে না।

বাবুরা রোজ এক বাজারে যাইত না, কালীচরণকে সাত বাজার ঘুরিতে হইত, আর প্রতিদিন তাহাকে একখানা নূতন খসখসে নোট ভাঙাইতে হইত। খুচরা টাকা চাহিলে বাবুরা বলিত, তাহাদের নিজের অন্য খরচ আছে, দশ টাকার কমে হয় না। বাবুরা পালা করিয়া কালীচরণের সঙ্গে যাইত, এক বাজার ছাড়িয়া অন্য বাজারে ঘুরিত কিন্তু নোট ভাঙাইবার বেলা কালীচরণ একা, কোন বাবুর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাইত না।

কালীচরণের ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। শুধু গায় নিতান্ত অসভ্য দেখায় বলিয়া বাবুরা তাহাকে পিরাণ কিনিয়া দিল, পায়ের জন্য পুরাতন জুতা দিল। সেই সঙ্গে বাজারের মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। কোন দিন এক বাবু তাহার হাতে চারিখানা নোট গুঁজিয়া দিয়া, কাপড়ের দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিত, 'কালীচরণ, দশ টাকা জোড়া দু-জোড়া লালপেড়ে আর দু-জোড়া কালা পেড়ে দেশী ধুতি কিনে তুমি এই সামনের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও, আমি এই এলাম বলে।'

কালীচরণ কাপড় কিনিয়া মোড়ে আসিয়া দেখে বাবুর কোন চিহ্ন নাই। সে ধুতি কয়জোড়া বগল দাবা করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসে।

একদিন একটা দোকানে কালীচরণ বাবুর হুকুম-মত কতকগুলা জিনিষ খরিদ করিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল। বাবু তাহাকে বলিয়াছিল, একজনের সঙ্গে দেখা করে' আমি এখনি আসচি।

দোকানদার নোট পাঁচখানা হাতে করিয়া কালীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'দোকানে রেজকি নেই, আমি একখানা নোট ভাঙিয়ে আনি।

দোকানের পিছনে এক পোদ্দারের দোকান। দোকানদার পোদ্দারকে বলিল,—এ গুলো একবার দেখ দেখি, আমার যেন কি-রকম, কি-রকম ঠেক্‌চে।

পোদ্দার নোটগুলা হাতে করিয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ঠাহর করিয়া দেখিল। বলিল,—এ জাল। বাজারে কিছুদিন থেকে জাল নোট চল্‌চে, শোন নি?

—শুনেচি বই কি। তাই ত আমার সন্দ হ'ল।

দোকানদার দোকানে ফিরিল না। মোড়ে গিয়া পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল। কালীচরণের বাবু মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিল। দোকানদার পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে করিয়া দোকানে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া বাবু একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল।

কালীচরণ দোকানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। দোকানদারের সঙ্গে পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাহারাওয়ালা নোট কয়খানা দেখাইয়া কালীচরণকে জিজ্ঞাসা করিল,—এ নোট তুমি কোথায় পাইলে?

কালীচরণ বিস্মিত হইয়া কহিল,—আমি নোট কোথায় পাইব? এ নোট বাবুর।

—বাবু কোথায় ?

—বাবু একজনের সঙ্গে দেখা কব্বে' হয়ত ফিরে আসচে। মোড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

পাহারাওয়ালা, দোকানদার, কালীচরণ বাহিরে আসিয়া চারিদিকে অনেক খুঁজিল, বাবুর কোথাও দেখা পাওয়া গেল না। পাহারাওয়ালা কালীচরণকে গলাধাক্কা দিয়া, গালি দিয়া থানায় লইয়া গেল। দোকানদার থানায় গিয়া লিখাইল, কালীচরণ দোকানে একা আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কোন বাবু ছিল না।

পুলিশের লোক কালীচরণকে সঙ্গে করিয়া যখন বাবুদের বাসায় গেল, তখন বাসা খালি, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। ঘরগুলায় চারিদিকে তচনচ্ হইয়া আছে, যাহারা ছিল তাহাদের বড় তাড়া, বর্গীর ভয়ে যেমন ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া লোকে পলায়ন করিত সেই রকম পলায়ন করিয়াছে।

দেখিয়া শুনিয়া ইন্সপেক্টর বলিল,—এর সঙ্গে আরও লোক আছে, তারা সব ফেরার।

অনুসন্ধানে কালীচরণের যথার্থ পরিচয় পাইতে বিলম্ব হইল না। সে যেমন জানিত তাহাই বলিল,—কিন্তু সে কতটুকু ? সাক্ষীর বেলা বিশ পঁচিশ জন দোকানদার, মুদী, পসারী তাহাকে সনাক্ত করিল। সকলেই এক বাক্যে বলিল,—এ ব্যক্তি নোট ছাড়া কখন টাকা আনিত না, সব নতুন নোট, আর পরে জানা গেল সব জাল।

ইন্সপেক্টর কালীচরণকে জুতার ঠোকর মারিয়া বলিল,—শালা, ঝামু, বোকা সেজেচ।

দায়রার বিচারে কালীচরণের সাত বৎসর মেয়াদ হইল।

সেই যে পুলিশ কালীচরণকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল সেই হইতে

সে যেন কি রকম হইয়া গেল। থানায়, আদালতে, জেলে হাবা কালা জন্তুর মত হইয়া থাকিত, মুখে বড় একটা কথা নাই, চক্ষে শূন্যদৃষ্টি, কলের মত চলা-ফেরা করে, কলের মত খাটে। কাজে সে চটপটে কোনকালেই ছিল না, এখন যেন আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। অন্য কয়েদী যে কাজ দু-ঘণ্টায় করে সে কাজ তাহার করিতে চার ঘণ্টা লাগে। দুই একবার জেলার তাহাকে শাস্তি দিল, কিন্তু বেত মারিতে ডাক্তার নিষেধ করিল, কারণ দেশের ম্যালেরিয়ায় তাহার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছিল। জেলার লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ৩৫১ নম্বর কয়েদী কাজে ফাঁকি দেয় না, অলসও নয়, কিছু নিড়বিড়ে, কাজ করিতে সময় অধিক লাগে।

কাজ না থাকিলে কালীচরণ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। চারিদিকে সেই চারিটা প্রাচীর, মাথার উপর সেই খানিকটা আকাশ। শব্দের মধ্যে কয়েদীদের পায়ের বেড়ীর শব্দ, জাঁতার ঘরঘরাণি, ওয়ার্ডারের ধমক, কয়েদীদের হাসি, আর গল্প। এই প্রাচীর-বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ স্থানের বাহিরে আর কিছু আছে কি? বাহিরে কি লোকালয়, গ্রাম আছে, তাহার পাশে ধান ভরা ক্ষেত? পুকুরের পাড়ে কি মেয়েরা বাসন মাজে? মাজিবার সময় পিতলের চুড়ীতে কি ঠুন্‌ঠুন্‌ করিয়া শব্দ হয়? মাঠে কি ছেলেরা হাডু-ডু-ডু খেলা করে, বাঁশ গাছে বসিয়া কি ঘুঘু ডাকে? সন্ধ্যার সময় সেই যে কে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইত সে কি এখনও তেমনি গান করে? এই সব ভাসা-ভাসা দিবা-স্বপ্নের মধ্যে আর একটা স্বপ্ন যেন তাহার বুক চাপিয়া ধরিত। তাহার মেয়ে হিমী তাহার বড় নেওটা, সে কি বাপকে খোঁজ করে না? তাহার স্ত্রীর কেমন করিয়া চলে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার দৃষ্টি আরও শূন্য হইয়া যায়, সূর্য্যের আলোক যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে নিভিয়া যায়।

আর একজন কয়েদী তাহার পাশে আসিয়া, তাহাকে আঙুলের খোঁচা দিয়া বলিল,—কি রে, কি ভাবচিস্ ?

কালীচরণের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বলিল,—কি আর ভাব্‌ব ?

—এই দেশের কথা ?

—তাই ভাবচি।

—চিরকাল এইখানে পচে' মর্‌বি ? আমরা ক'জন পালাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি ?

—কেমন করে' ?

—কেমন করে' পালাতে হয় জানিস্ নে ? পাঁচিল টপ্‌কে, আবার কেমন করে'। জমাদার আস্‌চে, এখন আর কথা হবে না, রাত্রে বল্‌ব।

রাত্রে তাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া পলায়ন করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। কালীচণকে লইয়া পাঁচজন। সব কথা শুনিয়া কালীচরণ বলিল,—তোরা যা, আমার পালাবার ক্ষমতা নেই।

একজন অন্ধকারে কালীচরণের গলা টিপিয়া ধরিল, বলিল,—সব কথা জেনে আমাদের ধরিয়ে দিবি, না ? তোকে খুন করে' আমরা ফাঁসি যাব।

গলা ছাড়িয়া দিলে কালীচরণ হাঁপাইয়া বলিল,—আমাকে দিয়া কোন কথা প্রকাশ হবে না, আমি যেন কোন কথা শুনিনি।

আর চারজন কয়েদী দিন কতক পরে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু একজন তখনি প্রহরীর গুলিতে মরিল, বাকি তিনজন কিছুদিন পরে ধরা পড়িল। জেল হইতে পলায়ন করিবার অপরাধে তাহাদের আরও তিন বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইল, পায়ে দিনরাত বেড়ী, অপর কয়েদীদের সঙ্গে মিশিতে পাইত না।

বৎসর দুই জেলে কাটাইবার পর ৩৫১ নম্বর কয়েদী জেলারের কৃপাচক্ষে পড়িল। চোর ডাকত বদমায়েস লইয়াই জেলে নিত্য কর্ম্ম, কিন্তু ৩৫১ নম্বর সে দলের নয়, ইহার সাজা হওয়া সম্বন্ধে একটা কিছু গলদ আছে। জেলার খাতা খুলিয়া মকদ্দমার সংক্ষিপ্ত নোট পড়িল। ৩৫১ নম্বরকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে ঘরে আর কেহ ছিল না।

জেলার বলিল,—কালীচরণ!

কালীচরণ থতমত খাইয়া উত্তর দিতেই ভুলিয়া গেল। এতদিন পরে আবার তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে! এখানে ত কাহারও নাম নাই, যে যার নাম জেলের ফটকের বাহিরে রাখিয়া আসে। তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেই যেন জেলের প্রাচীরের ইটের গাঁথনি কোথায় মিলাইয়া গেল, যেন আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ মুক্ত সংসার তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইল, কারাগারের বন্ধন টুটিয়া গেল।

জেলার আবার ডাকিল,—কালীচরণ!

কালীচরণ চমকিয়া' বলিয়া উঠিয়া বলিল,—হুজুর, আমার কসুর মাপ হয়, কেমন অন্যমনস্ক হয়েছিলাম।

জেলারের চক্ষু কোমল, মুখে অল্প হাসি। যে ভ্রূকুটি ও গর্জ্জনে কয়েদীদের প্রাণ শুকাইত তাহার কোন চিহ্ন নাই। জেলার বলিল,—জাল নোট ভাঙাইবার জন্য তোমার সাজা হইয়াছিল?

—হাঁ, হুজুর।

—অনেক দোকানে ভাঙাইতে?

—হাঁ, হুজুর।

—তুমি জানিতে সেগুলা জাল নোট?

—না, হুজুর।

—আসল আর জাল নোট চিন্‌তে পার?

—না হুজুর, আমি মুখ্খু মানুষ।

—নোট তুমি কোথায় পেতে ?

—যে বাবুদের কাছে চাকরী করতাম তারা ভাঙাতে দিত।

—তারা কোথায় ?

—তারা পালিয়ে গিয়েচে।

জেলার খানিকক্ষণ কালীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর কহিল,—আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

কালীচরণ নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে জেলারের আদেশ-মত কালীচরণকে কোন কঠিন কাজে নিযুক্ত করা হইত না। আরও কিছুদিন পরে কালীচরণ ওয়ার্ডার হইল। কয়েদীরা সকলে দেখিল, জেলার কালীচরণকে অনুগ্রহ করে, তাহাকে কোন রকম শাসন করে না, কখনো দুর্ব্বাক্য বলে না, অনেক সময় নিজের আপিস ঘরে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা কয়।

একা থাকিলেই কালীচরণ অন্যমনস্ক হইত। জেলের বাহিরে মুক্ত সংসার কি রকম দেখিতে তাহা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিত। এক এক সময় পূর্ব্বকথা স্বপ্ন মনে হইত, এই কারাগারই যেন বাস্তব, আর সব মিথ্যা। গ্রামের কথা যেন বহুকালের বাল্য-স্বপ্ন, মায়াপুরের ইন্দ্রজাল। সত্য সত্যই কি এমন স্থান থাকিতে পারে ? এমন মুক্ত আকাশ, এমন মধুর বাতাস, আম বাগানে এমন বিহঙ্গকাকলী ? শিশুদের ভাঙা ভাঙা কথা, বৃদ্ধদের আগেকার কালের কথা, কালীচরণ কখনও কি শুনিয়াছিল ? শীতকালে মাথার উপর দিয়া হাঁসের দল উড়িয়া যাইত, নদীর মাঝখানে বালুকার চরে বসিয়া বুনো হাঁস রৌদ্র পোহাইত, মাল-বোঝাই-করা নৌকা ভাসিয়া যাইত, মাঝি হাল ধরিয়া আপনার মনে গান গাহিত। গ্রামে রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে

সন্ধ্যা-আরতির সময় কি-রকম কাঁসর ঘণ্টা বাজে! সহরের কথা একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের ন্যায় মনে হইত, সবই যেন জাল, সবই প্রবঞ্চনা, মানুষ মানুষের শত্রু। সে-কথা মনে হইলে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত।

একদিন সন্ধ্যার পর কয়েকজন নূতন কয়েদী আসিল। অপর কয়েদীরা তখন শয়ন করিতে গিয়াছে। প্রাতে উঠিয়া কালীচরণ জেলারের আপিসে গেল। সেখানে সে নিত্য টেবিল ঝাড়িয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া ঘর পরিষ্কার করিত, জেলার আসিলে পর অপর কাজে যাইত। কাজ তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হইত না, অন্য কয়েদীদের কাজ দেখিত। ধমক-ধামক বড় একটা দিত না।

কালীচরণ দেখিল, তেলের ঘানিতে দুইজন নূতন কয়েদী ঘানি টানিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া কালীচরণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু স্থির হইল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। কয়েদী দুইজনের গলার চাকৃতিতে নম্বর ৪০৫ আর ৪০৬। কয়েদী দুইজন কালীচরণকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। একজন বলিল,—এই যে কালীচরণ! তোমাকে অনেক দিন দেখতে না পেয়ে আমাদের মন কেমন কর্‌ছিল, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচি।

কালীচরণ নিঃস্পন্দ, একটি কথাও কহিতে পারিল না। অজগরের চক্ষে পড়িলে পাখী যেমন আড়ষ্ট হইয়া যায়, কালীচরণ সেই রকম আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় নূতন কয়েদী হাসিয়া সুর করিয়া কহিল,—চিরদিন কখনও সমান না যায়, কখনও বাবুয়ানা, কখনও ঘানিটানা।

কালীচরণ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এমন সময় জেলার আসিয়া উপস্থিত। সে তীক্ষ্ণকটাক্ষে একবার কালীচরণের দিকে আর

একবার নূতন কয়েদীদের দিকে চাহিয়া দেখিল। কালীচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এদের চেন?

—হাঁ, হুজুর।

—কে এরা?

—যে বাবুদের কাছে আমি চাকরী করতাম আর যারা আমাকে নোট ভাঙাতে দিত তাদের মধ্যে এই দু' জন।

জেলারের ভ্রু কুঞ্চিত হইয়া চক্ষু ছুঁচের মত হইল। কয়েদী দুই-জনকে যেন চক্ষের দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, তোমরা এই নিরপরাধী ব্যক্তিকে ফাঁসাইয়াছিলে?

পুরাতন কয়েদীরা জানিত যে, জেলারের তর্জ্জন-গর্জ্জনকে যত না ভয়, সে চিবাইয়া চিবাইয়া মৃদু মৃদু কথা কহিলে তাহার অপেক্ষা অধিক ভয়। এই দুইজন কয়েদী সবে শ্রীঘরে শুভাগমন করিয়াছে, তাহারা সে-কথা কেমন করিয়া জানিবে? একজন দাঁত বাহির করিয়া রহস্ত করিয়া বলিল,—এমন হয়েই থাকে, উদোর বোঝা অনেক সময় বুদোর ঘাড়ে পড়ে।

জেলার আরও মৃদুস্বরে বলিল,—নরকে যাবার আগেই নরক কাকে বলে তোমরা জান্‌তে পারবে।

জেলার চলিয়া গেল, কালীচরণও সেই সঙ্গে গেল।

৪০৫ আর ৪০৬ নম্বর কয়েদীর নরক-যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে বড় বিলম্ব হইল না। তাহারা জাল নোট তৈরী করা ছাড়া কখন কোন পরিশ্রম করে নাই, কখন কাহারও আদেশে কোন কর্ম্ম করে নাই, কখন কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার করে নাই। জেলের কদন্ন আহার করিতে তাহাদের রুচি হইত না, জেলের কঠোর শাসনে তাহাদের রাগ হইত। তাহার উপর হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর জেলারের তীব্র দৃষ্টি। জেলার

যখন-তখন আসিয়া তাহাদের কাজ দেখিত, অলস বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিত। পাঁচ সাতদিন যাইতেই একদিন কয়েদী দুইজন জেলারের মুখের উপর জবাব করিল। জেলারও তাহাই চায়। প্রত্যেক কয়েদীকে ত্রিশ ঘা বেতের আদেশ হইল।

ডাক্তার আসিয়া কয়েদী দুইজনকে দেখিল। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট নীরোগ শরীর, ডাক্তার বেত মারিতে অনুমতি দিল।

জেলার কালীচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইল। ৪০৫ নম্বর কয়েদীর কাপড় খুলিয়া তাহাকে ত্রিকোণ কাঠের ফ্রেমে বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে। পাশে দশ বার গাছা আটি-বাঁধা লম্বা বেত পড়িয়া রহিয়াছে। জেলার কালীচরণকে বলিল,—তুমি ইহাকে বেত মার।

কালীচরণের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার চক্ষু কপালে উঠিল। সে ঢোক গিলিয়া বলিল,—হুজুর, আমি পারব না।

জেলার গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কী! আমার হুকুম শুনবে না?

—হুজুর, হুকুম শোনাই ত আমার কাজ, কিন্তু ওকে আমি বেত মারতে পারব না।

—হুকুম না মানলে তোমাকে বেত খেতে হবে।

—তাই খাব হুজুর, বলিয়া কালীচরণ গায়ের জামা খুলিতে লাগিল।

জেলার হাত তুলিয়া তাহাকে নিষেধ করিল। ঠোঁট কামড়াইয়া বলিল,—আচ্ছা, তোমাকে মারতে হবে না, তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

কালীচরণ দাঁড়াইয়া রহিল।

জেলার আর একজন বলবান কয়েদীকে বেত মারিতে আদেশ করিল। ৪০৫ নম্বর কয়েদী প্রথম কয়েক ঘা বেত খাইয়া আর্ত্তস্বরে

চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার পর শুধু গোঙানি। ৪০৬ নম্বর দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কালীচরণ মুখ ফিরাইল। দুই-জনকে বেত মারা হইলে পর জেলার কালীচরণকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল,—ঐ দু-জনের জন্য তোমার জেল হয়েচে, তুমি ওদের বেত মারতে অস্বীকার করলে কেন?

—হুজুর, আমার যা হবার তা হয়েচে। ওদের মেরে আমি ত আর জেল থেকে খালাস পাব না। ওরা অধর্ম্ম করেচে, তেমনি সাজাও পেয়েচে। আমি ওদের গায়ে হাত তুল্‌লে আমার পাপ হবে।

জেলার কালীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। কালীচরণ মূর্খ, অশিক্ষিত, অকারণে বন্দী হইয়াছে, অথচ যাহারা তাহাকে এরূপ বিপদে ফেলিয়াছে তাহাদের প্রতি ক্রোধ নাই, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি নাই। জেলার কালীচরণের কাঁধে হাত দিয়া বলিল,—তুমি যদি তোমার শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতে চাও, তা হলে আমি আর তাদের পীড়ন করব না।

কালীচরণ বলিল,—হাঁ হুজুর, সেই ভাল। মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, তিনি বিচার করবেন। অধর্ম্ম সইবে কেন?

৪০৫ আর ৪০৬ নম্বর কয়েদী সারিয়া উঠিয়া আবার যখন কাজ করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় জেলার একদিন তাহাদিগকে বলিল, আমি তোমাদের আচ্ছা করে' জব্দ করতাম, কালীচরণের জন্য তোমরা রক্ষা পেলে। সে তোমাদের পিঠে নিজে বেত মারেনি, এখনও তোমাদের দয়া করে। যদি আবার সাজা পেতে না চাও তা হ'লে কালীচরণকে খুসী রাখবে।

সেই দিন হইতে এই দুইজন কয়েদী কালীচরণের খোসামোদ করিত।

জেলার ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না। কয়েদী দুইজনকে দিয়া কালীচরণের সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা লিখাইল। তাহারা স্বীকার করিল, কালীচরণ সম্পূর্ণ নিরপরাধী, যে-সকল নোট তাহাকে ভাঙাইতে দেওয়া হইত, সেগুলা যে জাল তাহা তাহার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে সবে গ্রাম হইতে আসিয়াছিল, দরিদ্র, নিরক্ষর, নোট কখন চক্ষে দেখিয়াছিল কি না, তাহাই সন্দেহ। সেই সঙ্গে জেলার লিখিল, কালীচরণের স্বভাব-চরিত্র সে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল। সে নিরীহ, ভালমানুষ, কিছুই জানে না, তাহাকে যে-কেহ স্বচ্ছন্দে ঠকাইতে পারে।

কালীচরণের মুক্তির জন্য জেলার যে সময় লিখিতে আরম্ভ করিল, তখন কারাবাস পাচ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছয় মাসে নয় মাসে কখন কালীচরণের নামে একখানা চিঠি আসিত। তাহার স্ত্রী গ্রামের কাহাকেও দিয়া লিখাইত। জেলার কালীচরণকে পড়াইয়া শুনাইত, উত্তরও সে লিখিয়া দিত। এই সময় পত্র আসিল কালীচরণের কন্যা বসন্ত রোগে মারা পড়িয়াছে। কালীচরণ বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। জেলার তাহাকে দুই চারিটা সান্ত্বনাবাক্য বলিল। কালীচরণের চক্ষে জল পড়িল না, শূন্য, শুষ্ক, উত্তপ্ত চক্ষে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের কোমল সরসতা, অশ্রুর উৎস যেন দগ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পূর্ব্বেও কালীচরণ অধিক কথা কহিত না, অপর কয়েদীদের সঙ্গে বড়-একটা গল্প-গুজব করিত না, কিন্তু এই বিপদের পর সে যেন মূকের মত হইয়া গেল, তাহার মুখে কথা শুনিতেই পাওয়া যাইত না। কেহ কিছু বলিলে একটা কথার উত্তর দিত বা সেখান হইতে চলিয়া যাইত। কাজ যেটুকু করিতে হয় করিত, কিন্তু কাজে অমনোযোগী হইলে জেলার তাহাকে কিছু বলিত না।

কয়েক মাস পরে একদিন জেলার তাহাকে ডাকিয়া বলিল, কালীচরণ, আমার কাছে পত্র আসিয়াছে, যে, তোমার মকর্দ্দমার সমস্ত সমস্ত কাগজ সরকার হইতে তলব হইয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই তোমার খালাসের হুকুম হইবে। কালীচরণের মুখে আনন্দের কোন চিহ্ন নাই। কহিল,—হুজুর, আমার এখন সব জায়গায়ই সমান।

এক সপ্তাহ পরে কালীচরণের গ্রাম হইতে পত্র আসিল যে, সর্পাঘাতে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদেও তাহার চক্ষে জল আসিল না। সে পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আরও একমাস কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় জেলার কালীচরণকে বলিল,—তোমার খালাসের হুকুম হয়েচে, কাল সকালে তুমি খালাস পাবে।

কালীচরণ বলিল,—হুজুর, আমি কোথায় যাব? আমার ত যাবার কোথাও জায়গা নেই।

জেলার দুঃখ প্রকাশ করিল, কহিল,—তোমার যে বিপদ হয়েচে তার তো কোন উপায় নাই। বাড়ী গিয়ে ভগবানকে ডেকো।

—তিনি তো এখানেও আছেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে কালীচরণের মুক্তি হইল। কাজের হিসাবে কিছু সামান্য টাকা তাহার পাওনা ছিল, সেই সঙ্গে জেলার আর পাঁচটি টাকা দিল।

জেলের প্রকাণ্ড ফটক পার হইয়া কালীচরণ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশপ্রান্তে মাঠের মাঝখান দিয়া সূর্য্যোদয় হইতেছে। সম্মুখে রাজপথ, পথের দুইধারে বড় বড় অশ্বত্থ ও বট গাছ, গাছে পাখীর কোলাহল, প্রভাত-বায়ুতে বৃক্ষপত্রে মর্ম্মর শব্দ। দূরে ধানের

ক্ষেতে ধান পাকিয়াছে, ধানের শীষ রাশি রাশি স্বর্ণশলাকার ন্যায় ক্ষেত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

অন্ধকারে ঘরের দেয়াল যেমন মাথায় লাগে, প্রভাত-আলোকে মুক্ত আকাশ যেন সেই রকম কালীচরণের মাথায় লাগিল। তাহার হাঁপ ধরিল, বৃহৎ সংসার-অরণ্যে দিশেহারা হইয়া পড়িল। সে কোথায় যাইবে? তাহার গন্তব্য স্থান কোথায়? কে তাহার পথ চাহিয়া আছে? সে কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে? কারাগারের চারিটা প্রাচীরের গণ্ডী বরং ছিল ভাল। সংসার যে বৃহৎ কারাগার, ইহাতে পথহারা হইয়া ঘুরিতে হয়। এ মেয়াদ কবে ফুরাইবে, এ কারাগার হইতে কবে মুক্তি হইবে?

প্যারীর মাসী

—১—

হঠাৎ আমার মন কি রকম খারাপ হয়ে গিয়ে আমি সংসারের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বিরক্তি, কি বৈরাগ্য, কি বিবেক, অত-শত বিচার করা আমার হয়ে ওঠে নি। আমার চোখে ঠুলি দিয়ে ঘানিগাছে জুড়ে দেবার সব ঠিকঠাক হয়েচে, অর্থাৎ আমার বিয়ে দিয়ে আমার বুকে জগদ্দল পাথর চাপাবার আয়োজন হচ্চে, এমন সময় আমি দড়ী ছিঁড়ে, তিড়িং-মিড়িং করে' লাফিয়ে মাঠে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। রাতারাতি উঠে কাউকে কিছু না বলে' সরে' পড়লাম।

পেড়ে কাপড় ছেড়ে গেরুয়া ধারণ করলাম। সঙ্গে দু'চারখানা পুঁথি ছিল—গীতা, মোহমুদ্গর, খানকতক উপনিষদ, এই রকম। একখানা কম্বল আর একটা কমণ্ডলু সঞ্চয় করা গেল। তার পর অবারিত খোলা পথ, যেদিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকে চললাম। কয়েক দিন বৈদ্যনাথে, তার পর গোটা কতক দিন গয়ায় আর বৌদ্ধ গয়ায় কেটে গেল। কোন ঝঞ্ঝাট, কোন বালাই নেই, যেদিন যেমন জোটে, সেদিন সেইরূপ যায়। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ, তার মধ্যেও কখন সৎসঙ্গ, কখন অসৎসঙ্গ, কেউ পারমার্থিক কথা কয়, কেউ সাধু সেজেও ঘোর বিষয়ী। বেগতিক দেখলে আমি পাশ কাটিয়ে আর কোথাও চ'লে যেতাম '

কাশী যাব বলে' এক দিন বক্সরে রেলগাড়ীতে উঠচি, দেখি, একখানা গাড়ীতে এক জন সাধু বসে' রয়েচেন। দিব্য প্রমাণ দেহ,

উজ্জ্বল কান্তি, মাথায় বড় বড় চুল, জটা নয়, দাড়ী-গোঁফ প্রায় পাকা, বড় বড় চোখের কোণে লাল ছড়া, কপালে বিভূতি-তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষমালা। আমি যুক্তহস্ত মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, নমো নারায়ণ!

সন্ন্যাসী বললেন, এস, এস, এই গাড়ীতে এস। কোথায় যাবে?

আমি বললাম, কাশী যাব।

গাড়ীতে উঠে এক ধারে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি নিজের পাশে যায়গা করে' দিয়ে বললেন, এইখানে ব'স।

আমি বসলে পর বললেন, তোমার বয়স ত বড় অল্প মনে হচ্ছে। এরি মধ্যে এ ভেক?

—গৃহস্থ আশ্রমে তৃপ্তি নাই।

—ভাল ভাল। সাধুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে নেই। কাশী এর আগে দেখা হয়েচে?

—আজ্ঞে না, আমার কিছুই দেখা হয় নি, আমি কিছু জানি নে।

—তা হ'লে আমাদের সঙ্গে চল না? আমরাও কাশী যাচ্ছি।

—যদি আপনাদের কোন অসুবিধে না হয়—

—আরে, ও-সব লোক-সমাজের কথা ভুলে যাও। আমাদের আবার সুবিধে অসুবিধে কি? সর্ব্বত্র সমান, আরাম কি কষ্ট, কোন জিনিষই নেই, সব স্থানে দরিদ্র নারায়ণ, সবই লীলাময়ের লীলা। কুণ্ঠা সঙ্কোচ লোকালয়ে, সে-সব আমরা লোকালয়ে রেখে এসেছি।

—কেমন অভ্যাসের দোষ—

—আর বলতে হবে না, অমন সকলেরই নতুন নতুন হয়। তোমার হাতে পুঁথি দেখছি। কিছু পড়া-শোনা আছে?

—যৎসামান্য, বলতে গেলে কিছুই নয়। যদি কোন ভাল গুরুর আশ্রয় পাই, তা হ'লে কিছু পাঠাভ্যাস করি।

—নিষ্ঠা থাক্‌লেই পাবে। পুঁথি-পাঁজি ত কত লোকে পড়ে, তাতে কি হয়? কেউ ঘোর দাম্ভিক, কেউ ঘোর নাস্তিক। সদ্‌গুরু কে? সদ্‌গুরু রস্তাওয়ে বাট, যে পথ দেখায়, সেই সদ্‌গুরু। যে পথ চায়, সে পথ পায়; যে সব ছাড়ে, সে সব পায়। সব ছোড়ো তো সব মিলেগা।

সন্ন্যাসীর কথার বেশ চটক। আর কিছু কথার পর বল্‌লেন, তোমাকে কি ব'লে ডাক্‌ব? বাপ-মায়ের-রাখা নাম জিজ্ঞাসা করছিনে, এ আশ্রমে এসে একটা কিছু নাম হয়েছে ত? আমার নাম বালানন্দ।

—আমি সুনন্দ ব্রহ্মচারী।

—বেশ নাম। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর। এই আমাদের যাত্রা ফুরাল।

মোগলসরাইতে গাড়ী বদলাতে হয় নি, বরাবর রাজঘাট কাশী ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌ল। আমরা গাড়ী থেকে নাম্‌লাম।

মেয়েদের গাড়ী থেকে একটি স্ত্রীলোক নেমে বালানন্দ স্বামীর কাছে এল। কি আপদ! সন্ন্যাসীর সঙ্গে আবার মেয়েমানুষ কেন? আমার মনে কেমন খট্‌কা লাগ্‌ল। কথাবার্ত্তায় ত জ্ঞানীর মত, লোকটা বামমার্গী নয় ত? আমি কি করব ভাব্‌ছি, এমন সময় স্ত্রীলোকটি মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। দেখামাত্র মনের সংশয় ঘুচে গেল।

গেরুয়া-পরা, শুভ্রকেশী, তেজস্বিনী রমণী। মুখে বার্দ্ধক্যের কোনো চিহ্ন নেই। টানা টানা নাক-চোখ, রং ফরসা, মুখ সুন্দর না হ'লেও তেজে ভরা, চোখের চাউনি তীক্ষ্ণ, তীব্র। বালানন্দ স্বামীর কাছে এসে বল্‌লে,বাবা-ঠাকুর, হেঁটে যাবে?

—কি দরকার? সারারাত্রি রেলে ভাল ঘুম হয়নি, তোমারও কষ্ট হ'য়ে থাক্‌বে, চল গাড়ী ক'রে যাই।

আমার দিকে ফিরে বালানন্দ স্বামী বল্‌লেন, ইনি আমার শিষ্যা, তীর্থ-পর্য্যটনে বেরিয়েছেন।

রমণীকে বল্‌লেন, উনি নতুন ব্রহ্মচারী হয়েছেন, কখন কোথাও যান নি। ওঁকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাচ্চি।

—বেশ ত, চলুন না।

রমণীর স্বর মধুর, কিন্তু কথা স্পষ্ট, কোনোরূপ সঙ্কোচ অথবা জড়তা কিছুমাত্র নেই।

একখানা ঠিকা-গাড়ীতে বালানন্দ স্বামী আর আমি এক দিকে বস্‌লাম, রমণী অন্য দিকে বস্‌ল।

দশাশ্বমেধ থেকে একটু দূরে একটা গলিতে একখানি ছোট পরিষ্কার বাড়ীতে আমরা উঠ্‌লাম। বাড়ীতে লোক ছিল, তারা খুব সম্মান ক'রে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে বালানন্দ স্বামী বল্‌লেন, প্যারীর মাসী! আমরা গিয়ে এই দশাশ্বমেধ ঘাটে বসি। তোমার কিছু দরকার আছে?

—আমি যাব উজ্জুগ ক'রে নেব, তোমরা বেরিয়ে যাও না। বেলাও ত আর বড় নেই, আমিও কাজ সেরে যাচ্ছি। আরতি দর্শন করতে হবে ত?

—আরতি দেখ্‌তে আমরাও যাব। তুমিও কি আগে ঘাটে যাবে?

—তাই যাব।

আমরা বাড়ীর বাইরে এলাম।

—২—

প্যারীর মাসী! কোন্ দেশী নাম! যে সংসার থেকে বেরিয়েচে, তার আবার মাসী-পিসী সম্বন্ধ কি? আর যদি সন্ন্যাসিনী হয়েও নাম

না বদ্‌লায়, তা হ'লেও নিজের ত একটা নাম আছে, সেই নামে ডাকে না কেন? অমুকের স্ত্রী, অমুকের মাসী পাড়াগাঁয়ে ব'লে থাকে বটে, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমেও কি সেই পরিচয় থাকবে?

আমি ভুরু কুঁচকে ভাব্‌চি, বালানন্দ স্বামী আমার মুখ চেয়ে হাস্‌লেন। বল্‌লেন, তোমার মন গোলোক-ধাঁধায় ঘুরচে! তুমি প্যারীর মাসীর কথা ভাব্‌চ, না?

আমি চমকে উঠ্‌লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন? সন্ন্যাসী হেসে কৌতুক ক'রে বল্‌লেন, মানুষের মনে ডুব দিয়ে যদি মনের কথা তুল্‌তে না পারব, তা হ'লে আমার সাধুগিরি কিসের? আর এ ত সোজা কথা প'ড়ে রয়েচে। তোমার মনে হ'তেই পারে যে, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়েমানুষ কেন? আমি বৈষ্ণব নই যে, বৈষ্ণবী সঙ্গে ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব; বামাচারী তান্ত্রিকও নই যে, আমার সঙ্গে অবিদ্যা থাকবে। কথাটা যখন তোমার মনে উঠেচে, তখন প্যারীর মাসীর বিষয়ে তোমার কিছু জেনে রাখা ভাল। ওর বিষয়ে সব কথা আমি নিজে জানিনে, যেটুকু জানি, বল্‌তে আমার কোনো আপত্তি নেই। প্যারীর মাসী ছাড়া ওর অন্য কোনো নাম আমি কখন শুনিনি। প্যারী কে, তা কিছুই জানিনে, প্যারী বেঁচে আছে কি নেই, তাও বল্‌তে পারিনে। প্যারীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করলে সে কিছু বলে না, পূর্ব্বের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে। ও ডাকনামটা বদ্‌লে আমি এ আশ্রমের একটা নাম রাখ্‌তে চাইলাম, তাতে ও রাজি নয়। যখন সংসার ত্যাগ করিনি, আমাদের গ্রামের নিকটে আর একটা গ্রামে প্যারীর মাসী থাকত। একাই ছিল, আপনার লোক কেউ ছিল না। স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, ওর নামে

কেউ কখনো একটা কথাও বল্‌তে পারে নি। শুনতাম—কেমন যেন ছেমো-ছেমো, সময় সময় এলোমেলো কথা কয়, কিন্তু পাগল কেউ বল্‌ত না। কয়েক বছর আগে কালীঘাটে একবার দেখা হয়, সেখানে আমার কাছে মন্ত্র নেয়। সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ঘোরে। সব কাজে তৎপর, বেশ পড়াশোনা আছে। তবে ঐ যা বল্‌লাম, ঠিক সহজ মানুষ নয়, পাগলও নয়। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে, কিন্তু আমার মনে হয়, ওর কোনো দৈবশক্তি আছে।

এ-সব কথা আমি ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। এর ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে, কিন্তু সে ভাবনায় আমার কি কাজ? আজ এদের সঙ্গে রয়েচি, কাল কোথায় থাক্‌ব, তার ঠিক নেই। আমি আর কোনো কথা কইলুম না।

আমি ত এর আগে বারাণসী কখন দেখি নি, তবু গঙ্গার ধারে দশাশ্বমেধ ঘাটে ব'সে আমার মনে হ'ল যে, এই তীর্থক্ষেত্র চিরকাল যেমন ছিল, ঠিক তেমনি রয়েচে। গঙ্গার একটানা স্রোতে সব ভেসে যায়, কেবল এই শিবপুরী অটলভাবে বিদ্যমান রয়েচে। পুরাকালে যেমন, এখনও সেইরূপ! কত রাজা, কত রাজ্য গেল, এই কাশীতেই কত অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু কার সাধ্য এই তীর্থের মাহাত্ম্য লোপ করে? ভাগীরথী-বিধৌত অসিবরুণাবেষ্টিত এই পুণ্যক্ষেত্র কালবিজয়ী। বারাণসী নামই বরুণা ও অসি এই দুই নদী থেকে। তিন দিক থেকে এই ত্রিধারা কালের পথ আগ্‌লে রয়েচে।

সন্ধ্যা হয়েচে। আকাশের কোমল নীল ছায়া গঙ্গার ঢেউয়ে ভাঙ্গচে, নৌকা ভেসে যাচ্চে কিংবা দাঁড় টেনে উজানে বাইচে। বড় বড় বাঁশের ছাতার তলায় ব'সে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ সন্ন্যাসী, সাম্‌নে ধুনি জ্বল্‌চে। ঘাটে স্ত্রীলোকেরা কাপড় কাচ্‌ছে, কাশীবাসীরা বেড়িয়ে

বেড়াচ্ছে। আমাদের পাশে আর দু'জন সাধু এসে বস্‌ল। হিন্দুস্থানী। এক জন বল্‌লে, বম্‌ মহাদেও!

সাম্‌নে একটা ছোঁড়া অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, টন্‌গণেশ! তার পর ধমক খেয়ে স'রে গেল।

সাধুর মধ্যে এক জন লম্বা সরু গাঁজার কল্কে বের করলে। তাতে ভিজে ন্যাকৃড়া গোঁজা ছিল, গাঁজার ধোঁয়ায় রং ঠিক তামার মত। গাঁজা বের ক'রে হাতের তেলোয় একটু জল দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের টিপ দিয়ে খুব খানিক ড'লে কল্কেতে পুরে, এক জন সাধুর ধুনি থেকে একটু আগুন চেয়ে নিয়ে এল। গাঁজা সেজে কল্কে আর ন্যাকৃড়া বালানন্দ স্বামীর হাতে দিয়ে বল্‌লে, লেও মহারাজ!

বালানন্দ একটান টেনে আমার দিকে কল্কে আগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, এক টান হবে? ভোলানাথের প্রসাদ?

আমি বল্‌লাম, ওটা আমাকে মাপ করতে হবে। ও পথে আমি নেই।

—আমিও সচরাচর খাইনে, প্যারীর মাসী পসন্দ করে না। তবে এদের পাল্লায় পড়লে এক-আধ টান টান্‌তে হয়।

সন্ন্যাসী সাধুকে কল্কে ফিরিয়ে দিলেন। সে কল্কের নীচে ন্যাকৃড়া টিপে দু'চারবার টেনে লাগালে দম্‌। ছিলিমের মাথা দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল, সাধু সঙ্গীর হাতে ছিলিম দিল, নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগ্‌ল। দুই চক্ষু টক্‌টকে লাল হয়ে উঠ্‌ল, মুখ দিয়ে টপ্‌-টপ্‌ ক'রে লাল পড়তে লাগ্‌ল, বল্‌তে লাগ্‌ল, কাশী কৈলাসপতি! বম্‌ ভোলা! হর, হর, হর, মহাদেও!

গাঁজা টেনে সাধুরা উঠে গেল। আমরা ঘাটে ব'সে ঘাটের ও জলের সান্ধ্য দৃশ্য দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। আমি ভাব্‌ছিলাম যে, কাশী

মহাদেবের ত্রিশূলের উপর স্থির হ'য়ে আছে কেমন ক'রে? ত্রিশূল যাঁর হাতে থাকে, তিনি ত ভাঙ্গ-ধুতুরায় সব সময় চুর হ'য়ে থাকেন, আর তাঁর নন্দীভৃঙ্গীর দল সব নেশাখোঁর, ত্রিশূল ধ'রে থাকে কে? বাসুকি যেন মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দেয়, তাতে অপর জায়গায় ভূমিকম্প হয়, কিন্তু কাশীতে ভূমিকম্প কৈ ত শুনতে পাওয়া যায় না! তা না হ'লে কাশীর এত মাহাত্ম্য হবে কেন?

ঘোর-ঘোর হ'য়ে আস্‌তে প্যারীর মাসী এসে উপস্থিত হ'ল। তার হাঁটবার ধরণেও যেন কেমন একটা তেজ আছে, দ্রুত লঘু পদক্ষেপে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। বল্‌লে, বাবাঠাকুর, বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখ্‌বে চল।

বালানন্দ স্বামী বল্‌লেন, আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

আরতি দেখ্‌বার জন্য বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ভিড় হয়েছে। তার ভিতর দি'য় গিয়ে প্যারীর মাসী দরজার এক পাশে দাঁড়াল, আমরা তার পিছনে দাঁড়ালাম।

তখন শিবলিঙ্গকে স্নান করানো হচ্ছে। স্নানের পর মহাদেবের বিভূতি ক'রে আরতি আরম্ভ হ'ল। ধূনার ধূমে মন্দির সুবাসিত হয়েছে, পাঁচ জন পাণ্ডা পাঁচটি ঘণ্টা হাতে ক'রে উঠে দাঁড়াল। পাঁচটি পাঁচ রকম, ছোট বড়।

এর পূর্ব্বে কখন কাশী দেখি নি, বিশ্বেশ্বরের আরতিও দেখি নি। ঘণ্টার আওয়াজ বড় মধুর, ছোট বড় ঘণ্টার ধ্বনি মিশে একটা ঐক্যতান মাধুরীর আবেশ, ঘণ্টাশুদ্ধ হাত উঠ্‌ছে—নাম্‌ছে। পরে পাণ্ডারা সাধা গলায় রুদ্রস্তোত্র আরম্ভ করলে। শম্ভু—শম্ভু—শম্ভু! শিব—শিব—শম্ভু! ছন্দিত, গম্ভীর, লয়শুদ্ধ কণ্ঠধ্বনি আর সেই সঙ্গে ঘণ্টার মিলিত নিক্কণ! আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল,

হৃদয়ে স্তোত্রের বিচিত্র উদার শব্দাবলী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'তে আরম্ভ হ'ল। স্তোত্রের প্রত্যেক শ্লোকের আবৃত্তি শেষে বার বার সেই ধীর গম্ভীর ধ্রুবক—শম্ভু, শম্ভু, শম্ভু, শিব, শিব, শম্ভু!

আরতি শেষ হ'লে আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। প্যারীর মাসীর চক্ষু ভাবে ঢল্-ঢল্ করছে, জলে ভ'রে এসেছে। আঁচল দিয়ে চক্ষুর জল মুছতে লাগ্‌ল। মন্দিরের কোণে আর এক জন গালবাদ্য ক'রে, মাথা চালিয়ে কেবলি বল্‌ছিল, বম্ বম্ ভোলা! বব-বম্ বব-বম্ শিব শঙ্কর ভোলা!

—৩—

বাসায় ফিরে বালানন্দ জপে বস্‌লেন, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আচমন ক'রে সন্ধ্যা করতে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে প্যারীর মাসী এসে বল্‌লে, প্রস্তুত। তোমরা এস।

পাশের ঘরে দুখানি কম্বলের আসন পাতা, দুখানি শালপাতে খাবার বাড়া। রুটী আর তরকারি। ব্যঞ্জনের রকম বেশী নয়, কিন্তু পরিপাটী রান্না। খেতে খেতে বালানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন খাচ্ছ? প্যারীর মাসীর রান্না কেমন?

—অমৃত। এমন সুন্দর রান্না কখন খাই নি।

প্যারীর মাসী সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল। বল্‌লে, যেমন জানি সেই রকম রাঁধি। আর একটু ধোঁকা দেব?

—দাও।

তার পরদিন সকালবেলা আমরা গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। স্নান ক'রে ফিরে এসে আমরা বসেছি, প্যারীর মাসী এসে বালানন্দ স্বামীকে দণ্ডবৎ ক'রে প্রণাম করলে। তারপর আমাকেও করতে আসে

দেখে আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, বল্‌লাম, ও কি কর? স্বামীজী তোমার গুরু আর আমি দুদিনের ব্রহ্মচারী, ওঁর শিষ্য হবারও যোগ্য নই। প্রণাম করতে হয় আমি করব। তুমি আমার মাতৃতুল্য, আমি কি তোমার প্রণম্য?

প্যারীর মাসী বল্‌লে, সাধুমাত্রেই প্রণম্য; সন্ন্যাসী কি ব্রহ্মচারী, বয়স অল্প কি বেশী, সে খোঁজে আমার কি কাজ? আর তুমি ত ব্রাহ্মণ?

—আমার গলায় কি পৈতা আছে? আর এ আশ্রমে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের কোনো ভেদ নাই।

বালানন্দ স্বামী বল্‌লেন, কথা ঠিক। জাতের ধার আমরা কি কি ধারি? ও ছেলেমানুষ, কুণ্ঠিত হচ্ছে, ওকে নমস্কার করলেই হবে।

আমিই আগে নমস্কার করলাম। প্যারীর মাসী আমাকে নমস্কার ক'রে নিজের কাজে গেল।

যে কয় দিন কাশীতে আমরা ছিলাম, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। তীর্থস্থানে যথেচ্ছাচারের অভাব নেই, কাশীতেও অনেক দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র লোক আছে, কিন্তু বিশ্বাসের বলও অপরিসীম। ধর্ম্মে একাগ্রতা দেখে চমৎকৃত হ'তে হয়। যারা সে-ভাবে তন্ময় হ'য়ে আছে, তাদের আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, মনের কোনো রকম বিকার নেই। বিশ্বাসের মূল এমন দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে আছে যে, উৎপাটন করা ত দূরের কথা, শিথিল করবারও কারও শক্তি নেই। বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হয়েছিল, ফলে কিছুই হ'ল না, যে কাশী সেই কাশীই র'য়ে গেল। উচ্চ চূড়া-সম্বলিত নূতন মসজিদ তৈয়ার হ'ল, কিছু দিন পরে সেই চূড়া বেণীমাধবের ধ্বজা হ'য়ে গেল। যত টানাটানি হয়, ততই শিকড় আরও নীচে নেমে যায়। বিশ্বাসের হিমাচলকে কে টলাবে?

মণিকর্ণিকার ঘাটে অনেক সময় ব'সে থাকৃতাম। শ্মশানের উদাস শূন্যতার কোনো চিহ্নই নেই, আছে শুধু অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও নিশ্চিন্ততা। শববাহীরা বা আত্মীয়স্বজনরা কোনো প্রকার শোক প্রকাশ করে না, কাহারও মুখে বিষাদের লেশ নেই। প্রজ্বলিত চিতার পাশে ব'সে লোকে হাসিমুখে গল্প করচে। কাশীতে ত লোক মরবার জন্যই আসে, এখানে আবার মৃত্যুভয় কি? এ যে মৃত্যুঞ্জয়ের নগরী, মৃত্যু হার মেনে এখানে শান্ত বন্দীর মত হ'য়ে রয়েছে। হলাহল পানে যাঁর কণ্ঠ নীল হয়েছিল, আর কোনোরূপ বিকার হয় নি, তাঁর নগরে মৃত্যুর বিভীষিকার কেমন ক'রে স্থান হবে? অমৃতের জয়, মৃত্যুর পরাজয়!

দিন কয়েক পরে আমার মনে হ'ল যে, কোনো ধর্ম্মশালায় যাই, কিম্বা কাশী ছেড়ে আর কোথাও চ'লে যাই। বালানন্দ স্বামী কৃপা ক'রে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এ-রকম আশ্রিত হ'য়ে থাকৃলে ত এক রকম সংসারীই হ'য়ে পড়তে হয়। তিন চার দিন ইতস্ততঃ ক'রে এক দিন আমি কথাটা পাড়লাম। আমি কোথাও চ'লে যেতে চাই শুনে বালানন্দ স্বামী বল্লেন, আবার কি হ'ল? আমাদের এখানে তোমার ভাল লাগ্ছে না?

—আজ্ঞে, তা কেন, বেশ আছি, কিন্তু—

আর আমার কথা এগোলো না। স্বামীজী আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন, ঐ কিন্তুটাই যত নষ্টের গোড়া! তোমার আবার কিন্তু কিসের? কিন্তুর মুলুক ত ছেড়ে এসেছ, আবার ফিরে যাবে না কি? সংসারে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে?

—মহাভারত! ও জঞ্জালে আবার জড়াব!

—তবে আবার কিন্তুর সঙ্গে কুটুম্বিতা কিসের? এখানে থাক ব'লে,

এখানে খাও ব'লে ? তাতে কি হয়েছে ? তুমি নির্লিপ্ত বৈরাগী, ভোজনং যত্র তত্র আর শয়ন হট্টমন্দিরেই হোক আর গাছতলাতেই হোক, সর্ব্বত্র সমান। গৃহস্থ, সাধু-সন্ন্যাসী, পথিক যে শ্রদ্ধা ক'রে অন্ন দেবে, তারই অন্ন গ্রহণ করবে। এতে আবার দ্বিধা কি, কিন্তুই বা কিসের ? আমাকে ভিক্ষা করতে হয় না, তার কারণ, কয়েকটি শিষ্য আমার অন্ন-সংস্থান ক'রে দেন, তাতে তুমি ছাড়া আরও অতিথির গুজরান হয়। প্যারীর মাসীকে এ কথা বলেচ ?

—কৈ, না, বলা কি দরকার ?

—তাকে না ব'লে কি কোনো কাজ হয় ? ও প্যারীর মাসী।

প্যারীর মাসী আটা মাখছিল, আটা-মাখা হাতে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, কি বল্‌চ, বাবাঠাকুর ?

—ইনি আর আমাদের কাছে থাকবেন না, বল্‌চেন।

—কেন, কি হ'ল ?

প্যারীর মাসী আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। সে দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কৌতুক, সব জড়ানো। মুখ গম্ভীর ক'রে বল্‌লে, ও-বেলা কি তরকারি নুণে পুড়ে গিয়েছিল, না, ডাল ধ'রে গিয়েছিল ?

বালানন্দ হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, ঐ রকম একটা কিছু নিশ্চয় হ'য়ে থাকবে।

আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লাম, রান্না ত চমৎকার খাচ্ছি, কিন্তু—

অমনি আমার মুখ চাপা পড়ল, বালানন্দ ব'লে উঠ্‌লেন, আবার ঐ ! ওকে কিন্তু রোগে ধরেছে, বড় কঠিন ব্যারাম ! প্যারীর মাসী, তুমি কিছু টোটকা-টুটকি জান ?

প্যারীর মাসী ঘাড় নাড়লে, বল্‌লে, ও রোগ হ'লে এ আশ্রম

ছাড়তে হয়। হ্যাঁ বাছা, তোমার আবার কিন্তু কিসের? কিন্তু থাক্‌লে বাবাঠাকুর আমাকে তাড়িয়ে দিতেন। পরশু আমরা বৃন্দাবন যাব, তুমি যাবে না? তবে একটা কথা বলি। যদি তোমার মনে আর এক ভাব হয়, যদি সব ছেড়ে-ছুড়ে নির্জ্জনে সাধনা করতে চাও, তা হ'লে কেউ তোমায় কোনো বাধা দেবে না। গোবর্দ্ধন বেশ নিরিবিলি জায়গা, সেখানে গুহা আছে, তপস্যা করবার বেশ সুবিধা।

আমার আর কথা কইবার মুখ রইল না। সেখানেই আমার 'কিন্তুর' কাশীপ্রাপ্তি হ'ল।

—৪—

কৃষ্ণসলিলা কালিন্দীতটে সমৃদ্ধশালিনী মথুরা নগরী। চারিদিকে কোঠা বাড়ী, বিস্তর দোকান-পসার, শেঠেদের বড় অট্টালিকা। পথে লোকের ভিড়,—যাত্রী, ব্যবসায়ী সব চলেচে। আমরা একটা ধর্ম্মশালায় উঠ্‌লাম।

স্নানাহার ক'রে আমরা বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরা-বৃন্দাবনে ধূলো বল্‌তে নেই, সেখানে পবিত্র রজ, সকলে তুলে মাথায় দিচ্চে, কাপড়ে এক মুঠা ক'রে বেঁধে নিচ্চে। হরিদ্বারে হিন্দুস্থানী যাত্রীরা পানী বল্‌লে পাণ্ডারা তাদের বুঝিয়ে দেয়, জল বল্‌তে হয়, পানী বল্‌লে দোষ হয়। বৃন্দাবনে পুলিন প্রকাণ্ড চড়া, যমুনা খানিক দূরে। কোথায় সে বংশী-মুখরিত কুঞ্জ, কোথায় সে পুলকিত রোমাঞ্চিত পুষ্পশোভিত নীপরাজি! কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গ মুরলাধারী কোথায়! কোথায় ভাই বলরাম, কোথায় শ্রীদাম সুদাম সুবল মিত্র, স্থূলবুদ্ধি সর্ব্বভুক্‌ বটু মধুমঙ্গল! কোথায় বৃষভানু-নন্দিনী ব্রজেশ্বরী রাধা, সখী ললিতা বিশাখা চম্পকলতা চিত্রা।

চোখের দেখাই কি দেখা? স্মৃতিপটের চিত্র কে মুছে ফেল্‌তে পারে? পথে ঘাটে যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে রাধেশ্যাম! মুখে মুখে বিন্দরাবন, বিন্দরাবন! চারিদিকে ব্রজসঙ্গীত—

ব্রজমে ঐসী হোরী মচাই!

শ্যামলিয়া কি লট্‌কী চাল জিয়া মে বস গঁই রে!

জুতা পায়ে দেওয়া নিষিদ্ধ, সকলে শুধু পায়ে রেণু উড়িয়ে চলেছে। সকলের মুখে আনন্দের চঞ্চলতা, সকলে ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে। কেবল চৌবেদের কোনো তাড়া নেই। বিশালকায় দীর্ঘমূর্ত্তি সব, হেলে দুলে পথের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এদের দেখে চানূর-মুষ্টিককে মনে পড়ে। আবালবৃদ্ধ সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ভাঙ ঘুঁটছে আর ঘটী ঘটী ভাঙ খাচ্চে। এক জায়গায় কোনো ধনী যাত্রী চৌবেদের খাওয়াচ্চে। অন্য সামগ্রীর সঙ্গে এক সের ওজনের এক একটা মিঠাই প্রত্যেকের পাতে পড়ছে আর চৌবেরা হাঁকছে, বাঃ মেরা লাল, লড্ডু লুড়কা দেও!

সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান গেল। প্যারীর মাসী নিবিষ্টচিত্ত, মুখে বড় কথা নেই, কেবল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ! শ্রীমধুসূদন! মন্দিরে যেতে-আসতে চৌবেদের যুবতী কন্যাবধূ বেছে বেছে ধনী যাত্রীদের কাপড় ধরচে আর বলচে, লালজী, কিছু দিয়ে যাও। বালানন্দ দেখে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, এখানে এরা লজ্জা কাকে বলে, জানে না। না দিলে কেড়ে নেয়।

বৃন্দাবন থেকে গোবর্দ্ধন। পথে একটা খালি গরুর গাড়ী যাচ্ছিল, গাড়োয়ান আমাদের দেখে বালানন্দকে বল্‌লে, বাবা, গোবর্দ্ধন যাতে হো?

স্বামীজী বল্‌লেন, হাঁ।

গাড়োয়ান আমাদের গাড়ীতে উঠ্‌তে বল্‌লে, আমরা উঠে বস্‌লাম। গাড়ী ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চল্‌ল।

গোবর্দ্ধন পৌঁছুতে রাত্রি হ'ল। গাড়ী একটা ধর্ম্মশালার সাম্‌নে দাঁড়াল। গাড়োয়ান বল্‌লে, মথুরার শেঠের নতুন ধর্ম্মশালা। এখানে সাধুদের থাক্‌বার জায়গা আছে।

ধর্ম্মশালার একটা ঘরে আমরা রাত্রিবাস করলাম।

গোবর্দ্ধনে লোকসংখ্যা অল্প। কোথাও ভাঙ্গা বাড়ী, কোথাও প্রাচীন ভগ্ন মন্দির। গিরি গোবর্দ্ধন আঁকা-বাঁকা যৎসামান্য উঁচু পাহাড়। সাধুরা কেউ মাধুকরী ভিক্ষা করচে, কোথাও এক টুক্‌রা রুটী, কোথাও অর্দ্ধমুষ্টি অন্ন। কেউ কেউ মৌনী, জীর্ণ ভাঙ্গা ঘরে ব'সে আছে। ভিক্ষা করতে যায় না, লোকেরা তাদের আহার দিয়ে যায়। তাদের দেখে বালানন্দ স্বামী মলুকা দাসের কবিৎ আবৃত্তি করলেন—

পঞ্ছী করে ন চাকরী, অজগর করে ন কাম।
দাস মলুকা কহ গয়ে সবকো দাতা রাম॥

প্যারীর মাসী আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, এ বেশ তপস্যার স্থান। এখানে মৌনী হ'য়ে বস্‌তে তোমার মন নিচ্চে?

—কৈ, এখনো সে-রকম কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। এখনো চঞ্চলতাই বেশী, পরিব্রাজকতা এই সবে আরম্ভ হয়েছে। সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে অমরনাথ পর্য্যন্ত ঘুরে দেখি, তারপর কি হয় দেখা যাবে।

—বৃন্দাবনেও সব বনের পরিক্রমা করতে হয়। তারপর যার ভাগ্যে থাকে, তার মন যুগলরূপের শ্রীপাদপদ্মে নিবিষ্ট হয়। ভোমরার আগে ভন্‌ভনানি, তারপর নীরবে মধুপান।

প্যারীর মাসীর এ-রকম কথা শুনে বালানন্দ স্বামী কেন যে তাকে অনুগ্রহ করেন, তা বুঝ্‌তে পারলাম।

গোবর্দ্ধনের নির্জ্জন স্তব্ধতা মনে শান্তি ও বৈরাগ্য আনে। অনেক তীর্থস্থানেই যাত্রীর ভীড়, নিয়ত জনস্রোত, কেবল আসা-যাওয়া। সে কোলাহলের মধ্যে যারা চিত্তজয়ী, তারাই নিশ্চিন্তভাবে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারে, আর সকলে কেবল গোলে হরিবোল।

দিন পাঁচ ছয় আমরা গোবর্দ্ধনে কাটালাম। স্বামীজীর কাছে কখন কখন দু'এক জন সাধু আস্‌ত, তিনি তাদের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ্ করতেন, আমি ব'সে ব'সে শুনতাম। বালানন্দ স্বামীর অনেক পড়াশোনা, তার উপর চিন্তা-সাধনাও অনেক, তাঁর কথায় অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। বেদান্তবাদীর অটল বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে মধুর কোমলতা ছিল, প্যারীর মাসী আর আমি সর্ব্বদাই তা অনুভব করতাম।

একা থাক্‌লে আমার মনে হ'ত, যে শান্তির জন্য সংসারের বন্ধন ছিঁড়ে এলাম, সে শান্তি কৈ? পিপাসিত ব্যক্তির যেমন মরীচিকায় জলভ্রম হয়, আমারও কি সেই অবস্থা? কোথাও ত স্থির হ'তে পারি নে, কে যেন কি যেন ভিতর থেকে তাড়া দিচ্চে আর বল্‌চে চল্, চল্, চল্,—কেবলি আগে চল্। শেষটা কি শুধু ভবঘুরে হওয়াই সার হবে? বালানন্দ স্বামীকে একদিন একান্তে পেয়ে মনের সংশয় তাঁকে জানালাম। তিনি একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন, এই ত নিয়ম। সংসার-গারদ থেকে বেরুলে প্রথমে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে ইচ্ছে করে। বাঁধা গরু ছাড়া পেলে কি করে দেখেছ ত? সাধুদের সোজা কথায় কত জ্ঞান আছে, তুমি ত এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই শিখবে। শোন সাধুর কথা—

চলতা সাধু অওর বহতা পানী।

সাধুরও চলা থামে না, জলেরও প্রবাহ বন্ধ হয় না। জলের

কলনাদিনী অশ্রান্ত গতি বন্ধ হয় কখন্? না, যখন গিয়ে অনন্ত সাগরে মেশে, যখন নিস্তরঙ্গ মহাম্বুধিতে মিলিত হ'য়ে যায়। মহাসাগরের সঙ্গে একপ্রাণ হ'য়ে নিজেকে ভুলে যায়, সমুদ্রের শান্তিতে তার শান্তি, সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গে তার আনন্দ, সমুদ্রের দিগন্তব্যাপী—আকাশব্যাপী সামগানে তার কলকণ্ঠ মিশে যায়। সাধুরও পর্য্যটন শেষ হয়—যখন সে অনন্ত ব্রহ্মকে ধ্যানে ধারণা করে, অনন্তে লীন হয়; যখন চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে স্থিরতা, অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি আসে। চলতা সাধু তব ঠহর যাতা হয়।

গোবর্দ্ধন থেকে আমরা ভরতপুরের অভিমুখে যাত্রা করলাম। ভরতপুরের কাছাকাছি একজন প্রসিদ্ধ পরমহংস থাকতেন। বালানন্দ স্বামীর ইচ্ছা, তাঁকে দর্শন করেন। সেখান থেকে কুরুক্ষেত্র হ'য়ে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলায় আমাদের যাবার কথা।

সারা দিন হেঁটে সন্ধ্যার সময় আমরা একটা মস্ত বাড়ী দেখ্‌তে পেলাম। নিকটে কোনো গ্রাম কিম্বা লোকালয় নেই। পথের পরিশ্রমে আমরা শ্রান্ত হয়েছিলাম। স্বামীজী বল্‌লেন, 'এ-বাড়ীতে লোকজনও দেখতে পাচ্ছি নে। চল, দেখা যাক্, যদি পারি ত এখানেই রাত কাটানো যাবে।

বাড়ীর বাইরে কিছু দূরে একটি ছোট কুঁড়ে-ঘরে একটি বৃদ্ধ লোক আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী বাস করে। আমরা তাদের কাছে গেলাম। বৃদ্ধ লোকটিকে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, এই বড বাড়ীতে কেউ আছে?

বৃদ্ধ বল্‌লে, না, মহারাজ, বাড়ী প'ড়ে আছে, কেউ থাকে না।

—আমরা এখানে রাত্রি বাস করতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে। বারণ করবার কেউ ত নেই।

বৃদ্ধা সেইখানে দাঁড়িয়েছিল। কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে

থেমে গেল। তার পর বল্‌লে, বাড়ীর ভিতর বড় অন্ধকার, তোমাদের একটা আলো দি।

কুটীরের ভিতর থেকে বুড়ী একটা কেরোসিন তেলের টিনের আলো নিয়ে এল; বল্‌লে, এতে আমি আজই তেল পুরে দিয়েছি, সমস্ত রাত জল্‌বে।

আলো আমি হাতে নিয়ে আগে চল্‌লাম। বৃদ্ধ কুটীর থেকে এক গাদা খড় নিয়ে এল। বল্‌লে, তোমরা রাত্রে পেতে শোবে। আহারের জন্য কিছু আন্‌ব?

স্বামীজী বল্‌লেন, পথে আমরা আহার করেচি, এখন আর কিছু খাব না।

কয়েকটা সিঁড়ি উঠে বাড়ীর প্রকাণ্ড দরজা। দরজা চেপে ভেজান ছিল। বৃদ্ধ দরজার সাম্‌নে খড়ের গাদা নামিয়ে কিছু না ব'লে চ'লে গেল।

এক হাতে আমার আলো, এক হাত দিয়ে ঠেলে দরজা খুল্‌তে পারলাম না। স্বামীজী বল্‌লেন, আমি খুল্‌ছি।

তিনি বলবান্, জোরে ঠেলে দরজা খুল্‌লেন। খুল্‌তে পুরানো কলকব্জার শব্দ হ'ল, ভিতরে প্রতিধ্বনি হ'ল। দরজা খুল্‌তেই কয়েকটা বাদুড় উড়ে বেরিয়ে গেল।

ভিতরে ঢুকে দেখি, মস্ত দরাজ ঘর, মাথার উপর ছাদ খুব উঁচু। একটু শব্দ হ'লেই চারিদিকে প্রতিধ্বনি হয়।

স্বামীজী দরজা ভেজিয়ে দিলেন। প্যারীর মাসী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ-দিক্ ও-দিক্ চেয়ে বল্‌লে, আমার কেমন গা ছম্-ছম্ করচে!

স্বামীজী বল্‌লেন, ভয় করচে? তোমার ত কিছুতে ভয় করে না।

—ভয় আবার কিসের? সমস্ত রাত্রি শ্মশানে একা কাটিয়েছি, কোনো ভয় হয় নি! এ বাড়ীতে যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

—রাত্রিবেলা পুরানো প'ড়ো-বাড়ীতে ও-রকম হয়। এ ঘরটা বড্ড বড়; এস, আমরা আর একটা ঘর দেখি।

সেই ঘরের পাশে আর একটা মাঝারি রকমের ঘর ছিল, সেইখানে খড় পেতে আমরা শয়ন করলাম। স্বামীজী আর আমি পাশাপাশি, প্যারীর মাসী একটু দূরে। আলো প্যারীর মাসীর কাছে কোণে রাখা রইল।

—৫—

গভীর রাত্রে যেন কার গলার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি, প্যারীর মাসী আপনার মনে কি বল্‌চে। পাশ ফিরে দেখি, বালানন্দ স্বামীও জেগে রয়েচেন, একদৃষ্টে প্যারীর মাসীর দিকে চেয়ে রয়েচেন। আমাকে দেখে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ ক'রে থাকৃতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্যারীর মাসী কি ঘুমের ঘোরে কথা কইচে? তার চোখ খোলা, কিন্তু আমাদের দিকে দৃষ্টি নেই, ঘরের ভেজানো দরজার দিকে চেয়ে কথা কইচে। কথায় কোনো রকম জড়তা নেই, সব কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্চে, কিন্তু কথার ভাবে এক রকমের ব্যগ্রতা, কোনো অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখে কথায় যেমন বিস্ময়ের ভাব আসে—সেই রকম।

প্যারীর মাসী বল্‌ছিল, এই ত এত সব লোক গেল, এরা আবার কারা? কি-রকম সব পোষাক পরেচে? এদের আগে আগে ও কে আস্‌চে? রাজপুত্তুর না কি? কার্ত্তিকের মত দেখ্‌তে, মাথার পাগড়ীতে হীরা জল্‌চে, গায়ের পোষাক ঝক্‌মক্ করচে! কোমরে বাঁধা তলোয়ার,

তার মুঠোয় হাত দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে আসচে, আর সকলে তাকে মাথা নীচু ক'রে দু'হাতে সেলাম করচে। কি একটা কথা বল্‌লে, আমি ওদের কথা বুঝতে পারি নে!—এ আবার কোথায় এল, এ ঘর ত কখনো দেখি নি। ঘরের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে গাল্‌চের উপর ব'সে সেই লোকটা না? দুই পাশে দাঁড়িয়ে এরা সব কে?

এ আবার কা'কে নিয়ে এল? দুই হাত বাঁধা, দুই দিকে দুটো যমদূতের মত মিন্‌ষে দাঁড়িয়ে! ও কি করেচে যে, ওকে চোরের মত বেঁধে এনেচে? তবু ভয় কিচ্ছ নেই, চোখ দুটো যেন জল্‌চে! যে ব'সে আছে, সে রেগে-মেগে কি বল্‌চে? হাত বাঁধা থাকলে কি হয়, ও ভয় পাবার মানুষ নয়। বাঁধা হাত নেড়ে জোরে জোরে কেমন জবাব দিচ্চে! যে ব'সে রয়েচে, সে তলোয়ার কোমর থেকে টান্‌ছে—কেটে ফেল্‌বে নাকি? না, তলোয়ারের খাপ দিয়ে ধাঁ ক'রে ওর গালে মারলে। বাপ রে! কি তেজ! বাঁধা হাত দিয়েই খপ্ ক'রে খাপখানা কেড়ে নিলে—তুলে মারে আর কি, আর অম্‌নি সেই দুটো যমদূতের মত লোক তার হাত ধ'রে মুচ্‌ড়ে খাপখানা কেড়ে নিলে। যে বসেছিল, সে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে কি বল্‌লে, হাত বাড়িয়ে কোথায় দেখিয়ে দিলে। ওকে ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্চে? যাই, গিয়ে দেখি!

* * * *

প্যারীর মাসী ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌ল। ঘর থেকে কোথাও বেরিয়ে না যায় ভেবে আমি উঠতে গেলাম; বালানন্দ স্বামী আমার গায়ে হাত দিয়ে নিষেধ করলেন। আমরা দুই জনেই ত জেগে রয়েচি, আবশ্যক হয়, তখন প্যারীর মাসীকে আট্‌কান যাবে। প্যারীর মাসী উঠে দাঁড়াল না। মুখ আমাদের দিকে, কিন্তু দৃষ্টি স্থির, যেন কোথায়

কত দূরে কি দেখ্‌চে। জাগন্ত মানুষের এ-রকম চাউনি কখন দেখা যায় না। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার কথা আরম্ভ হ'ল।

—ভোর বেলা সব কোথায় চলেচে? সেই হাত-বাঁধা মানুষ, দশ বারো জন লোক তাকে ঘিরে নিয়ে যাচ্চে, আর তাদের পিছনে ঘোড়ায় চ'ড়ে তলোয়ার-বাঁধা জাঁকালো পাগড়ীবাঁধা সেই লোক। চড়াইয়ের পথ, কেবল পাথর আর নুড়ি, আমার পায়ে লাগ্‌চে, উঠ্‌তে হাঁপ ধরচে!

আমরা অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লাম, পাহাড়ে উঠ্‌তে মানুষ যেমন হাঁপায়, প্যারীর মাসী সেই রকম হাঁপাচ্চে। একটু পরে সেটা বন্ধ হ'ল, আবার কথা কইতে লাগ্‌ল।

—এখানটা বুঝি পাহাড়ের উপর? জমি সমান, আর চড়াই নেই। ঐ যে ও-ধারে সূয্যি উঠ্‌চে, কিসের উপর আলো চিকচিক করচে? ও মা! ঐ যে নদী, ঠিক পাহাড়ের নীচে দিয়ে গিয়েচে। এমন জায়গায় এরা কি করতে এসেচে? পাহাড়ের পাশ দিয়ে নেমে যাবার ত পথ নেই, তবে এখানে কেন? সকলে দাঁড়িয়েচে, ঘোড়-সোয়ার ঘোড়া থেকে নেমেচে। পাহাড়ের খানিকটা সরু হ'য়ে নদীর উপর ঝুঁকে আছে—কি সর্ব্বনাশ! ওর উপর সব যাচ্চে কেন?—না, সকলে ত নয়, যার হাত-বাঁধা আর সেই দুটো ষণ্ডা মিন্‌ষে আর তাদের পিছনে পাগড়ীধারী!

যার মাথায় পাগড়ী বাঁধা, সে কি বল্‌লে, আর অম্‌নি সেই দুটো লোক হাত-বাঁধা লোকটার হাত খুলে দিলে। তার্‌পর সেই পাগড়ী-মাথায় লোকটা দুই হাত দিয়ে নীচে দেখিয়ে দিলে, কয়েদীকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিতে বল্‌লে। অমন যে সুন্দর মুখ—ঠিক পিশাচের মত দেখাচ্চে! যেই বলা আর যাকে ফেলে দেবে, সে হাত ছিনিয়ে

নিয়ে এক লাফে পাগড়ীবাঁধা লোকটাকে আঁকড়ে ধ'রে পাহাড়ের ধার থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ল। একটা বিকট চীৎকার, আর সেই সঙ্গে একটা বিকট হাসি!—ঘুরতে—ঘুরতে—ঘুরতে—নীচে—নীচে—নীচে—

* * * *

প্যারীর মাসী কয়েকবার শিউরে শিউরে উঠ্‌ল, তার পর খানিকক্ষণ স্থির হ'য়ে রইল। আবার তার কথা বেরুল।

—এক ঘর মেয়েমানুষ! এরা কোন্ দেশের মেয়ে সব? সব ঘাগরা-পরা, গায়ে হীরে-মুক্তোর গয়না। ঘরের চারি-পাশে ব'সে আছে, কেউ পান খাচ্চে, কেউ আলবোলায় তামাক টান্‌চে। খোট্টা মেয়েদের মতন এরা তামাক খায়। ঘরের মাঝখানে চার পাঁচ জন আলাদা ব'সে আছে, এরা কারা? ওঃ, এরা বাঈজী, বাঈনাচ হবে। এক জন উঠে নাচ্‌চে আর দু'জন সারিঙ্গী বাজাচ্চে, আর একজন বাঁয়া-তবলা বাজাচ্চে; বাঃ, বেশ নাচ, ঠম্‌কে ঠম্‌কে, ভুরু নাচিয়ে, পায়ের ঘুঙুরে তাল?

ঐ দরজার পাশে যে মেয়েটি ব'সে আছে, সে ত নাচ দেখ্‌চে না। এরা ত সব সুন্দরী, কিন্তু এর মতন সুন্দরী কেউ নেই। ওর মন যেন আর কোনো দিকে রয়েচে। চোখের কি-রকম চঞ্চল দৃষ্টি, কেমন যেন উস্‌খুস্ করচে, কেউ না টের পায়, এই ভাবে দরজার দিকে একটু একটু ক'রে স'রে যাচ্চে।

নাচ বন্ধ ক'রে বাঈজীরা গান ধরেছে। গান যেই বেশ জমেচে, অমনি সে মেয়েটি কাউকে কিছু না ব'লে উঠে গেল। পায়ে নূপুর নেই, হাতের গয়না হাতের উপরে টেনে চাপা, কোনো শব্দ নেই। ঘর

থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের পাশ দিয়ে ছায়ার মত চলেচে, মাটীতে পা পড়ে, কি পড়ে না। ছায়া—ছায়া—ছায়া—

একটা ছোট দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজায় চাবি দেওয়া, মেয়েটির হাতে চাবি ছিল, দরজা খুলতেই আর একটি ছায়া ভিতরে এল, দুটি ছায়া মিশে গেল। দরজার কাছে একটা ধাপ ছিল, দুই জনে তার উপরে বস্‌ল। দূর থেকে গানের সুর আস্‌চে।

হঠাৎ দু'জনের গায়ে কোত্থেকে আলো পড়ল! দু'জনে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল—দু'জনের মুখের উপর আলো—রতি-কাম—

কালো জামা-আঁটা একটা হাত আলোতে এল, মানুষ অন্ধকারে। হাতের ছুরী হাতে চক্‌মক্ ক'রে উঠ্‌ল। মেয়েটির কাছে যে সুন্দর যুবা দাঁড়িয়েছিল, তার বুকে ব'সে গেল। একবার অল্প যন্ত্রণার শব্দ, তারপর সে প'ড়ে গেল। মেয়েটি আর্ত্তনাদ ক'রে তার বুকের উপর পড়্‌ল।

ছুরী আবার উঠ্‌ল, আবার পড়ল, এবার মেয়েটি একবার কাতরোক্তি ক'রে উঠ্‌ল। আলো দু-একবার তাদের দু'জনের সর্ব্বাঙ্গে পড়্‌ল—সব স্থির—রক্ত মাটীতে ব'য়ে যাচ্চে—আলো নিভে গেল—আবার অন্য দুটো ছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—

গানের আওয়াজ এখনো শোনা যাচ্চে, ঘরের ভিতর আলোয় আলো, চারিদিকে হাসি-তামাসা, আর এখানে—এই অন্ধকারে—

* * * * *

কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। প্যারীর মাসী আস্তে আস্তে শুয়ে তৎক্ষণাৎ

ঘুমিয়ে পড়্‌ল। বালানন্দ স্বামী আমার কাণে কাণে অত্যন্ত লঘু স্বরে বল্‌লেন, তুমি যা শুন্‌লে, প্যারীর মাসীকে কিছু ব'লো না।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

—৬—

সকালে উঠে বাড়ীর পিছনে একটা পুষ্করিণী ছিল, তাতে আমরা স্নান করলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে স্বামীজী সেই বুড়ো মানুষটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাছাকাছি কোনো গ্রাম কি সহর আছে ?

—আধ ক্রোশ দূরে একটা ছোট গ্রাম আছে। সহর অনেক দূর।

প্যারীর মাসী স্নান-আহ্নিক ক'রে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে ঘুম হয়েছিল কেমন ?

হেসে প্যারীর মাসী বল্‌লে, বেশ ঘুম হয়েছিল।

—আমরা কি এখনি বেরিয়ে পড়্‌ব, না এখান থেকে খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাব ?

—বাবাঠাকুর, কাল রাত্রে তোমাদের খাওয়া হয় নি, এখান থেকে খেয়ে গেলে ভাল হয়। কিন্তু এখানে জিনিষপত্র ত কিছু নেই।

—কাছেই গ্রাম আছে, আমরা সব নিয়ে আস্‌চি! তুমি ততক্ষণ এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও।

—বেশ, তোমরা বাজার ক'রে এস।

পথে যেতে যেতে স্বামীজী বল্‌লেন, দেখ্‌লে, কাল রাত্রে প্যারীর মাসী যে-সব কথা বল্‌ছিল, ওর কিছু মনে নেই। তুমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে ?

—না, মহারাজ, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু আমার মনে হ'ল, ও-সব ভয়ানক ঘটনা সত্য, অতীতের ছায়া ঘুমন্ত অবস্থায় প্যারীর মাসীর মনে পড়েছিল।

—সত্য কথা, আর এই বাড়ীর সঙ্গে ঐ দুটা ভীষণ ঘটনার সম্বন্ধ আছে। প্যারীর মাসী একটু যেন কি-রকম কি-রকম, সে-কথা তোমাকে বলেচি। এটা কিন্তু নতুন। ঘুমের ঘোরে ওকে কখনো কখনো কথা কইতে শুনেছি, কিন্তু এ-রকম নয়। স্বপ্নের কিছু না কিছু মনে থাকে, প্যারীর মাসীর কিছুই মনে নেই। এ এক রকম আবেশ। ভূত-প্রেত নয়, ওর একটা কোনো শক্তি আছে, যা ও জানে না, আমরাও বুঝ্‌তে পারিনে।

গ্রামে গিয়ে আমরা প্রথমে হাটে গেলাম না। এক জন আধা-বয়সী লোককে দেখে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, এ গ্রামে কোনো অতি-বৃদ্ধ লোক আছে?

—হাঁ, বাবাজী! ঐ সামনের বাড়ীতে ত্রিলোচন দাস আছেন, লোকে বলে, তাঁর বয়স একশো বছর হয়েছে।

আমরা সেই বাড়ীতে গেলাম। ছোট পরিষ্কার খোলার ঘর, দাওয়ায় কম্বলের উপর ব'সে শীর্ণ-দেহ, স্থবির পুরুষ। চুল, ভুরু, গোঁফ-দাড়ী সব সাদা, কিন্তু চক্ষু নির্ম্মল। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, আজ আমার কি সৌভাগ্য! প্রাতঃকালে সাধু-দর্শন!

স্বামীজী বল্‌লেন, আপনাকে আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

—সেও আমার সৌভাগ্য। বসুন।

আমরা ত্রিলোচন দাসের পাশে বস্‌লাম। স্বামীজী বল্‌লেন, এখান থেকে পশ্চিমে কিছু দূরে একটা পুরাতন বড় বাড়ী আছে। সে বাড়ীর ইতিহাস আপনি জানেন?

—জানি।

প্যারীর মাসী স্বপ্নে কি আর কোনো অবস্থায় যেমন দেখেছিল, স্বামীজী সংক্ষেপে সেই সকল কথা বল্‌লেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব ঘটনা কি সত্য? সেই বাড়ীর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আছে?

—ঘটনা সত্য, আর ঐ বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধও আছে, কিন্তু আপনি জানলেন কেমন ক'রে? তবে আপনারা সর্ব্বদর্শী, আপনাদের কাছে ভূত ও বর্ত্তমান সমান।

—যদি পূর্ব্বের কথা আমাদের বলেন, তা হ'লে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হয়।

বৃদ্ধ বল্‌লেন, মোগলের রাজ্যকালে ঐ বাড়ীতে কোনো ধনী মোগল বাস করত। কয়েক পুরুষ কাটায়। সকলেই দেখ্‌তে সুপুরুষ, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ও ঘোর অত্যাচারী। দুই ঘটনাই ঐ বাড়ী-সংক্রান্ত। কিছু দূরে একটা ছোট পাহাড় ও নদী আছে।

গ্রাম থেকে চাল, মুগের ডাল, ঘি, গোটাকতক আলু আর খানকতক কাঠ নিয়ে আসা গেল। সেই সঙ্গে একটা নতুন হাঁড়ি। দেখে প্যারীর মাসী বল্‌লে, ভাতে-ভাত হবে?

স্বামীজী বল্‌লেন, যাকে বলে ঘৃতপক্ক, তাকেই বলে ভাতে-ভাত।

ভরতপুরের কাছে এসে আমরা শুনলাম, পরমহংস কোথায় পরিব্রজ্যা করতে গিয়েছেন, মাসকতক ফিরবেন না। সেখান থেকে আমরা কুরুক্ষেত্রে গেলাম। কুরুক্ষেত্রে মেলায় বিস্তর লোকের সমাগম, আমরা একটা বাসা দেখে নিয়ে জনতার ভিতর ঘুরে বেড়ালাম। এক জায়গায় দেখি, একটা গাছতলায় তিন জন সাধু ব'সে মাথা হেঁট ক'রে কি করছে। তাদের মাথা-মুখ কামানো, কৌপীন-আঁটা, গায়ে এক

একখানা কম্বল। দেখি, তারা কোমর থেকে গেঁজে খুলে হাতে টাকা-পয়সা ঢেলে গুণ্‌ছে। বালানন্দ স্বামী একটু হেসে বললেন,—

শিল মুণ্ডিদে তুণ্ড মুণ্ডিদে চিত্ত ন মুণ্ডিদে কীশ মুণ্ডিদে। *

কুরুক্ষেত্রে এক রাত্রি কাটিয়ে আমরা হিমাচলের অভিমুখে যাত্রা করলাম। পাহাড়ের পথে বেশী লোক চলে না, অনেক দূরে দূরে ছোট ছোট গ্রাম। বড় বড় দেবদারু-গাছ ঊর্দ্ধশির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ফুলের রেণুতে পাহাড়ের সরু পথ ছেয়ে ফেলেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খড্।—নীচে চেয়ে দেখ্‌লে মাথা ঘুরে আসে। কোথাও বড় বড় ঝরণা, ঝর্ ঝর্ শব্দে খড্ বেয়ে নীচে চ'লে যাচ্ছ। চারিদিকে মৌন প্রকৃতি, বিশাল স্তব্ধতা সমস্ত আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে।

এক একবার আমি প্যারীর মাসীর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। তার মুখে কোনো কথা নেই, চক্ষুর উপর যেন একটা আবরণ নেমে তার বহির্দৃষ্টি রুদ্ধ হ'য়ে অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে। কখন কখন উপরের দিকে চেয়ে দেখে, আবার যেন তার চোখের উপর একটা পর্দ্দা পড়ে। পাহাড়ের গম্ভীর সৌন্দর্য্যে আমার চিত্ত অভিভূত হয়েছিল। পুরাকালে মুনি-ঋষি-তপস্বীরা এই সব স্থানে কি কারণে সাধনা করতে আস্‌তেন, তা ত সহজেই বুঝতে পারা যায়। কোথায় প'ড়ে থাকে সংসারের কলকোলাহল, সহস্র রকমের ক্ষুদ্রতা! এখানে বিরাটের ব্যাপ্তি, নভঃস্পর্শী উন্নত মস্তকের বিশালতা, ধ্যানমগ্নতার নিঃস্পন্দ স্থিরতা।

সন্ধ্যার সময় আমরা পথের পাশে একটি ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেলাম। হয় ত কোনো সাধু কোনো কালে সেখানে বাস করত।

গ্রাম কাছাকাছি কোথাও আছে কি না, আমরা জানি নে,

---

* মুণ্ডিত শির, মুণ্ডিত মুখ, চিত্ত মুণ্ডিত না হইলে কি মুণ্ডিত হইল ? —মৃচ্ছকটিক।

এ-দিকে অন্ধকার হ'য়ে এল। স্বামীজী বল্‌লেন, রাত্রে এ-পথে চলা যুক্তিযুক্ত নয়। পাহাড়ের পথ, পাশেই খড্, দেখে শুনে চলা উচিত। অন্য আশঙ্কাও থাকৃতে পারে। আজ এইখানে রাত্রিবাস করা যাক্।

পাহাড়ে শীত বেশী জেনে মেলা থেকে আমরা খানকতক কম্বল কিনে নিয়েছিলাম। প্যারীর মাসীর সেই রকম অবস্থা দেখে পর্য্যন্ত স্বামীজী আমাকে ব'লে দিয়েছিলেন, রাত্রে কখনো অন্ধকারে শোওয়া হবে না, কি জানি, ও যদি কোথাও উঠে যায়। একটা টিনের আলোতে তেল পোরা, আর দেশালাইয়ের বাক্স আমার কাছে থাকৃত।

কুটীরের ভিতর কাঁধের কম্বল নামানো গেল। স্বামীজী বল্‌লেন, এইবার আগুন জ্বাল্‌তে হবে. বেশী রাত্রে ভালুক আস্‌তে পারে। আগুন জ্বালা থাকৃলে কিছুই আসবে না।

আমি বল্‌লাম, এখানে কাঠ পাওয়া যাবে কোথায় ?

প্যারীর মাসী বল্‌লে, বাঁশবনে ডোম-কাণা! চার ধারে গাছ, কাঠ নেই ?

—ও যে কাঁচা কাঠ।

—তুমি বুঝি এই জান ? দেবদারু-গাছের কাঁচা ডালে মশাল হয়, জান না ? কতকগুলো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এস।

আলো জ্বালিয়ে রেখে আমি কাঠ আন্‌তে গেলাম। সরু মাঝারি ডাল ভেঙ্গে এক পাঁজা এনে দেখি, স্বামীজী আর প্যারীর মাসী পাহাড়ের আর গাছের গা থেকে মখমলের মত নরম নরম পুরু পুরু এক রকম শেওলা তুল্‌চেন। স্বামীজী বল্‌লেন, একে পাথর, তায় আবার কন্‌কনে ঠাণ্ডা। আমাদের যে গদি হবে. তা রাজাদেরও জোটে না।

পুরু ক'রে শেওলার বিছানা পেতে ঘরের দোর-গোড়ায় আমরা

আগুন জাল্‌লাম। দেবদারু-কাঠের নির্য্যাস ঘৃতের মত জ্বলে। আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল। বাকি ডালপালা ভিতরে রইল।

সঙ্গে কিছু খাবার ছিল, খেয়ে ঝরণার জল পান করা গেল। দিব্য নরম শয্যা, পাহাড়ে সারাদিন হাঁটার শ্রান্তি, বেশ শীত, কম্বল মুড়ি দিয়ে আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে বিলম্ব হ'ল না।

—৭—

আবার সেই রকম! প্যারীর মাসীর কথার সাড়ায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে আপনার মনে কথা কইচে। বালানন্দ স্বামী ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু আমি যেই চোখ খুলেছি, অমনি তিনিও জেগে উঠ্‌লেন। আমরা দু'জনে চুপ ক'রে প্যারীর মাসীর কথা শুন্‌তে লাগ্‌লাম।

সে বল্‌ছিল, ঐ দেখেছ গাছতলায় কে ব'সে রয়েছে! নড়ন-চড়ন নেই, একেবারে স্থির। মুনি-ঋষি কেউ হবে, ব'সে চোখ বুজে ধ্যান করছেন। গা থেকে তেজ ফুটে বেরুচ্চে। কোথাও কিছু শব্দ নেই, চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। জন-মনুষ্য নেই, গাছে একটা পাখী পর্য্যন্ত নেই। কেবল বন—বন—বন—গাছের ছায়ায় যেন দিনের বেলাও অন্ধকার ক'রে রয়েচে—

বনের ভিতর দিয়ে ও দুটো কি আসচে? ভালুক না কি? আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে গুঁড়ি মেরে আস্‌চে। জন্তু নয় ত মানুষ, এইবার উঠে দাঁড়িয়েচে, সাবধানে উঁকি মেরে এ-দিকে ও-দিকে দেখ্‌চে! দু'পা এগোয়, আবার দাঁড়ায়, আর চোখগুলো যেন ভাঁটার মতন ঘুরচে। ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, একটুও শব্দ না ক'রে আস্‌চে—আস্‌চে—আস্‌চে—

মুনিকে দেখে থমকে দাঁড়াল। একবার দু'জনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে, যিনি ধ্যানে ব'সে আছেন, তাঁর পাশ-কাটিয়ে আর এক দিকে গেল। তিনি যেমন ব'সেছিলেন, তেমনি ব'সে আছেন—চোখ বোজা, মাথা সোজা, অঙ্গের গৌরকান্তি থেকে জ্যোতি বেরুচ্চে—একেবারে স্থির, নিশ্বাস পড়চে কি না, বুঝ্‌তে পারা যায় না।

তিনি যেখানে ব'সে আছেন, তার পিছনে কিছু দূরে একটা গুহা। গুহার মুখের কাছে একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে এক একবার উঁকি মারচে—ও কে ?

মেয়েমানুষ! পরমা সুন্দরী, বয়স অল্প। ওর এত ভয় কিসের ? ভয়ে চোখ যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌চে, মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, এক একবার হাঁপাচ্চে, গা ঠক-ঠক ক'রে কাঁপ্‌চে। গুহার ভিতর কোনো জন্তু জানোয়ার নেই ত ? তা হ'লে ওখান থেকে পালিয়ে আস্‌চে না কেন ?

আর ঐ দু'জন লোক অমন ক'রে যাচ্চে কেন ? ওরাও কি ভয় পেয়েচে ? কৈ, ওদের মুখে ত ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই। কেবল সাবধান—সাবধান—সাবধান! ওদের পিছনে কি লোক লেগেচে ? তা হ'লে এমন ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে কেন ? ওরা যেন চোরের মতন উট্‌কে পাট্‌কে কি খুঁজ্‌চে—

ঐ গো! ওরা মেয়েটিকে দেখতে পেয়েচে, পেয়েই একেবারে সেই দিকে ছুটেচে!

তারা ছুটে আস্‌চে দেখে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। স্তব্ধতার বুকে যেন ছুরী বিঁধে গেল। গুহার ভিতর পাহাড়ের গায়-গায় চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। সে শব্দে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হ'য়ে গেল,

তিনি চোখ মেলে উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীলোকটি পাগলের মত ছুটে এসে যোগীর পা আঁকড়ে ধ'রে বল্‌চে, রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

তিনি আস্তে আস্তে পা ছাড়িয়ে নিয়ে, যুবতীর মাথায় হাত দিয়ে তা'কে অভয় দিলেন।

সে দু'জনও এসে উপস্থিত হ'ল। তারা একেবারে স্ত্রীলোকটিকে ধরতে যায়, যোগী হাত বাড়িয়ে তাদের নিষেধ করলেন। তারা রেগে মেগে তাঁকে ধাক্কা মেরে যেই ফেলে দিতে যাবে, আর অম্‌নি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাদের আর পা এগোল না।

যোগী যেমন হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই রকম দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চক্ষু সেই দুই জন লোকের মুখের দিকে। তারা তাঁর চোখের দিকে চেয়ে রইল, আর চোখ ফেরাতে পারল না।

দেখ, দেখ, যোগীর চক্ষু দেখ! চোখ থেকে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটচে। মহাদেবের ললাট-নেত্র না কি? এরা কি ভস্ম হ'য়ে যাবে? চোখের কি জ্যোতিঃ! কি দহন-জ্বালা! স্ফুলিঙ্গের পর স্ফুলিঙ্গ, অনল-স্রোতের পর স্রোত—

সে দু'জন লোক ঠিক পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে, মুখে একটি কথা নেই, একটি পা চল্‌বার শক্তি নেই—একেবারে আড়ষ্ট, নিঃস্পন্দ, চোখের পাতা পর্য্যন্ত পড়চে না।

যোগী একবার হাত তুলিয়ে আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখালেন। চক্ষুর দৃষ্টি সহজ হ'য়ে এল, বল্‌লেন, তোমরা চ'লে যাও, আর কখনো এখানে এস না।

তখন তাদের হাত-পায়ে সাড় হ'ল, শুকনো মুখে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে চ'লে গেল।

এতক্ষণ মেয়েটি চুপ ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। যোগী

তার দিকে কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে কোমল স্বরে বল্লেন, মা, তুমি কোথায় যাবে ?

যুবতী কেঁদে ফেল্লে। বল্লে, সংসারে আর আমি ফিরে যাব না। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, আপনি আমাকে আশ্রয় দিন্।

যোগী বল্লেন, এখানে ত থাক্‌বার স্থান নেই। গুহার মধ্যে তুমি কেমন ক'রে বাস করবে ? আমি তপস্বী, তুমি যুবতী রমণী, তুমি এখানে থাক্‌লে আমার সাধনার বিঘ্ন হ'তে পারে।

—তপোবনে কি ঋষিকন্যারা থাক্‌তেন না ? তা'তে কি ঋষিদের তপস্যার কোনো বিঘ্ন হ'ত ? আমি সংসার থেকে এসেচি, আমার চিত্ত মলিন, কিন্তু আপনার কৃপা হ'লে আমারও চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে।

তপস্বী একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বল্লেন, আমার সাধনা এখনো পূর্ণ হয়নি। আর কাউকে শিক্ষা দেবার সময় এখনো হয়নি। এখান থেকে কিছু দূরে জনকতক তপস্বিনী থাকেন, তুমি তাঁদের কাছে থাক্‌তে পার। এখন তাঁদের কাছে শিক্ষা কর, এর পর আবশ্যক হয়, আমার কাছেও শিখ্‌বে।

—আপনার যেমন আজ্ঞা।

*　　*　　*　　*

এই দু'জন তপস্বিনী আস্‌ছেন। গেরুয়া-পরা, শীর্ণ মূর্ত্তি, বেশ লম্বা, শান্ত স্থির চাউনি। এসে দুই জনে তপস্বীকে প্রণাম করলেন। তিনি যুবতীকে দেখিয়ে বল্লেন, একে তোমরা নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখ।

তাঁরা যুবতীকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন, কিন্তু কোনো কথা

কইলেন না। একজন এগিয়ে যুবতীর হাত ধরলেন, বল্‌লেন, চল বোন্, অশান্তি থেকে শান্তিতে চল।

* * * *

আর কোনো কথা শোনা গেল না। প্যারীর মাসী পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের দোর-গোড়ায় আগুন প্রায় নিভে গিয়েছিল, ঘরের পিছন দিকে কিসের শব্দ? ঘরের পিছন দিকে কিসে যেন আঁচ্‌ড়াচ্ছে। বালানন্দ স্বামী উঠে ব'সে চুপি চুপি বল্‌লেন, ভালুক। এই ব'লে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে কতকগুলা কাঠ আগুনের উপর দিলেন। আমিও উঠে দরজা-গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। কাঠ হু হু ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল, চারিদিকে আলো হ'ল। সেই আলোয় আমরা দেখ্‌তে পেলাম, একটা ভালুক পালিয়ে গেল।

প্যারীর মাসীর ঘুম ভাঙ্গেনি।

সকালবেলা উঠে ঝরণার জলে মুখ-হাত ধুয়ে বালানন্দ স্বামী আর আমি একবার সাম্‌নের বনে গেলাম। প্যারীর মাসী নীচে ঝরণার কাছে নেমে গিয়েছিল। আমরা দেখ্‌লাম, পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা রয়েছে। বালানন্দ স্বামী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, ঐ দেখ। প্যারীর মাসী নিজে জানে না যে, সে জাতিস্মর। জাগ্রত অবস্থায় সে-ভাব হয় না, কিন্তু ঘুমুলে পর অতীত তা'র কাছে বর্ত্তমানের মতন দেখায়। আবার দেখেছ স্থানের গুণ? সব জায়গায়, কি সব রাত্রে এ-রকম তা'র হয় না।

প্যারীর মাসীর কোনো কথাই মনে ছিল না, আমরাও কিছু উচ্চবাচ্য করলাম না।

—৮—

হরিদ্বারে, মনে হয় বটে যে, ব্রহ্মলোক থেকে অলকানন্দা মর্ত্ত-লোকে অবতীর্ণা হয়েছেন। দিবানিশি জলপ্রপাতের ন্যায় শব্দ ঘোর ঘর-ঘর রবে উপলখণ্ডে জলমগ্ন প্রস্তরে আহত-প্রতিহত হ'য়ে দেবী ভাগীরথী মুক্তবেণী হ'য়ে চঞ্চল গতিতে তরঙ্গলীলায় সাগর-সঙ্গমে চলেচেন। এই স্রোতের মুখে ঐরাবত ভেসে যাবে, তা'তে আর বিচিত্র কি! অবিরাম বেগ, অজস্র প্রবাহ, দূর-সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, দিক্-পরিপূরিত ধ্বনি! ছল ছল, ঝর ঝর, তর তর রবে গৌরী-পর্ব্বতের তলদেশ দিয়ে জহ্নুকন্যা কোনো দিকে দৃকপাত না ক'রে অনন্তের উদ্দেশে যাত্রা করেচেন।

ব্রহ্মকুণ্ডে পাণ্ডারা যাত্রীদের ছাঁকা-বাঁকা ক'রে ধরেচে, ঠিক যেন মিঠাইয়ের উপরে মাছি ঘিরেচে। আমাদের কে পুছে? গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেই মার্কামারা দেউলে, না তার চোর-ডাকাতের ভয়, না তার উপর পাণ্ডার পীড়ন। গয়ালী, প্রয়াগওয়ালা পাণ্ডা তার দিকে ফিরেই চায় না।

হরিদ্বারে কেউ বড় একটা ত্রিরাত্রি বাস করে না। আমরা দু'দিন থেকেই চ'লে গেলাম।

চল্‌তা সাধুর চলা আর বন্ধ হয় না। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ, সেখান থেকে লছমনঝোলা, গঙ্গোত্রী, গোমুখী। আরো আগে? আর আগে কি আছে? স্বামীজীর আর আগে যাবার ইচ্ছে নেই, প্যারীর মাসী চেপে ধরলে, আর খানিকটা যেতেই হবে।

আমরা দু'জনেই প্যারীর মাসীর একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলাম। তার কথাবার্ত্তা ক্রমে ক'মে আস্‌ছিল। সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক, সময়ে সময়ে আমরা কেউ কথা কইলে চম্‌কে উঠ্‌ত। মাঝে মাঝে

চোখে সেই রকম আবরণ, বাইরে কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। মনের ভাব টানা তারের মত, একবার আঙুল ঠেক্‌লেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আঙুল যে কার, সেটা আমরা বুঝ্‌তে পারছিলাম না। একটা আকুলতা, অন্তরের ব্যগ্রতা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছিল, কিন্তু কারণ আমাদের চোখে কিছু ঠেক্‌ছিল না। যে-ভাব রাত্রে আমরা দু'বার দেখেছিলাম, দিনের বেলাও যেন সেই রকম আরম্ভ হ'ল, কিন্তু আপনার মনে প্যারীর মাসী বেশী কথা কইত না। বরং আমাদের মনে হ'ত, যেন অনেক সময় সে কাণ পেতে কা'র কথা শুন্‌চে। এক একবার যেন ঘাড় নেড়ে কি কথায় সায় দিচ্চে।

প্যারীর মাসীর অসাক্ষাতে স্বামীজীকে আমি বল্‌লাম, এ-সব লক্ষণ কি আপনার ভাল মনে হচ্চে?

—না, ভাল আবার কোন্‌খানটা?

—যদি এমন স্থানে উন্মাদ হ'য়ে ওঠে কিংবা একটা কিছু কাণ্ড ক'রে বসে, তা হ'লে উপায়?

স্বামীজী মাথা নাড়লেন, বল্‌লেন, সে-সব ভয় কিছু নেই, কখনো কিছু উৎপাত করবে না। তবে হঠাৎ যদি কোথাও চ'লে যায়, সেই ভয়। হয় ত এই রকম কিছু দিন থেকে আপনি সেরে যাবে। হয় ত—

স্বামীজী কথাটা শেষ করলেন না, একদৃষ্টে আমার মুখ চাইলেন।

আমি বল্‌লাম, আপনি কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, বল্‌লেন না?

স্বামীজী বল্‌লেন, যা মনে হবে, সব কথাই কি বল্‌তে হবে? কখন একটা খেয়াল আসে, কখন কিছু কল্পনা।

—প্যারীর মাসীর এ-রকম জেদ কত দিন থাক্‌বে?

—এইবার যেখানে গিয়ে আড্ডা করা যাবে, সেইখান থেকে ফিরে আস্‌ব। আমার শরীর ভাল নেই বল্‌লে ও নিজেই ফিরে যেতে চাইবে।

পথে কিছু দূর গিয়ে আমরা দেখ্‌লাম, একটা সঙ্কীর্ণ পথ উত্তরদিকে চ'লে গিয়েচে। প্যারীর মাসী সেইখানে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, এইবার এই পথ দিয়ে যেতে হবে।

স্বামীজী বল্‌লেন, এ পথ কোথায় গিয়েছে, আমরাও ত কিছু জানিনে।

—চল না, এই পথ দিয়ে গেলেই আমরা ঠিক যাব।

প্যারীর মাসী সেই পথে চল্‌ল। স্বামীজী আর কিছু না ব'লে তার পিছনে চল্‌লেন।

পথ সরু, পগদণ্ডী, দুর্গম। তার পাশেই অত্যন্ত গভীর, প্রশস্ত খড, নীচে চেয়ে দেখ্‌তে গেলে ভয় করে। অন্য দিন হ'লে প্যারীর মাসী ভয়ে ভয়ে আমাদের পিছনে আস্‌ত, আজ সে দ্রুত অভ্রান্ত পদক্ষেপে আগে আগে চল্‌ল, যেন পাহাড়ে ওঠা তার চিরকালের অভ্যাস। আমরা কোনোমতে যথাসাধ্য তার অনুবর্ত্তী হলাম। পাহাড়ের উচ্চতায় ও পথের কঠিনতায় হাঁপ্‌ লাগ্‌ছিল।

হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি কিছু দূরে হ'লেও খুব নিকটে মনে হচ্ছিল। অতি-প্রাচীন, শুভ্রশীর্ষ, বিরাট্‌দেহ মৌনী ঋষির মত একের পর আর এক দাঁড়াইয়া আছে। কোনখানে উপত্যকার ন্যায়; সেখানে ঘনবিন্যস্ত ঘনশ্যাম বিশাল তরুরাজির সারি। চারিদিকে বিরাটের সমাবেশ, বিরাট্‌ গাম্ভীর্য্য, বিরাট্‌ স্তব্ধতা, বিরাট্‌ হিমগিরি। মধ্যাহ্নের পর আমরা দেখ্‌লাম, পথ পূর্ব্বমুখ হয়েছে। কিছু দূর গিয়ে দেখ্‌লাম, খডের ভিতর দিয়ে প্রবলবেগে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়েচে, জল নির্ম্মল হ'লেও তা'তে গাঢ় শ্যাম আভা, পাহাড়ে ঠেকে শুভ্র ফেনা উঠ্‌ছে। প্যারীর মাসী একবার দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে বল্‌লে, কৃষ্ণগঙ্গা।

স্বামীজী বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে চাইলেন, আবার জলের দিকে চেয়ে বল্লেন, কৃষ্ণগঙ্গাই বটে।

যেমন অপরাহ্ণ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, সেই সঙ্গে খড দিয়ে মেঘ ঘনীভূত কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ঘুরে ঘুরে, পাকিয়ে পাকিয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে, অলস মন্থর গতিতে চলেচে। যেন বৃহৎ অজগরে দল এঁকে বেঁকে সংসর্পিত হ'য়ে পর্ব্বতারোহণ করছে। সারির পর সারি, স্তরের পর স্তর, মেঘের পর মেঘের দল—সব এক পথের যাত্রী। উপরে এসে গিরিশৃঙ্গের উপকণ্ঠে মালার মত জড়িয়ে যেতে আরম্ভ হ'ল। এ-সব বিনা-সূতায় গাঁথা হার, আপনা-আপনি পর্ব্বতরাজের গলায় উঠ্‌চে। অথবা এই সব মহাসর্প কৈলাসপতি মহাদেবের অঙ্গ বেষ্টন করচে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এল। আমরা কিছু চিন্তিত হলাম। যদি বৃষ্টি আসে, কোথায় দাঁড়াব? রাত্রিই বা কোথায় যাপন করব? বালানন্দ স্বামী বল্লেন, প্যারীর মাসী, আজ ত তুমি আমাদের পাণ্ডা। রাত্রের কি ব্যবস্থা করেছ? এ-পথে তোমার ঘর-দোর কোথাও আছে?

প্যারীর মাসী মুখ ফিরিয়ে বল্লে, তোমরা ভাব্‌চ কিসের জন্যে বাবাঠাকুর? আমি কি আর না জেনে শুনে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। আর একটু এগিয়ে ঘর পাওয়া যাবে, তোমাদের রাতে কোনো কষ্ট হবে না।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা দেখ্‌তে পেলাম, পথের কিছু উপরে এক-খানি পাথরের ঘর। তার সাম্‌নে একটু জায়গা পরিষ্কার ক'রে সমভূমি করা, ঘরের সাম্‌নে বারান্দা, তা'তে তিনটি পাথরের থাম, বেশ শক্ত কাঠের দরজা, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। প্যারীর মাসী তড়্‌-তড়্‌

ক'রে উঠে গিয়ে দরজার শিকল খুলে ঘরে ঢুকল। বালানন্দ স্বামী আর আমি বিস্মিত হ'য়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে তার পশ্চাতে ঘরে প্রবেশ করলাম।

—৯—

ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, এক কোণে একরাশি কাটা কাঠ সাজানো রয়েছে, তার পাশে পাথরের উনান। একটা কুলুঙ্গিতে একটি পিতলের হাঁড়ি আর হাতা, তার পাশে কিছু চাল আর ডাল, একটা পাথরের বাটিতে খানিকটা ঘি, পাতার উপর সব রকম গুঁড়া মসলা, নুণ, একটা ঝুড়িতে আধ ঝুড়ি আলু। আর এক পাশে কতকগুলা শালপাতা।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লাম, এ ঘরে নিশ্চয় কেউ থাকে।

কোথাও কিন্তু মানুষের কোনো চিহ্ন নাই। বালানন্দ স্বামী বল্‌লেন, কেউ থাক্‌ত, তা ত স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, কিন্তু এখন যে কেউ আছে, তা মনে হয় না।

ঘরের আর এক কোণে গাদা-করা খড় রাখা ছিল, প্যারীর মাসী দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, এই শোবার বিছানা। এখানে যে থাক্‌ত, সে এই সব জিনিষ রেখে কোথাও চ'লে গিয়েচে, ভেবেছিল, আর কেউ এখানে এলে তাদের কাজে লাগ্‌বে।

স্বামীজী বল্‌লেন, আমারও তাই মনে নিচ্চে। এ-রকম দুর্গম স্থানে কোথাও কোথাও এমন দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আমি বল্‌লাম, কে আমাদের এ-রকম আতিথ্যের ব্যবস্থা ক'রে রেখেচেন, তা ত আমরা জানিনে, উদ্দেশে আমরা তাঁর জয়-জয়কার করচি।

স্বামীজী হেসে বল্লেন, একশোবার। আর প্যারীর মাসীর পাণ্ডাগিরিরও জয়-জয়কার।

প্যারীর মাসী বল্লে, বাবাঠাকুর, এখন ত তামাসা কর্‌চ, আগে ভাবছিলে, কোথায় আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্চি, রাত কাটাবার জায়গা পাওয়া যাবে না।

ঘরের পিছনেই একটি ছোট ঝরণা ছিল, খুব মিঠে জল। আমরা মুখ-হাত ধুয়ে খানিক এ-দিক ও-দিক ঘুরে দেখ্‌লাম। তখনও তেমন অন্ধকার হয় নি, কিন্তু চারিদিকে মেঘ ঘিরে রয়েচে, অল্প বাতাস, পাহাড়ের চূড়ার উপর অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌চে। আমরা সারাদিন চ'লে এসেছিলাম ব'লে তেমন শীত-বোধ হচ্ছিল না। প্যারীর মাসী হাত-পা ধুয়ে এক মুঠা খড় দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছিল।

ঘর থেকে খানিক দূরে একটা প্রকাণ্ড পাথরে ঠেসান দিয়ে স্বামীজী দাঁড়ালেন। বল্লেন, প্যারীর মাসীর ভাব-গতিক আজ তোমার কি-রকম মনে হচ্চে?

আমি উত্তর করলাম, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে। এমন জায়গায় এ-রকম ঘর থাকতে পারে, এ-কথা সহজে বিশ্বাসই হয় না। প্যারীর মাসী কি রকম ক'রে জান্‌লে যে, এখানে আশ্রয় আছে? আর আহারের সামগ্রী পাওয়া যাবে, তাই বা তার কেমন ক'রে মনে হ'ল?

—সে-কথা যে তার মনে হয়েছিল, তা বোধ হয় না, তবে কিছু একটা প্রেরণায় যে সে এ-পথে এসেচে, তার কোনো সন্দেহ নাই। এ-দিকে সচরাচর লোক চলে না, নিকটে যে কোথাও কোনো তীর্থস্থান আছে, তাও শুনিনি। অথচ এই স্থানে এমন কিছু আছে, যার স্মৃতি প্যারীর মাসীকে অজ্ঞাতে এখানে আকর্ষণ ক'রে এনেচে। কি তা, আমরা জানিনে, জাগ্রত অবস্থায় প্যারীর মাসীও জানে না। কিন্তু

আকর্ষণ যে বলবৎ, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্চ। পথ চল্‌তে চল্‌তে প্যারীর মাসী আর এক পথে চল্‌ল। আমাদের এ-দিকে আস্‌বার কোনো কথা ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। কে তাকে এ-পথে আস্‌তে বল্‌লে, কিসের জন্য এখানে আসা?

—আমরা তা ত কিছুই জানি নে।

—প্যারীর মাসীও জানে না। নিদ্রাবস্থায় তার আর এক চৈতন্য জাগরিত হ'য়ে জান্‌তে পারবে। এর আগে দু'বার যা দেখা গিয়েছিল, তা'তে ওর কোনো হাত ছিল না। আমাদের পথে যে-স্থান পড়ে, সে-স্থানের পূর্ব্ব ঘটনা নিদ্রিতাবস্থায় কোনো অলৌকিক ব'লে ও প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়। ওর মধ্যে দুই সত্তা বিদ্যমান। যখন একটি জাগে, সে-সময় অপরটি নিদ্রিত হয়। আজ যা দেখ্‌লে, সে-ভাব নূতন। সহজ জাগ্রত অবস্থাতেই দ্বিতীয় চৈতন্যের প্রভাব। ওর নিদ্রিতাবস্থায় যে ক্ষমতার বিকাশ আমরা দেখেছি, সেই ক্ষমতাই আজ জাগ্রত অবস্থায় ওকে এখানে নিয়ে এসেছে।

—আপনার মনে কোনো আশঙ্কা হচ্চে?

—চিন্তার কারণ বটে। আশঙ্কা আছে কি না, কেমন ক'রে জান্‌ব?

—ওকে নিয়ে ফিরে চলুন না কেন?

—কাল যাব। ত্বরা করতে হবে, আমার শরীর ভাল নেই।

ফিরে এসে আমরা দেখি, প্যারীর মাসী ঝরণা থেকে চাল-ডাল ধুয়ে এনেচে। আমি আলো জাল্‌লাম, প্যারীর মাসী উনানে আগুন দিলে।

রাত্রিতে বেশ তৃপ্তি ক'রে আমরা খিচুড়ী খেলাম।

উনানের আগুন না নিভিয়ে আরও দু'চার খানা মোটা মোটা কাঠ দেওয়া গেল। দেওয়ালে ফুকর দিয়ে ধোঁয়া বেরুবার পথ ছিল। ঘর বেশ গরম রইল, রাত্রিতে আলো যেমন জালা থাকে, সেই রকম রইল।

দরজায় লোহার শিকল ছিল, শিকল দিয়ে খড়ের উপর আমরা শুয়ে পড়লাম।

আগেকার মত গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্যারীর মাসী চোখ চেয়ে রয়েছে, কিন্তু ঘরের ভিতর কিছু দেখতে পাচ্চে না। দৃষ্টি স্থির, যেন দূরে কিছু দেখ্‌চে। কণ্ঠের স্বর আর এক রকম, যেন অনেক দূর থেকে কথা কইচে। বালানন্দ স্বামীও জেগেচেন। আমরা দু'জনে চুপ ক'রে প্যারীর মাসীর কথা শুন্‌তে লাগ্‌লাম।

সে বল্‌ছিল, ছায়া! ছায়া! ছায়া! কেবলি ছায়া! কেবলি ছায়ার আনাগোনা। এ কি ছায়ালোক না কি? কোথাও কোনো শব্দ নেই, নিঃশব্দে ছায়া সব ঘুরছে। সব যেন অস্পষ্ট, ছায়ার মত আলো। এত ছায়ার মধ্যে আমি কেন? আমিও কি ছায়া?—

সব যেন আব্‌ছায়া, আব্‌ছায়া! কারুর মুখ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চিনে। কারুর মুখে কথা নেই, কেউ কারুর সঙ্গে কোনো কথা কইচে না! আমিও যেমন! ছায়াতে কি কথা কইতে পারে? এখানে কি মানুষ নেই, শুধু ছায়া?

ঐ অনেক দূর থেকে যেন একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে আলো আস্‌চে। অল্প গোলাপী আলো, তেমন পরিষ্কার নয়, তার পর আলো বাড়চে— বাড়চে—বাড়চে—

কৈ, আলোয় ত ছায়া মিলিয়ে গেল না! ছায়ার চারিদিকে আলো খেল্‌চে, আলোর মধ্যে ছায়ার মুখ! এমন সব মুখ ত কখন দেখিনি। পদ্ম-ফুলের মতন সব ফুটে রয়েচে। চোখের কি শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল দৃষ্টি!

ও কে ডাক্‌চে? ও মা, আমার নাম ধ'রে ডাক্‌চে! কমলা! আমার ও নাম ত কেউ জানে না, সবাই ভুলে গিয়েচে। এখানে

আমাকে নাম ধ'রে কে ডাকে? কে গা, আমাকে ডাকৃচ? এই যে আমি এসেচি। এ.কে এল? জ্যোতির জ্যোতি! সত্য সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি!—

*   *   *   *

প্যারীর মাসী তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে গলবস্ত্র হ'য়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। বালানন্দ স্বামী আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমরা দু'জনেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম।

প্রণাম ক'রে প্যারীর মাসী বল্লে, ঠাকুর, আমাকে ডাকৃচ! এই যে আমি এসেছি। ঐ ডাক শোন্‌বার জন্য আমি যে কত দিন ধ'রে কাণ পেতে আছি।

কোন্ দিকে যেতে হবে? ঐ যেখান দিয়ে আলো আস্‌চে? এই সব জ্যোতির্ম্ময় ছায়ার ভিতর দিয়ে? ছায়ার সাথে মিশে আমিও ছায়া হ'য়ে যাব?

*   *   *   *

প্যারীর মাসী আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামীজী আমার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, তার পর পাশ ফিরে নিদ্রিত হ'লেন। আমার চক্ষে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শীতের জন্যই হোক, কিংবা রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুম হয়নি ব'লেই হোক, আমাদের ঘুম ভাঙ্গতে একটু দেরী হ'ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি, ঘরের ফুটো দিয়ে প্রভাত-সূর্য্যের আভা আস্‌চে।

বালানন্দ স্বামী উঠেই বললেন, প্যারীর মাসী কোথায় গেল?

প্যারীর মাসী ঘরে নেই দেখে আমি বল্‌লাম, হয় ত মুখ-হাত ধুতে গিয়েছে। আমাদের উঠ্‌তে দেরী হয়েচে

—তাই হবে, ব'লে স্বামীজী ভেজান দরজা খুলে ঘরের বাইরে এলেন। আমি তাঁর পিছনে।

বারান্দার এক দিকে একটা থামে বাঁ হাত জড়িয়ে ব'সে প্যারীর মাসী। তাকে কিছু না ব'লে আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নিসর্গের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

আকাশ নির্ম্মল, স্বচ্ছ, গভীর নীল। সূর্য্য সবেমাত্র উদয় হয়েচে, বৃহৎ লোহিত চক্র উপত্যকায় সংলগ্ন হ'য়ে রয়েচে। আকাশ-ব্যাপী, শৃঙ্গকণ্ঠলম্বিত কৃষ্ণ অভ্ররাজি জ'মে শুভ্র তুষার হ'য়ে চারিদিক আচ্ছন্ন করেচে। গাছের মাথায়, পাহাড়ের গায়ে, পথে, সর্ব্বত্র শ্বেত আবরণ। তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ ও তরুশীর্ষে সূর্য্য-কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্চে।

প্যারীর মাসী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে দেখে স্বামীজী ডাক্‌লেন, প্যারীর মাসী!

কোনো সাড়া নেই।

শশব্যস্তে আমরা গিয়ে দেখ্‌লাম, প্যারীর মাসী পূর্ব্বমুখী হ'য়ে ব'সে আছে। দেহ নিস্পন্দ, স্থির, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে। মুখে অপূর্ব্ব আনন্দ-জ্যোতি!

বালানন্দ স্বামী ঊর্দ্ধমুখ, ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে গভীর স্বরে বৈদিক ছন্দে আবৃত্তি করলেন—

তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়!